আকাশের আড়ালে আকাশ

সমরেশ মজুমদার

শশধর প্রকাশনী

১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২

প্রকাশিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণ : অশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এ এক অভিনব বই।

আমার সাম্প্রতিক গল্পগুলো, যা বন্ধুবান্ধবদের মতে, অতীত থেকে সরে আসা, এখানে একত্রিত। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র-জগতের নেপথ্যে এখনও বয়ে চলা কাহিনীর স্রোত, যা যুক্ত থাকার কারণে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে আমাকে অনেক বেদনা নিয়ে, তা গ্রন্থিত হয়েছে এখানে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, 'অন্ধকারের মানুষ' খুব সীমিত সংখ্যায় ছাপার পরই নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ সময় এই বইটি দেশের পাঠকের কাছে পৌঁছায়নি। দীপঙ্কর আচার্য এই অমনিবাসে তাকে যুক্ত করেছেন। ফলে, অনেক আকাশ নিয়ে এই বই। আকাশের আড়ালে একটার পর একটা আকাশ এই অমনিবাস।

সমরেশ মজুমদার

আকাশের আড়ালে আকাশ

মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেনটা বিকেল শেষ করে দিল। জানলায় বসে রোদ মরে যেতে দেখেছিল সে, ছায়া গাঢ় হতে হতে ঘোলা পৃথিবী। ছুটন্ত ট্রেন থেকে অনীক সূর্য-হারানো পৃথিবীর শরীর চুঁইয়ে বেরনো অন্ধকারকে অনুভব করতে পারল এক সময়। পর পর এইসব পরিবর্তন দেখতে দেখতে অদ্ভুত বিষণ্ন আরামে আক্রান্ত হয়ে গেল সে। অনীক জানলায় মাথা রেখে চাঁদ উঠতে দেখল।

আর তখনই পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল। গাছগাছালি, মাঠ আর অপূর্ব নীল আকাশকে স্নান করাতে সোনার থালার মতো চাঁদ পৃথিবীর সামান্য ওপরে গুঁড়ি মেরে উঠে এসেছে। একদম নিটোল নারীর মতো চাঁদ। এই মুহূর্তে নিজের শরীরের আলোয় সে আলোকিত। এমন উদাসীনা নারীর খবর একমাত্র শুক্লপক্ষই দিতে পারে। ক্রমশ সেই তিবতিরে জ্যোৎস্নায় ভেজা অলৌকিক প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা তীব্র আকর্ষণ অনীকের বুকে পৌঁছে গেল। এমন এক মায়াময় ভুবন পৃথিবীতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে অথচ সে ট্রেনের কামরায় নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদে বসে · এ হতে পারে না। মানুষ শত চেষ্টা করলেও এক জীবনের বেশি বাঁচতে পারে না। যা কিছু প্রয়োজন তা যত জরুরিই হোক, সেই জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়। অতএব নিয়ম ভাঙতে যে ক্ষতি তার জন্যে তোয়াক্কা করে কি লাভ। ট্রেনের গতি কমতে কমতে এক নাম-না-জানা স্টেশনে ক্ষণিকের জন্যে জিরোতেই অনীক নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্ম না বলে ইঁটবাঁধানো চত্বর বলাই সঙ্গত।

নামা মাত্রই ট্রেনটা' নড়ে উঠল। তারপর যেতে হয় তাই যাচ্ছি এমন ভঙ্গিতে আলোকিত কামরাগুলো একে একে চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আর কেউ কি নেমেছেন এই স্টেশনে অথবা এখান থেকে ওই ট্রেনে কেউ কি চলে গেল? বোঝা গেল না এই মুহূর্তে, কারণ শূন্য রেল লাইনের পাশে বাঁধান চত্বর ফাঁকা। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিশেল এখানে তেমন জমেনি স্টেশনবাড়ির পিছনে গাছগাছালি থাকায়। অনীক এগিয়ে গেল। স্টেশন বলতে দু'খানা ঘর। তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকে দেখছিল এক প্রৌঢ়। বললেন, তিনিই স্টেশন মাস্টার। দ্বিতীয় কর্মচারিটির শরীর খারাপ বলে আসেনি। এরপর আর কোন ট্রেন এই স্টেশনে থামবে না। অতএব ঝাঁপি বন্ধ করে চলে যাবেন তিনি রেলের দেওয়া বাসায়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের গন্তব্য কোথায় ?'

অনীক মাথা নাড়ল। তার কি অর্থ তা সে নিজেই জানে না। স্টেশনমাস্টার যেন অদ্ভুত কিছু দেখলেন। অনীক উলটে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চায়ের দোকান আছে ?'

'দোকান ? খেপেছেন ? কিনবে কে ? আমার সংসারের যা কিছু দরকার তা সুরজগঞ্জ থেকে নিয়ে আসি। পাক্কা দশ মাইল। কিন্তু এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা বুঝলাম না।'

'উদ্দেশ্যবিহীন। যেতে যেতে ভাল লেগে গেল তাই নেমে পড়লাম। আপনি আপনার কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে যান, আমি একটু চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখি।' অনীক এগোতে চাইল।

স্টেশনমাস্টার পাশে এলেন, 'চারপাশে ঘুরবেন মানে ? কিস্যু দেখার নেই এখানে। আমরা কি নিঃসঙ্গ, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। স্টেশনের পাশে বাসা বলতে আমার দুটো ঘর, রামবিলাস থাকে এখানেই, এই অফিসঘরে। তারপর আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবেন না আপনি। এই রাতের বেলায় মানুষজনের মুখ দেখতে পাবেন না।'

'আমি তো সেইরকম আশা করেই ট্রেন থেকে নেমেছি।'

উন্মাদ-দর্শনের সুখ থেকে ভদ্রলোককে বঞ্চিত করে অনীক অফিসঘরের পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ডান হাতেই স্টেশনমাস্টারের দু-ঘরের বাসা। চারপাশে লম্বা লম্বা গাছ থাকায় ফালি ফালি জ্যোৎস্না তার গায়ে নকশা এঁকেছে। এত চুপচাপ চারধার যে দু-কান পরিষ্কার হয়ে যায়। অনীক দেখল একটা না-বাঁধানো পথ চলে গেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। ওই পথেই তাকে যেতে হবে। স্টেশন মাস্টারের বাসায় হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। এই সময় হলুদ শাড়ি-পরা একজনকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে দেখল সে। মুখচোখ দেখা যাচ্ছে না দূরত্বের কারণে যতটা তার চেয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে।

'চায়ের দোকানের খবর নিচ্ছিলেন, এক কাপ চা না হয় আমার ওখানেই খেয়ে যান। কথা বলার লোক তো এ সময় পাই না, একটু গল্পো করা যাবে।' কথা শেষ করেই সম্মতির অপেক্ষা না করে হাঁকলেন, 'ওগো, এই ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হবে।'

বারান্দা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কেন ?'

একটাই শব্দ কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণে কিরকম অর্থবহ হয়ে উঠল। অনীক কৌতূহলে মহিলাকে দেখতে চাইল। এইরকম একটা প্রশ্ন শুনতে পাবে তা কল্পনায় ছিল না। স্টেশনমাস্টার যে বেশ বিব্রত তা তাঁর গলার স্বরে স্পষ্ট, 'না, মানে, এখানে তো কোন চায়ের দোকান নেই।'

'এখানে তো কোন কিছুই নেই।' চটজলদি কথাগুলো ভেসে এল।

'তুমি অমন করে বলছ কেন? ভদ্রলোক আমাদের এই জায়গা দেখতে ট্রেন থেকে নেমে এসেছেন। এখানে থাকার জায়গা নেই। চায়ের কথা বলছিলেন—তাই—'

'আমাদের জায়গা মানে? তুমি এখানে থাকতে চাও না, আমি চাই, আমার জায়গা।'

'বেশ, তাই হল। আসুন ভাই—।' স্টেশনমাস্টার এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ অনীক ঠিক করেছিল সে এখানে চা খাবে না। হয়ত স্টেশনমাস্টার প্রায়ই লোক ধরে আনেন চা খাওয়াবার জন্যে আর সেই কারণে ভদ্রমহিলা বিরক্ত। অতএব একজন উটকো মানুষকে তিনি চা না খাওয়াতেই পারেন। কিন্তু ওই যে কথাটা, আমার জায়গা, অনীককে আকর্ষণ করল। একজন প্রৌঢ় স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী এই জ্যোৎস্নাক্রান্ত চরাচরকে নিজের জায়গা বলে মনে করছে শোনার পর তাকে কাছে গিয়ে দেখার লোভ হল ওর।

মহিলা একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন। অনীক কাছাকাছি হতেই বুঝল তিনি সুশ্রী আর বয়স কখনই পঁচিশের বেশি নয়। অসমবয়সী স্বামী-স্ত্রী সে অনেক দেখেছে কিন্তু এঁদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না এই মুহূর্তে। মহিলার গৌরবর্ণের সঙ্গে হলুদ শাড়ির চমৎকার সঙ্গত করছে। প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখানে চায়ের দোকান নেই বলে উনি আপনাকে চা খেতে ডেকেছেন। আপনার আর যা যা প্রয়োজন তা এখানে মেটানোর ব্যবস্থা নেই বলে উনি কি আমাকে তার আয়োজন করতে বলবেন?'

স্টেশনমাস্টার চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ছিঃ, রাণু, এসব কি বলছ?'

অনীক মাথা নাড়ল, 'আপনাকে চা করতে হবে না।'

'কেন হবে না?'

'আপনার ইচ্ছে নেই বলে।'

'বাঃ, আপনি খুব ভাল। ভাল লোককে চা খাওয়াতে আমার আপত্তি নেই। বসুন।'

রাণু নামের মহিলা পাখির মতো পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার হাসলেন, 'যাক, নরম হয়েছে। এমন সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করে যে—।'

ওঁর কথা শেষ হল না, রাণু ফিরে এলেন, 'আপনি মতলববাজও হতে পারেন।'

'কি বলছ তুমি?' স্টেশনমাস্টার প্রতিবাদ করলেন।

'থামো! কতক্ষণ চেনো তুমি ওঁকে? এই যে আমার ইচ্ছে নেই বলে চা করতে নিষেধ করবেন এটাও তো প্ল্যান করে বলতে পারেন। ওটা বললে আমি গলে গিয়ে চা বানিয়ে আনব।' রাণু যেন শিউরে উঠলেন, 'ঠিক ওই ভুলটাই করতে যাচ্ছিলাম।'

'আপনাকে একটুও বিব্রত হতে হবে না। আমার চায়ের দরকার নেই। আচ্ছা, আসি।'

অনীক চলে যাওয়ার জন্যে ফিরতেই রাণু এগিয়ে এলেন, 'দাঁড়ান। আমি বিব্রত হচ্ছি কে আপনাকে বলল ? আমি বলেছি আপনাকে ?'

'না। আপনার কথা শুনে মনে হল।'

'বাঃ। আপনার দেখছি অন্য কোন বোধ বেশ কাজ করে। চমৎকার।'

অনীক চমকে উঠল। এই লাইনটি যে মেয়ে ওইভাবে উচ্চারণ করতে পারে সে নিপাট সাধারণ নয়। এখন চাঁদের তেজ বেড়েছে। রাণুর মুখচোখ অনেকটা স্পষ্ট।

ওঁর গলা বেশ লম্বা, কাঁধ চওড়া। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘা। প্রচলিত সুন্দরী নয় কিন্তু ভাল লাগা তৈরি হয় কিছুক্ষণ থাকলেই।

'যাক গে! আপনি এখানে এসেছেন কেন ?'

'প্ল্যান করে আসিনি। ট্রেনের জানলা থেকে জায়গাটা দেখে ভাল লেগে গেল।'

'লাগবেই। এটা আমার জায়গা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ওই ভৈরবীর কথা শুনেছেন ?'

'ভৈরবী! কে ?'

'অভিনয় করছেন না তো ?'

'বিশ্বাস করুন। আমি জ্যোৎস্নায় ডোবা গাছগাছালি আর নির্জনতা দেখে নেমে পড়েছি।'

'তা হলে ভাল। আপনি গাছ চেনেন ?'

'কিছু কিছু।'

'আপনার সঙ্গে আমার এর আগে দেখা হয়েছিল।' রাণু এক পা এগিয়ে এলেন।

'আমার সঙ্গে ?' অনীক এবার বিব্রত। এমন কথা-বলা মহিলাকে সে কোথাও দেখেছে কি না মনে করতে পারছে না। অথচ ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সামনেই স্বাভাবিক গলায় ঘোষণা করলেন, দেখা হয়েছিল। স্টেশনমাস্টার সমাধানের চেষ্টায় বললেন, 'উনি কোথায় থাকেন জানলে তুমি বুঝতে পারবে সেখানে কখনও গিয়েছিলে কি না।'

'আমি আগে গিয়েছিলাম কি না, তা উনি কী করে জানবেন ? সেটা আমি বলতে পারি। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি এর আগে দেখেছি। বসুন।' রাণু চলে গেলেন ভেতরে। স্টেশনমাস্টার বারান্দাতেই বসার ব্যবস্থা করলেন।

অনীক খুব ফাঁপরে পড়েছিল। ভদ্রমহিলাকে সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। মানুষের শরীর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কিন্তু কতটা পরিবর্তন হলে এত অচেনা মনে হবে ?

'বেশ চকমকে জ্যোৎস্না, কি বলেন ?' স্টেশনমাস্টার যেন উপভোগ করছিলেন।

'হুঁ। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আমি কিছুতেই—।' কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখল অনীক।

'আমি জানি।' ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন।

'জানেন ?'

'বুঝতেই পারছেন, কথাবার্তায় একটু—, আসলে নির্জনে একা থাকতে থাকতে—।'

স্টেশনমাস্টার কোন কথাই পুরোটা বলেন না।

'আপনি কি অ্যাবনর্মালিটির কথা বলছেন ?'

'ঠিক তা নয়, আবার অনেকটাই।'

'তা হলে তো ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'কোথায় যাব ? ছুটি চাইলে পাওয়া যায় না যে শহরে গিয়ে দেখাব। আবার দিনেরবেলায় ও খুব নর্মাল। কথাবার্তা কম বলে কিন্তু কোন ত্রুটি পাবেন না।'

'বিয়ের পর থেকেই এইরকম ?'

'এইরকম মানে এমন সব প্রশ্ন করে যা সাধারণ মানুষ করে না। এই তো, গতকাল আমাকে বলল ওর সঙ্গে যেন রাত্রে কথা না বলি কারণ গাছেরা ওর সঙ্গে আলাপ করবে সারা রাত ধরে আর আমাকে নাকি ঠাকুর্দা বলে মনে হচ্ছে ওর।' বলেই সামান্য হাসলেন ভদ্রলোক, 'বয়সের ব্যবধান তো আছেই। লেট ম্যারেজ। গরিব ঘরের মেয়ে বলে ওকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। নইলে কত ভাল বিয়ে হত ওর।'

'বিয়ে কতদিন হয়েছে ?'

'বছর সাতেক। একেবারেই বালিকা ছিল। মামারা রাজি হয়ে গেল। বাপ-মা নেই।

'সন্তান ?'

'নো ! আর এখন তো নো চান্স ! অদ্ভুত উদাস গলায় বললেন স্টেশনমাস্টার।

'নিন। খেয়ে দেখুন। একেবারে গ্রাম্য চা।' এক কাপ চা হাতে নাণু ফিরে এলেন। কাপটা এগিয়ে ধরলেন অনীকের সামনে।

'এর দরকার ছিল না।'

'সেটা আমি বুঝব। নেবেন না ফেলে দেব ?'

অগত্যা নিতে হল অনীককে। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ?'

স্টেশনমাস্টার হাত জোড় করলেন, 'না না। আমি চা পান করি না।'

অনীক তাকাল। পৃথিবীতে এখনও কিছু মানুষ আছেন যাঁর চা, কফি, পান, ধূমপান অথবা মদ্যপান করেন না। ডাল ভাত তরকারি খেয়ে বেশ বেঁচে যান যে কদিন পারেন। কোন কিছু হারাচ্ছেন বলে তাঁদের ধারণাও নেই। স্টেশনমাস্টারের মুখে তেমন সারল্য আছে।

চা শেষ করতে হল তাড়াতাড়ি। ওঁরা চুপচাপ দেখছিলেন যেন পতাকা-উত্তোলন করা হচ্ছে। কাপ ফিরিয়ে দিয়ে অনীক বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন রাণু, 'কোথায়?'

'একটু ঘুরে বেড়াই।'

'দাঁড়ান, আমরাও যাব। আপনি তো এখানকার কিছুই চেনেন না। নতুন জায়গায় কেউ চিনিয়ে না দিলে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। এক মিনিট।' কাপ হাতে রাণু দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'দূর! রাত-বিরেতে জঙ্গলে মাঠে ঘুরতে আমার একদম ভাল লাগে না।'

'বেশ তো! আপনারা থাকুন, আমি চলি।'

'আপনি আচ্ছা লোক। আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে আপনি বাইরে ঘুরে বেড়াবেন। এখন যদি বলি যাব না তা হলে সাতদিন অশান্তি চলবে। বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'তা হলে ব্যাপারটা বুঝবেন না।'

স্টেশনমাস্টারের কথা শেষ হওয়ামাত্র রাণু বেরিয়ে এলেন। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবে তো?'

'চল।'

অনীক দেখল এরা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ এটা এমন জায়গা যে চুরি করতেও কেউ আসবে না। সে দেখল যে রাস্তাটা মাঠঘাট পেরিয়ে স্টেশনের গায়ে পৌঁছেছে সেটা না ধরে সরু পায়ে-চলা পথ বেছে নিলেন রাণু। তিনিই আগে হাঁটছেন। চাঁদ এখন বেশ ওপরে উঠে এসেছে। অল্প-অল্প বাতাস বইছে। ছোটবড় গাছগুলোর ফাঁক গলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে ঘাসে। এইরকম সময়ে সঙ্গে দু'জন মানুষ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কিভাবে এদের সঙ্গ এড়ানো যায়? এই সময় স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কত দূরে যাব?'

রাণু বললেন, 'আমরা তো কোথাও যাচ্ছি না। আমরা ঘুরছি।'

অনীক মুখ খুলল, 'আমার জন্যে আপনার মিছিমিছি পরিশ্রম করছেন।'

রাণু বললেন, 'দূর! আপনার জন্যে কেন, আমি শুক্লপক্ষে রাত্রে ঘুমাই না। সারারাত জ্যোৎস্না দেখি, ভোরবেলায় খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিনভর ঘুমাই।'

অনীক অবাক হয়ে তাকাল। আজ পর্যন্ত কোন নারী এমন কথা বলেছে বলে সে শোনেনি। স্টেশনমাস্টার বললেন, 'একটু বসলে হয় না। ওখানে সুন্দর একটা কালভার্ট আছে।'

'তোমরা বসতে পার। আপনি বসবেন?'

অনীক মাথা নেড়ে না বলতেই রাণু খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভাল। এতদিনে একজন ভাল সঙ্গী পাওয়া গেল। চলুন।'

অনীক দেখল স্টেশনমাস্টার সোৎসাহে তাঁর কালভার্টের দিকে এগোলেন। এমন নির্জন রাত্রে কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে একদম অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারে? কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে? সিনেমায় হয়।

'আপনি হিজল গাছ দেখেছেন?'

'দেখেছি।' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনীক বলল, 'জলের ধারে হয়।'

'তাই বলুন। এখানে কোথাও জলাভূমি নেই, এমন কি পুকুরও। অথচ আমার হিজল দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আপনার এখন কি ইচ্ছে করছে?'

অনীক তাকাল। জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত শরীর নিয়ে রাণু হেঁটে যাচ্ছেন। সে বলল, 'যতটা পারি এমন একটা রাতকে বুকে ভরে নিতে।'

'আপনি ভেবেছিলেন যে এই নির্জন জ্যোৎস্নায় আমার মতো একজনকে একা পাবেন?'

'না। ভাবিনি।'

'পেয়ে কেমন লাগছে?'

'আর এক ধরনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।'

'কিরকম?'

'একা উপভোগ করার আনন্দ।' হঠাৎ খেয়াল হল অনীকের ঝোলাটার কথা। চেয়ারে ফেলে এসেছে।

'আপনি দেখছি স্বার্থপর।' রাণু মাথা নাড়লেন, 'আমার ইচ্ছে করে লিখেছেন, শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে আমরা চলিতে চাই---।'

হাত তুলে থামিয়ে দিল অনীক, এখানেই থামুন। ভাবতে ভাল লাগবে। তারপরের লাইনটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। মরবার কোন বাসনা আমার নেই।'

'বাঃ। আপনি দেখছি বেশ শিক্ষিত।'

'কবিতা পড়া শিক্ষিতের লক্ষণ কিনা জানি না।'

'কিন্তু ওটা কোন্ মরণের কথা কবি লিখেছেন? তারপরে যেতে চাই ম'রে। মরতে চাই না, যেতে চাই ম'রে। বুঝলেন মশাই। আপনি মরণ বুঝবেন না। কখনও কখনও প্রবলভাবে জীবন পাওয়ার উপলব্ধিকে মরণ বলতে সুখ হয়।'

বিস্ময় বাড়ছিল অনীকের। অভাবগ্রস্ত এক পরিবারের বাপ-মা হারা কোন অনাথ কিশোরীকে আত্মীয়স্বজন যখন বয়স্ক কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় তখন ধরেই নেওয়া যায় একমাত্র শরীর ছাড়া তার বিকাশ অন্যত্র হয় না। অথচ রাণু যে কথা বলছেন তা অশিক্ষিতের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম আলাপে যে বিভ্রম জাগছিল এখন তা মোটেই নেই।

'আপনি এখানে কবিতার বই পান?'

'মানে?'

'আপনার কথার সূত্রে জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি খুব অশিক্ষিত। ছেলেবেলায় পড়ার বইতে যেসব কবিতা থাকে তার বাইরে কিছু পড়িনি। অনেকদিন আগে, তখন আমরা অন্য স্টেশনে থাকতাম, এক ভদ্রলোক ওয়েটিংরুমে একটা বই-এর প্যাকেট ফেলে গিয়েছিলেন। উনি সেই প্যাকেট আমাকে এনে দেন। তাতে জীবনানন্দ দাশের তিনটে কবিতার বই ছিল। এত বছর ধরে শুধু ওগুলোই পড়ি।'

'পড়ে বুঝেছিলেন?'

'ঠিক বুঝিনি। একটু একটু ভাল লাগছিল। বারংবার পড়তে পড়তে অন্যরকম মানে মনে এল। তারপর এখানে আসার পর মনে হল ও সবই আমার কথা। পৃথিবীতে আরও অনেক কবি অনেক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বকবি। কিন্তু আমার কাছে ওই তিনটে বই এত বড় যে বোধ হয় একজীবনে বুঝে উঠতে পারব না। চাঁদটাকে দেখুন।'

অনীক তাকাল। একচিলতে কালচে মেঘ গোল চাঁদের মাথায় জড়িয়ে আছে। মানুষ যতই চাঁদে হেঁটে বেড়াক পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। রাণু হাসলেন, 'কলঙ্ক আপনার কেমন লাগে?'

'একটু আধটু থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু সত্য করে বলুন তো জীবনানন্দের তিনটি বই ছাড়া আপনি এখন পর্যন্ত আর কারও কোন লেখা পড়েননি?' অনীকের বিস্ময় যাচ্ছিল না।

'না। পড়ার সুযোগ তো কখনও হয়নি। তাছাড়া এই তিনটে শেষ না করে অন্যের বই পড়ি কি করে?' রাণু চাঁদের দিকে মুখ তুললেন।

'আপনার এখনও শেষ হয়নি?'

'না। আসলে আমি তো একটা গর্দভ, আজ যে মানে ঠিক করি কাল সেটা বদলে যায়। যেমন ধরুন একটা লাইনের কথা, "হেমন্ত বিযায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর।" প্রথম পড়ার সময় মনে হয়েছিল শেফালীকে হেমন্তের মেয়ে হিসেবে কবি ভেবেছেন। গাছের তলায় শেফালী ঝরে পড়ে আছে, হেমন্ত বিদায় নিচ্ছে। স্টেশনের কাছে কিছু শেফালীর গাছ আছে। পুজোর পর এক ভোরে সেখানে গিয়ে বর্ণনা মিলিয়ে নিতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কবি লিখেছেন শাদা মরা শেফালীর বিছানার ওপরে হেমন্তের শেষ সন্তান রয়ে গেছে। অথচ শেফালীর গালচের ওপর আমি কিছুই তা দেখতে পাচ্ছি না। পরের দিন গিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে ফুলগুলো যেন চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি যেন স্পষ্ট ফুলের বিছানার ওপর হিমশীতকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। বাড়িতে এসে ওঁকে বললাম। উনি ভাবলেন আমার মাথা আরও খারাপ হয়েছে। আসলে এসব কাউকে বোঝানো যায় না, দেখানো যায় না।' কথা বলতে বলতে রাণু হঠাৎই উদাস হয়ে গেলেন। আর এই সময় ওঁকে খুব একলা বলে মনে হচ্ছিল অনীকের।

সে মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই একটা অদ্ভুত গাছ দেখতে পেল। গাছটার শরীর বিশাল কিন্তু কোন পাতা নেই, ফুল ফল তো দূরের কথা। যেন আকাশটাকে জালের মত শুকনো ডাল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে।

রাণু বললেন, 'কি মনে হচ্ছে, মরা গাছ? মোটেই না। আমি এখানে আসার পর থেকেই গাছটাকে ওই অবস্থায় দেখছি। কোন ডাল দেখিনি কখনও অথচ ডাল মরেনি।'

জ্যোৎস্না ওর সর্বাঙ্গে কিন্তু তবু গাছটাকে অসুন্দর দেখাচ্ছে। রাণু বললেন, দেখেছেন?'

অনীক দেখেছিল। একেবারে উঁচু ডালে একটা পাখি বসে আছে। তার গায়ের রঙ বেশ ধূসর। গোল মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর ভঙ্গীতে পরিচয় বোঝা গেল। এত কাছ থেকে গাছে প্যাঁচা বসে থাকতে অনীক কোনদিন দেখিনি। আরও একটু হাঁটতে কিছু লম্বা ঘাসের জঙ্গল দেখা গেল। কোমর পর্যন্ত বড় জোর। রাণু বললেন, 'ওখানে কয়েকটা খরগোস আছে। দেখবেন?'

'কিভাবে দেখা যায়?'

'বসে থাকতে হবে চুপচাপ। রাত ফুরিয়ে যাওয়ার আগে দেখা পেলেও পাবেন।'

'আপনি বসে থাকেন নাকি?'

'মাঝে মাঝে। গত সপ্তাহে দেখে গেছি একটা খরগোসের বাচ্চা হবে।'

অনীক রাণুর দিকে তাকাল।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর, জ্যোৎস্নায় চুপচাপ মাখামাখি হওয়ার পর রাণু বললেন, 'দাড়ান।'

অনীক দেখল গাছটা অতি সাধারণ। কিন্তু তার তলায় একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে, রাণু উব্ হয়ে দেখল। বাসায় ডিম ছিল, ভেঙে গেছে। রাণু উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন, 'আমাদের আগে জীবনানন্দ এসব দেখে গেছেন, 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা শিশিরে গিয়েছে ভিজে পথের উপর পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা----কড়কড়্।' উঃ, এই কড়কড় শব্দটা যে কি মারাত্মক শূন্যতা তৈরি করে । হাত দিয়ে দেখুন ডিমে, টের পাবেন।'

'হাত না দিয়েই টের পাচ্ছি।'

'তাই? আপনারা পণ্ডিত লোক তো সব অনুভবে বুঝতে পারেন। আমি এত কম বুঝি যে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে হয়।' রাণু হাঁটতে শুরু করলেন আকাশের দিকে মুখ তুলে।

তারপর হঠাৎ আঙুল তুলে বালিকার মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন, দেখুন।'

অনীক দেখল অনেক দূরে প্রায় অস্পষ্ট একটা কিছু উড়ে যাচ্ছে।

'কি দেখলেন?'

'পাখিটা ?'

'উঃ, আজ আকাশে এক তিল ফাঁকও নেই নক্ষত্রদের জন্যে আর আপনার পাখিটার দিকে নজর গেল ? আজ নিশ্চয়ই সব মৃত নক্ষত্র জেগে উঠেছে। আচ্ছা প্রেমিক চিল-পুরুষ দেখেছেন আপনি ?' গলায় অদ্ভুত আবেগ এল রাণুর।

'না। চিলদের কে নারী কে পুরুষ আমি আলাদা করতে পারি না।'

'জীবনানন্দ করেছিলেন। প্রেমিক চিল-পুরুষের চোখ শিশিরভেজা হয়। শিশির-ভেজা কিন্তু ঝলমলে। ওই সমস্ত নক্ষত্রের মতো।' একটু চুপ করে রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কখনও প্রেম করেছেন ?'

'প্রেম ?'

'না, না। এই, গাছপালা বা পাখির সঙ্গে নয়। মানুষের সঙ্গে ?'

হেসে ফেলল অনীক, 'না!'

'আপনি বিয়ে করেননি ?'

'এখনও সুযোগ হয়নি।'

'ও। ধরুন, যদি আপনি কখনও প্রেম করেন তা হলে কেন তা করবেন ?'

'প্রেম কেউ কি করে ? শুনেছি ওটা আপনাআপনি এসে যায়।'

'আশ্চর্য! একটা মানুষকে দেখে আপনার মনে আপনাআপনি প্রেম এল আর হাজার মানুষকে দেখে তা এল না, তাই তো ? তা হলে ওই একজনের কি বিশেষত্ব ?'

'বলতে পারব না।'

'আমিও বুঝতে পারি না। এই যে প্রতিদিন যে ট্রেনগুলো আমাদের স্টেশনে এসে দু-মিনিটের জন্য দাঁড়ায় তার জানলায় কত মানুষের মুখ। আমি রোজ তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখি কিন্তু একবারও কাউকে দেখে মনে প্রেম আসেনি।'

'আপনি তো বিবাহিতা ?'

'তাতে কি হল ?'

'আপনার স্বামীর জন্যে নিশ্চয়ই—'

'একটুও না। ওকে বিয়ের সময় যখন দেখি তখন আমি কিছুই ভাবিনি। পরে একসঙ্গে থাকতে থাকতেও মনে প্রেম এল না। আমার কাছে ও কখনও বাবা, কখনও ভাই, কখনও বন্ধু। ওর জন্যে আমার মনে প্রেম নেই এটা ও জানে কিন্তু তার জন্যে একটুও দুঃখ পায় না। কারণ আমি যে ওর স্ত্রী এটাই শেষ কথা বলে ভাবে।'

'আপনাকে কেউ প্রেম নিবেদন করেনি ?'

'হুঁ, করেছে। আমি বাবা মিথ্যে বলতে পারি না। বিয়ের আগে করেছে, বিয়ের পর দু'জন। আর তার জন্যে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেছে।'

'কি রকম ?'

'বিয়ের আগে আমাকে যারা প্রেম নিবেদন করেছে তাদের বয়েস কারও চল্লিশ

কারও পনেরো। একটু একা পেলেই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত ওরা। সেটা যে প্রেম নিবেদন করা তা তখন না বুঝলেও ওরা যে কথাগুলো বলে অন্য কিছু চাইছে, তা টের পেতাম।' রাণু হেসে ফেললেন, 'মেয়েরা অবশ্য অনেক কিছু আগাম টের পায় বলে গর্ব করে কিন্তু এ ব্যাপারটায় আমার ভুল হয়নি। বাপ-মা ছিল না, গরিব মামার কাছে মানুষ তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হত।'

'ওরা নিশ্চয়ই কবিতার লাইন বলত না।'

'মাথা খারাপ। একজন ছিল মুদিওয়ালা। আমরা কাকা বলতাম। সে বলত, এই তোর আঙুল কী সুন্দর, চাঁপার মত। কেউ আমার হাতের প্রশংসা করত, কেউ বলত আমার নাকি হাঁসের মত গলা। আমার বন্ধুর দাদা বলেছিল, তোর পা-দুখানার যা সেপ, খুব প্রভোকেটিভ। মানে বুঝিনি কিন্তু শব্দটা মনে আছে। আর একজন বলেছিল তোমার কোমরটা এত সরু যে মুঠোয় ধরা যায়। এরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু কেউ আমার মুখের প্রশংসা করেনি। তাই ওসব শুনলেই বাড়ি ফিরে এসে এক ফাঁকে আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম। মনে হত নিশ্চয়ই আমার মুখ দেখতে খারাপ, না হলে লোকে তো প্রথমে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সেই প্রশংসাও জুটলো। পাশের বাড়িতে আমার সমবয়সী কলকাতার একটি ছেলে এসেছিল। সে আড়ালে পেয়ে বলল, তোমার চোখ দুটো কি গভীর, দীঘির মত। আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু আমি সমস্যায় পড়লাম। এতগুলো মানুষ আলাদা আলাদা করে হয় আমার আঙুল, নয় হাত পা, নয় গলা অথবা চোখকে সুন্দর বলছে। এই পুরো আমাকে কেউ সুন্দর বলছে না। একদিন আমার চেয়ে একটু ছোট একজন নিরালায় পেয়ে ফস্ করে বলল, এই তোর বুকে হাত দিতে দিবি? কি সুন্দর বুক তোর। আমার খুব রাগ হয়ে গেল। ছেলেটা বুকের কথা বলেছে বলে যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি ও মিথ্যে বলছে। ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুই বুঝলি কি করে? আমার গায়ে জামা নেই? ছেলেটা এমন ঘাবড়ে গেল আর কোনদিন বিরক্ত করেনি। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম আমার চেয়ে যারা বয়স্ক তারা শরীরের সেইসব অঙ্গের প্রশংসা করে যা দেখতে পওয়া যায় কিন্তু যে আঙুলের প্রশংসা করছে তাকে আঙুল ধরতে দিলে তাই নিয়ে সারা জীবন বসে থাকবে না। সে সুযোগ পেলেই ঢাকা শরীরের দিকে এগোবে। এটা বোঝবার পর মনে হল সবাই আমার সঙ্গে ভান করছে। আর তাই কাউকেই আমার ভাল লাগল না।'

চুপচাপ কথাগুলো শুনতে শুনতে হাঁটছিল অনীক। এত স্পষ্ট গলায় কোন মেয়ে যে তার উপলব্ধির কথা বলতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি। এখন চাঁদ মাথার ওপর চলে এসেছে। চমৎকার সাদা এক নাম-না-জানা পাখি উড়ে গেল জ্যোৎস্না মেখে। অনীক গল্পের রেশ ধরে রাখতে চাইল, 'বিয়ের পরে?'

'আপনার এসব শুনে কি লাভ?' আচমকা প্রশ্ন করলেন রাণু।

'আপনাকে জানতে ইচ্ছে করছে, তাই।

'কখন থেকে ?'

'মানে ?'

'এই জানার ইচ্ছেটা কখন থেকে হয়েছে ? আপনি তো আমাদের কোয়ার্টাসে বসতেই চাইছিলেন না। ঠিক কি না ?'

'হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর—। ঠিক আছে।'

'না ঠিক নেই। বিয়ের পর যারা প্রেম নিবেদন করেছে তাদের বক্তব্য একইরকম। আমার সঙ্গে আমার স্বামীকে মানায় না, আমাকে অনেক অনেক সুখী করতে পারে তারা যদি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাই তাদের সঙ্গে। অথবা স্বামীর কাছেই থাকি আর তারা লুকিয়ে চুরিয়ে আমাকে সঙ্গ দেবে।' হাসলেন রাণু 'আসলে আমরা খুব বোকা। আমরা কেউ বুঝিনা সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয় কি কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি। আমরা কেউ ভাবতে চাই না আমার বুকে প্রেম এল যার জন্যে, তার অনুভূতি কি রকম ? সে কি আমাকে চাইছে ? শুধু মানুষের বেলায় নয়, এই যাকে আমরা প্রকৃতি বলি, এই জ্যোৎস্না, গাছপালা, ফুল অথবা আকাশ—এরাও কি আমাকে চায় ? আমি চাইলেই কি ওদের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল ? ওদেরও তো চাওয়া দরকার। আমার স্বামী বলেন, ওদের প্রাণ নেই, থাকলেও বোঝার এবং বোঝানোর ক্ষমতা নেই। কি বোকা-বোকা কথা বলুন তো ! আপনি একটা গাছের কাছে রোজ আসুন, তাকে ভালবাসুন, তার শরীর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দিন, দেখবেন যেই তার আপনাকে ভাল লাগবে, অমনি সে কেমন চনমনিয়ে উঠবে, যা অন্য কেউ এলে হবে না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন রাণু। তাঁর চোখ সামনের দিকে। অনীক দেখল মাঠের গায়ে গাছপালার মধ্যে মন্দিরের আদল দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'ওপাশে যাব না।'

'কেন ?'

'ওখানে একজন মহিলা থাকেন। লোকে বলে ভৈরবী।'

'ও, ওর কথাই তখন বলছিলেন।'

'ভদ্রমহিলা দিনের বেলায় বের হন না। জ্যোৎস্না রাত্রেও নয়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে ঘুরে বেড়ান মাঠে মাঠে। শুনেছি রাত্রে দেখতে পান।'

'অদ্ভুত !'

'আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারি না। উনি সেই থুরথুরে অন্ধ পেঁচার মত যে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধঝাঁকে জোনাকির মাখামাখি কোনদিন দেখতে পাবে না, উল্টে বলবে, 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে, চমৎকার। ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার।'

অনীক হেসে ফেলল শব্দ করে। রাণু মুখ ফেরালেন, 'হাসছেন কেন ?'

'আমি লাইনটার অন্য অর্থ জানি।'

'যেমন ?

'পরের লাইনে তিনটে শব্দ আছে, তুমুল গাঢ় সমাচার। একটা অন্ধ জরাগ্রস্ত পেঁচার কাছে দু-একটা ইঁদুর ধরতে পারা মানে বেঁচে থাকা। বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করা। পৃথিবীর সমস্ত অশক্ত মানুষ যে সংগ্রাম করছে, এ তারই প্রতিচ্ছবি। জীবনের এই স্বাদ আপনার অসহ্য বোধ হলো ?'

'এ আপনার ব্যাখ্যা। আপনাদের। আমি এ মানি না।'

'কিন্তু কবিতা শুধু শব্দের ব্যবহারে নয়, শব্দ থেকে উঠে আসা দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয় মানেতে তার বিচরণ।'

'হয়তো। কিন্তু যে পেঁচা সারারাত জ্যোৎস্নার ফিনিক দেখে মুখ গুঁজে রইল সে চাঁদ ডুবে গেলে ছটফটিয়ে ইঁদুর ধরতে বেরিয়ে আসবে, এ কোন অসুন্দর। তাছাড়া, মশাই, মনে রাখবেন, ওই পেঁচাটি অন্ধ ছিল। অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত। সে কি করে বুঝবে কখন আলো জ্বলছে অথবা নিবে গেছে ?'

অনীক হোঁচট খেল। সত্যি তো। অন্ধ শব্দটি নিয়ে সে কখনও ভাবেনি।

রাণু হাসলেন, 'অন্ধত্ব তাহলে অভ্যেসের কাছে হার মানে। তাই না ?'

অনীক আপত্তি জানাল, 'সব পেঁচাই অন্ধ হয়ে যায় আলো জ্বললে। জ্যোৎস্নাও তো আলো, এই যেমন চারপাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পেঁচার কথা থাক, ওই ভৈরবী নিশ্চয়ই অন্ধ এবং থুরথুরে নন ?'

'চেহারায় নয়, মনে। নইলে দিনের বেলায় দেখা দেয় না কেন ? কোন জ্যোৎস্না রাত্রে ওকে দেখতে পাই না কেন ?'

'হয়তো নিজেকে আড়ালে রাখতে চান।'

'আপনি ওর কাছে যেতে চান ?'

'আগ্রহ যে হচ্ছে না তাই বা বলি কি করে ?'

'তাহলে এখন ফিরে যান স্টেশনে। অমাবস্যায় আসুন। যখন এইসব চরাচর অন্ধকারে ডুবে যাবে, ডুবে গিয়ে চরিত্র হারাবে, তখন নিজেকে হারান।'

'আপনি অন্ধকারকে খুব ভয় পান, না ?'

'আপন পান না ?'

'হ্যাঁ, পাই।'

দু-চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ তুললেন রাণু, 'আচ্ছা, আপনি কি রকম লোক ? আমার কি কিছুই আপনার ভাল লাগছে না ?'

'নিশ্চয়ই লাগছে।'

'সেটা আমার আঙুল, হাত পা গলা মুখ অথবা বুক নয়, তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'সব মিলিয়ে এই আমি, আমাকেই, কি না ?'

'আমাকে নিয়ে কোথাও হারিয়ে যেতে, অথবা আমার সঙ্গে গোপনে আনন্দ করতে নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে করছে না?' রাণু চোখ খুলছিলেন না।

অনীক একটু ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে?'

'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু, গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো।' মন্ত্রমুগ্ধের মত লাইনগুলো আবৃত্তি করল অনীক। এ যেন তার কথা, তারই কথা।

চোখ খুললেন রাণু। যেন নক্ষত্রের উজ্জ্বল জলে তার চোখ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। খানিক আগে যে ধবল পাখি জ্যোৎস্নায় মিশে গিয়েছিল সে যেন কোন নাম-না-জানা ফুলের ফুটে ওঠার খবর নিয়ে এল। এই তিরতিরে রাত্তিরে, নির্জনতা যখন বড় ভয়াবহ, হাওয়ায় এক অতীন্দ্রিয় কাঁপন টের পেয়ে গাছেরা পুলকিত, এই তারা-জ্বলা রাতে রাণু এগিয়ে এলেন অনীকের সামনে বললেন, 'আমি এক সামান্যা নারী, তুমি আমাকে অসামান্যা কর।'

মুগ্ধ তো ছিলই, লুব্ধ হল অনীক। রক্তে সর্বনাশের ঝড় উঠল, বুকে গোখরোর ফণা। এখনও সে সেই পুরুষ যার কোন যোনীচক্র স্মৃতি নেই। প্রতিটি রোমকূপে এখন দাউদাউ চিতা। তবু সে কথা বলল, 'রাত ফুরুলে কি হবে?'

'আপনি চলে যাবেন।'

'আর তুমি?'

হেসে উঠলেন রাণু, 'আমি এইসব গাছপালা, জ্যোৎস্না আর আকাশের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে দারুণভাবে বেঁচে থাকব।'

'আমি যদি না যাই?'

'আপনি রসিকতা করছেন।'

'রসিকতা?'

'এক তিল বেশি রাত্রির মত আপনার জীবন। সেই এক তিল কম আর্ত রাত্রি আমি। অতএব আপনার জীবনের কাছে আমি মূল্যহীনা।'

'আমি মানি না। যখনই জ্যোৎস্না ফুটবে, চরাচর এমন স্বপ্নিল হয়ে উঠবে তখনই আমি দু হাত বাড়িয়ে তোমাকে চাইব।'

'কিন্তু যেই চাঁদ ডুবে যাবে, যখনই অন্ধকার নামবে অথবা ভোরের শিশির শুকিয়ে সূর্য উঠবে তখন আমি ছায়ার মতনও থাকব না আপনার মনে। আর তার জন্যে আমার কোন আক্ষেপ নেই। এই এক রাত্রি যত দিতে পারে তাই জীবনভরে নিতে চাই।' স্পষ্ট আহ্বান খোদিত হল রাণুর চোখে মুখে শরীরে।

কালো মেঘ যা এতক্ষণ ইতিউতি ছড়িয়ে ছিল, যেন এই কথা শুনে গড়িয়ে এল চাঁদের বুকে, চটজলদি জ্যোৎস্না উধাও। শ্লেট রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। চক্ষুষ্মান হয়ে পেঁচা খুঁজে ফিরতে শুরু করল তার রাতের আহার। রাণুর আক্ষেপ শোনা গেল, 'আহ, এ কেন হল?'

আর তখনই অনীক দেখল। দেখল না বলে দর্শন করল বলা ঢের ভাল। জঙ্গল ঘেরা মন্দির থেকে একটি মূর্তি চকিতে বেরিয়ে এল মাঠের মধ্যে। দু-হাত আকাশে তুলে যেন সে মেঘগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে চাঁদের বুকে অথবা তাদের আটকে রাখতে চাইল যেমন করে বেয়াড়া সূর্যকে বগলে দাবিয়ে রেখেছিল পবনপুত্র।

অথবা এ সবই অনীকের মনে হওয়া। মহিলা মাথার ওপর হাত তুলে আরাম করলেন। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেলেন ঝোপের আড়ালে। মিলিয়ে যাওয়ার আগে মনে হল তিনি বসে পড়লেন। ওই কালচে আলোয় চারপাশ বেশ অস্পষ্ট। অনীক রাণুর দিকে তাকাল। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ভৈরবীর উপস্থিতি তিনি জানেন বুঝতে অসুবিধে হল না। সেই মুহূর্তেই দূরের ঝোপের আড়ালে মূর্তিটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। মাথা এবং কাঁধ প্রথমে দৃশ্যমান হবার পর শরীরটা বেরিয়ে এল। অনীকের মনে হল ভৈরবীর কোন রহস্য নেই। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাকেও ঝোপের আড়ালে আসতে হয়। হয়তো মন্দিরে কোন টয়লেট নেই। এসব অঞ্চলে সেটা স্বাভাবিক।

'চলুন, মহিলার সঙ্গে আলাপ করি।'

'না।

'কেন ?'

'ও আপনাকে একটা ছাগল কিংবা ভেড়া করে দেবে।'

'দূর। এসব কখনও হয় নাকি ?'

'আপনি বুঝতে পারবেন না। ছাগল ভেড়ারা বুঝতে পারে না, তারা কি।'

অনীক হাসল, 'হ্যাঁ। মানুষের মধ্যে অনেক ছাগল ভেড়া আছে, অন্তত বিশেষ বিশেষ মহিলাদের সঙ্গে তারা সেইরকম আচরণ করে।'

'তবে ?'

'আমার তো সেই ভয় নেই। রক্ষাকবচ আছে, আপনি।'

রাণু কেঁপে উঠলেন, 'সত্যি বলছেন ?'

'সত্যি।'

ওরা এবার এগোল। রাণুর পায়ে এখনও জড়তা। মাঠের মাঝখানে সেই নারী যাকে ভৈরবী বলা হয়, একা। দুটি মানুষের পায়ের চাপে ঘাসেরাও শব্দহীন। অনীক দেখল একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেও মহিলা তাদের যেন ঠিকঠাক লক্ষ্য করছেন না। গেরুয়া শাড়ী জড়ানো শীর্ণ শরীরটি কি কখনও সুন্দরী ছিল ?

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ এবং মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না এই রমণী প্রায় অন্ধ। আপ্রাণ চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ? কেউ কি ওখানে ?'

অনীক কথা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা।'

'এত রাত্রে এখানে কেন ?'

'এমনি। চাঁদের আলোয় পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

'বাঃ। দেখা হলো ?'

'না। মানে এখনও মন ভরেনি।'

'ওইটাই মুশকিল। কোনদিন মনে ভরে না। তোমাদের সন্তান নেই ?'

হকচকিয়ে গেল অনীক। রাণু ঠোঁট কামড়ালেন।

'ও। হয়নি বুঝি ? মাকে ডাকো, হবে। সন্তানই তো সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে।' আচমকা পায়ে মেপে মেপে রাস্তা করে ভৈরবী চলে গেলেন মন্দিরের দিকে। একটা পোড়ো ছোট মন্দির যার চারপাশে জঙ্গল। সাধারণত গ্রামের মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে এইসব মন্দিরে আসে আর তাই বেঁচে আছেন ভৈরবী।

এখন এই মাঠে ওরা দু-জন। অনীক হাসল, 'দেখলেন তো, আপনার কল্পনার সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। একজন স্বাভাবিক বয়স্কা মানুষ, চোখে হয়ত ছানি পড়েছে। কোন কিছু বানাতে উনি পারেন না।'

'কে বলল ?'

'মানে ?'

'ওই যে কথাটা বলে গেল, সন্তান, সন্তান হয়নি, তাহলে আমার সঙ্গে কারো তো সম্পর্ক হবে ন। আমি যাকে ভালবাসব, যে আমাকে ভালবাসবে, আমাদের কোন সম্পর্ক তৈরী হবে না যতদিন না সন্তান আসবে। মনের মধ্যে এই যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল ও, এও তো বশীকরণ।' গোঙানি ফুটল রাণুর গলায়।

'এ বশীকরণ নয়, এ আনন্দের উৎসাহ। আপনি উৎসাহিত হচ্ছেন না কেন ?'

'কি করে হব ? আমি যাদের ভালবাসি, এই মাটি, গাছ, চাঁদ, আকাশ এরা আমার বৃদ্ধ, স্থবির প্রেমিক। আমি যাকে ভালবাসি না, যিনি আমার স্বামী, তিনি অক্ষম। আমার সন্তানের জন্য আঁতুরঘর আর শ্মশানের চিতা একাকার।' রাণুর আক্ষেপ শেষ হওয়া মাত্র মেঘ সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। চাঁদ হেলে গেছে অনেকটা। দু-হাত বাড়িয়ে রাণু বললেন, 'আপনি কি রকম পুরুষ ?'

এখন চারপাশ দিনের আলোর মত আলোকিত। অনীক বলল, 'আপনাকে জননীর সম্মান দিতে গিয়ে আমি পিতৃত্বের অধিকার হারাবো। আমি যে পিতা হতে চাই।'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন রাণু, 'সেটা কিভাবে সম্ভব ?'

'আমি জানি না।'

'যদি ও রাজি হয় আমাকে মুক্ত করে দিতে—।'

'আমি প্রস্তুত।'

'তাহলে চলুন, এখনই. এই রাত্রে ওর কাছে ফিরে যাই, গিয়ে কথা বলি।'

ওরা দুজনে দ্রুত জ্যোৎস্না মাড়িয়ে ফিরে এল সেইখানে যেখানে স্টেশনমাস্টারকে রেখে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল মানুষটা নেই। অনেক ডাকাডাকিতেও তার সাড়া পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন রাণু বললেন, 'বড্ড ঘুমকাতুরে। নিশ্চয়ই ফিরে গেছে বাসায়। চলুন।'

যেতে যেতে চাঁদ দিগন্তে চলে যাচ্ছিল। অদ্ভুত প্রাচীন এক ছায়া নেমে আসছিল পৃথিবীতে। স্টেশনের কাছে পৌঁছে ওরা থমকে দাঁড়াল। স্টেশনমাস্টার তাঁর পোশাক পরে তৈরি, এমন কি তার পোর্টারও উর্দি এঁটে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র ভদ্রলোক বললেন, 'আজ ভোরে এখান দিয়ে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল। কি মনে হতে মাঝরাতে ফিরে এলাম। এসে বেঁচে গেলাম।'

রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?'

'তার এসেছে। ট্রেনটা এখানে, আমার এই স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে থামবে। খুব বড় বড় ভি আই পি থাকবে গাড়িতে। তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে চাকরি চলে যেত।'

ব্যস্ততা বাড়ল। দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'এই সময় ওঁকে অন্যরকম দেখায়।'

'হ্যাঁ। বেশ দায়িত্বশীল মানুষ।'

'ইস্, চাঁদ ডুবে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ঘুম পাচ্ছে না?'

'তেমন নয়।'

'চা খাবেন? আমি খুব ভাল চা করতে পারি।'

'তা তো জানি।'

'না। সন্ধ্যেবেলার মত নয়, ভোরের চা অনেক ভাল হবে।'

'থাক। ভাবছি এই ট্রেনে যদি চলে যাই কি রকম হবে?'

'ভি আই পি-দের সঙ্গে?'

'তা কেন? একটু জায়গা পেলেই হবে। ওঁকে বলব?'

'আপনার কোন চিন্তা নেই। উনি বললে কেউ না বলতে পারবে না।'

ট্রেনটা এল। ঝাঁকে ঝাঁকে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। বড় বড় ভি আই পি-রা ঘুমাতে ব্যস্ত। গার্ড এলেন হনহনিয়ে। স্টেশনমাস্টার তাঁর সঙ্গে ব্যস্ত। অনীক তাকাল রাণুর দিকে। কী দারুণ গর্বিতা রমণীর মত চেয়ে আছে ট্রেনটার দিকে। যে কারণে ফিরে আসা, তা এখন এই মুহূর্তে মনে করিয়ে দেওয়ায় মন সায় দিল না।

ফাঁকে পেয়ে স্টেশনমাস্টার এগিয়ে আসতেই অনীক তাঁকে ইচ্ছে জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'চলে যাবেন? ও। আচ্ছা আসুন। একেবারে প্রথম কামরা খালি আছে।'

অনীক বলল, 'এলাম।'

'ভাল থাকবেন।' রাণু বললেন।

'আর কিছু বলবেন না?'

'না।' মাথা নাড়লেন রাণু।

জীবনে অনেকবারই এমন হয়েছে। ঠিক সময়ে নিজেকে মেলতে পারেনি বলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজ ওই জ্যোৎস্নায় মাঠে কেন সক্রিয় হয়নি বলে আজ সে আফসোস এই বুকে তা আজীবন বহন করতে হবে। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। অনেক পেছনের প্ল্যাটফর্মে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়তেই খেয়াল হল। ঝোলাটা পড়ে আছে স্টেশনমাস্টারের বারান্দায় পাতা চেয়ারে। সেই ঝোলায় ডায়েরী, টাকা পয়সা। ডায়েরিটা বড় জরুরি। চটজলদি নেমে পড়ল অনীক। নামতে নামতে অনেকটা দূরে। শব্দ তুলে ট্রেনটা চলে গেল ভোর ভোর পৃথিবীতে।

একটু দাঁড়াল সে। এই যে ফিরে যাওয়া এ বড় অস্বাস্তির। রাণু কি একে বাহানা ভাববে। ভাবলেও উপায় নেই। ডায়েরিটা তার দরকার। শ্লথ পায়ে সে যখন স্টেশনের সামনে ফিরে এল তখন জায়গাটা ফাঁকা। রামবিলাস না কি যেন নাম পোর্টারের, দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ । ওর পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। কোয়ার্টার্সে কোন আলো জ্বলছে না। ওরা কি এর মধ্যে ঘরে ফিরে গেছে? সে ধীরে ধীরে বারান্দায় এল। ঝোলাটা পড়ে রয়েছে চেয়ারে। সেটা তুলে নিতেই কান্নার আওয়াজ কানে এল। ডুকরে ডুকরে কান্না। তারপর স্টেশনমাস্টারের গলা বাজল, 'শান্ত হও। শক্ত হও রাণু।'

'আমি আর পারছি না।' কান্না ছিটকে উঠল।

'কিছুই হল না?' অদ্ভুত অসহায় গলা স্টেশনমাস্টারের।

'কিচ্ছু না। এত কথা বলেছি, এত কথা—!' রাণু ককিয়ে উঠলেন, 'আমাদের কি হবে?'

'আমরা অপেক্ষা করব।' শান্ত গলায় জবাব দিলেন স্টেশনমাস্টার। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অনীক। এই ভোর ভোর অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে যেন সেই অন্ধ থুবথুরে পেঁচা বলে উঠেছে, *'ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার।'*

ইচ্ছে বাড়ি

পঞ্চাশে পা দেওয়ার আগে অন্তত পঁচিশবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছে অরবিন্দ কিন্তু কখনও দু'রাতের বেশি থাকেনি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছড়িয়ে আছে পূর্বপল্লী এবং রতনপল্লীতে। ষাট-সত্তর বছরের বাড়ি সব। বিরাট বাগান, অনেক ঘর! সঞ্চয়িতা এবং গীতবিতান ছেঁকে নামকরণ করা হয়েছিল তাদের। সেই সব বাড়ির মালিকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়েছেন এমন কয়েকজন বন্ধুর পিতাকে সে যৌবনে দেখেছে। অরবিন্দ লক্ষ করত ওসব বাড়িতে একটা গম্ভীর- গম্ভীর ভাব ছিল, এমন-কি সন্ধের পর মদ খাওয়ার সময়ও কেউ চপল রসিকতা করত না। এঁরা যে ব্রাহ্ম তা নয়, কিন্তু কেউ বাড়িতে সন্ধ্যা মুখার্জির গান গাইত না। কলকাতার এত কাছে জায়গাটা চুপচাপ পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে। বর্ষায় বৃষ্টি দেখতে অথবা দোল কিংবা পৌষ উৎসবে মানুষ ছুটে যেত ক'দিনের জন্যে। হঠাৎ আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতার বাবুদের মনে হল শান্তিনিকেতনে বাড়ি বানালে চমৎকার হয়। যে জমির দাম ছিল এক হাজার, তা হয়ে গেল ছাব্বিশ। খাল পেরিয়ে যে ধু-ধু প্রান্তর সামনে পড়ে থাকত, তাতে গজিয়ে উঠল সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এখন কি প্রান্তিকের মাঠের জমিও বারো হাজার কাঠায় উঠে এল, যেখানে সন্ধের পর প্রদীপ জ্বলত না বারো বছর আগে। বন্ধুরা বলল, 'অরবিন্দ, চটপট একটা জায়গা কিনে ফেল, বাড়ি না বানাও এর চেয়ে ভাল ইনভেস্টমেন্ট আর হয় না।'

অরবিন্দকে সবাই সফল মানুষ বলে। কলকাতা শহরে তাঁর একটি চালু ব্যবসা আছে। বছর পনেরো আগে মাত্র দেড় লাখ টাকায় যে ফ্ল্যাট কিনেছিল অর দাম এখন ষোল লাখ। কলকাতার কয়েকটা বড় ক্লাবের মেম্বার সে। নিজে কিছু করে না বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে কোনও অসুবিধে হয় না। ওর একমাত্র ছেলে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করে যাদবপুর থেকে বি ই ডিগ্রি নিয়ে এখন আমেরিকায় পড়ছে। অরবিন্দর স্ত্রী ইতি বড় ভাল মানুষ। খুব হাসেন। দেখলেই বোঝা যায় স্বামী সম্পর্কে কোনও বড় অভিযোগ নেই। ইতি নিজের চেহারাটাকে বুড়িয়ে যেতে দেননি, অত বড় ছেলের মা বলে মনে হয় না। তুলনায় অরবিন্দর মনে একটু দুঃখ থাকা স্বাভাবিক। ইদানীং ঝুপঝুপ করে টাক পড়ছে তার। তা টাক তো সব মানুষকেই মেনে নিতে হয়েছে। ইতি প্রায়ই অনুপম খেরের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন একজন পঞ্চাশে পা

দেওয়া মানুষকে সফল না বলে উপায় কি! ওকে ধার করতে হয় না, গাড়ি আছে, ব্যবসাটা দুদিন না দেখলে অচল হয় না।

মাস তিনেক আগে ওরা চার বন্ধু শনিবারের শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চেপেছিল। বিকেল রাত সকাল কাটিয়ে দুপুরে ফিরে আসবে। রতনপল্লীর ববি গুহর বাড়িতে ওরা উঠেছিল। ববিও ওদের সঙ্গে এসেছে। আসা মাত্র দারোয়ান চাকররা চরকির মতো ছুটছে। সন্ধে হল। চাঁদ উঠল। ববি গুহর বাগানঘেরা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসা হয়েছে। কলকাতা থেকে আনা হুইস্কির সঙ্গে মাছভাজা চলছে। ঢাউস চাঁদের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দর হঠাৎ মনে হল পঞ্চাশ বছর পরে সে আর ওই চাঁদটাকে দেখতে পাবে না। পঞ্চাশ বছর পরে তার বয়স একশো হবে। দূর, অতদিন কি, চল্লিশ বা তিরিশ বছর পরেও যে দেখতে পাবে, তার নিশ্চয়তা কী! সে চুপচাপ বন্ধুদের দিকে তাকাল। ওরা কথা বলছে। পঞ্চাশের গায়ে বয়স সবার। তিরিশ বছর পর এদের অনেকেই থাকবে না। চল্লিশের পর তো নয়ই। কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে দুশো বছর বাদেও এখানে বসে মাল খাবে। রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বয়সে মারা গিয়েছেন এবং তারপর বাঁচা বাঙালির আশা করাই উচিত নয়। অর্থাৎ তিরিশ বছরটাই তা হলে ম্যাক্সিমাম আয়ু। অরবিন্দর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তখনই গেট খুলে সে লোকটাকে ঢুকতে দেখল। জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে একটা সাদা জামা এবং ধুতি এগিয়ে আসছে। ববি গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'হু ইজ হি?'

ততক্ষণে লোকটা সামনে এসে গিয়েছে। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি বোধ হয় এ সময় এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম।'

ববি গুহ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

'আজ্ঞে, আমি মদ বিক্রি করি।'

'মাই গড! তা এখানে কি দরকার?'

'আজ্ঞে, আপনারা আমার ওপর অবিচার করছেন। আপনারা প্রায়ই আসেন, কদিন থাকেন, কিন্তু কলকাতা থেকে মদ কিনে এনে খান। আমি স্থানীয় মানুষ, যদি আমাকে সুযোগ দেন, তা হলে কলকাতা থেকে বয়ে আনার কাজটা করতে হয় না।'

'বোলপুরে আপনার মদের দোকান আছে?'

'আজ্ঞে না। তবে যে-কোন মদ আমি এনে দিতে পারি। স্কচ খেতে চাইলে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস দিতে হবে। আমি একেবারে কলকাতার দামেই দেব।'

'কোত্থেকে দেবেন?'

লোকটি বিনীত গলায় বলল, 'ব্যবসার গোপনীয়তা জানতে চাইবেন না স্যার।'

'আমরা যে মদ খাই, তা আপনি জানলেন কি করে?'

'চেহারা দেখে।'

সৌমেন চুপচাপ শুনছিল। চাপা গলায় বলল, 'আমার বউ সেদিন বলছিল রোজ মদ খেয়ো না। এর পর লোকে চেহারা দেখে বুঝতে পারবে।'

ববি গুহ ধমকালো, 'রসিকতা করছেন? চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছেন?'

'আজ্ঞে, আপনারা চারজন শিক্ষিত সম্পন্ন মানুষ ছেলেমেয়েদের না নিয়ে এখানে এসেছেন। আপনারা শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতে যান না, প্রান্তিকের মাঠে হাঁটতেও দেখি না। অবশ্য এখন আর মাঠ কোথায়? মেয়েমানুষের দোষও আপনাদের নেই। চারজন ব্যাটাছেলে সন্ধেবেলায় একসঙ্গে থাকলে যদি একটু মদ খায় তাতে তো কোনও ক্ষতি নেই। এই দেখুন, আজ শনিবার, রতনপল্লীর পাঁচটা বাড়ি আর পূর্বর ছটা, মোট এগারোটা বাড়িতে পঞ্চাশ জন মানুষ অন্তত ষোল-সতেরোটা বোতল আজ শেষ করবে। পরিমাণটা আপনি ভাবুন!'

লোকটি কথা বলছিল খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে। ববি গুহ বন্ধুদের দিকে তাকাল। এবার অরবিন্দ কথা বলল, 'আমরা তো কালই চলে যাচ্ছি। এ যাত্রায়—।'

'আবার তো আসবেন। তা হলে কথা হয়ে গেল—।' লোকটা হাসল, 'আমি প্রতিদিন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস অ্যাটেণ্ড করি। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় ডান দিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পাবেন। তখন অর্ডারটা দিয়ে দিলেই ঠিক পৌঁছে যাবে।'

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'মধুসূদন দত্ত।' লোকটি নমস্কার করে গেটের দিকে চলে গেল।

ববি বলল, 'অদ্ভুত! মধুসূদন দত্ত শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করে বেড়াচ্ছে?'

অরবিন্দ বলল, 'লোকটা খুব সরাসরি কথা বলে। একসময় এরকম সেলসম্যানের কথা শান্তিনিকেতনে কেউ চিন্তাও করতে পারত না।'

সৌমেন বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে ওকে দূর করে দিতেন।'

ববি গুহ বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এইভাবে বারান্দায় বসে আমরা মাল খেতাম কি না সন্দেহ আছে।'

দেবব্রত চুপচাপ মানুষ। তবু বলল, 'আচ্ছা সে সময় অত বিখ্যাত মানুষ এখানে আসতেন, থাকতেন, তাঁরা পান করতেন না, এটা বিশ্বাস করতে পারি না।'

আলোচনা অন্য দিকে ঘুরে গেলে অরবিন্দর মনে হল ওই মধুসূদন দত্তর সঙ্গে আর একটু কথা বললে ভাল হত। লোকটা এতদিন কি করত, মদ বিক্রি করা ছাড়া আর কিছু করে কি না, পরিবার আছে কি না অথবা কখনও কবিতা লিখত কি না, এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারত।

পরদিন ফেরার সময় দেখা গেল হাওড়া থেকে ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। রবিবার বলে প্ল্যাটফর্মে ভিড় খুব। অরবিন্দ গেটের কাছে পৌঁছে ডান দিকে তাকাতেই মধুসূদন দত্তকে দেখতে পেল। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে একাই এগিয়ে গেল, 'চিনতে পারছেন? কাল রাত্রে—।'

'বিলক্ষণ। কলকাতার এক পার্টি আসছে। প্রান্তিকে উঠবে। ওদের জন্যে ভদকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগের বার অর্ডার করে গিয়েছিল। এখন ট্রেন বেশি লেট করলে দুপুর পেরিয়ে যাবে, সন্ধে নামলে কেউ ভদকা খায় না, চিন্তা হচ্ছে।' কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো মুখ করে বলল মধুসূদন দত্ত।

'আপনি এখানে অনেক বছর আছেন ?'

'তা আছি। আপনি এখানে স্থিতু হবেন না ?'

'বন্ধুবান্ধবের বাড়ি আছে, দিব্যি আসছি, যাচ্ছি—।'

'দূর ? প্রত্যেক মানুষের তো একটাই জীবন। সেই জীবনে কিছু-না-কিছু রেখে যেতে হয় পরের প্রজন্মের জন্যে। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান, যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি রেখে যেতে পারেন।'

'কে করবে? আমার পক্ষে তো আর দাঁড়িয়ে থেকে করানো সম্ভব নয়।'

'কোনও দরকার নেই। আমি আছি। ইচ্ছে হলে খবর দেবেন।'

ওই যে কথাটা, কিছু রেখে যাওয়া তা ঢুকে গেল বুকে। লোকে বলবে, এই বাড়িতে অরবিন্দবাবু থাকতেন। বন্ধুরা বলল, লাখ চারেক খরচ করলে মোটামুটি মাথা গোঁজার জায়গা হয়ে যাবে। শুনে ইতি বলল, 'মাঝেমধ্যে বেড়াতে যেতে পারি কিন্তু পাকাপাকি থাকতে পারব না।'

'এখন কে থাকতে বলছে ? বুড়ো বয়সে—।' অরবিন্দ বলতে গেল।

'সেই বয়স এলে দেখা যাবে।'

অরবিন্দ চলে যাওয়া ইতিকে দেখল। সাতচল্লিশ প্লাস। আর ম্যাক্সিমাম এগারো বছর। মানে এগারোটা পুজো, এগারোটা পূজাসংখ্যা। অথচ এমন ভাব বুড়ো হতে প্রচুর দেরি। একটা মানুষ জন্মাল, বড় হল, ছেলেমেয়ে আনল, বুড়ো হল এবং মরে গেল। কেন এল, কেন গেল, তা নিয়ে একবারও ভাবল না।

আর এই ভাবনাটাই অরবিন্দকে কদিন বাদে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেল। গেটের ডান দিকেই পাওয়া গেল মধুসূদন দত্তকে। মধুসূদন হাসল, 'এবার একা ? কি দেব ?'

'আমি ট্যুরিস্ট লজে উঠছি। বিকেলে দেখা করবেন। আমার নাম অরবিন্দ মিত্র।'

বিকেলে মধুসূদন দত্ত এল। সঙ্গে সেই ব্যাগ। তাকে বলল, 'আমি এখানে একটা ছোটখাটো বাড়ি করতে চাই। আপনি বলেছিলেন—।'

'জমি কিনে বাড়ি বানাবেন, না পুরনো বাড়ি কিনে ঠিকঠাক করে নেবেন ?'

'পুরনো বাড়ি কেনা ঠিক হবে ? নিজের মনের মতো তো হবে না।'

'তা ঠিক। পূর্বপল্লীর শেষ প্রান্তে জমির দাম এখন চব্বিশ। প্রান্তিকে যেতে যেখানে সুনীলবাবু অর্ঘ্যবাবুদের বাড়ি সেখানে পনেরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিকের কাছে বারোতে পাবেন। তবে আমি সাজেস্ট করব পূর্বপল্লীতেই বাড়ি বানান। একটু কমে পেয়ে যেতে পারি।'

খানিকটা আলোচনার পর ঠিক হল কাল সকালে মধুসূদন দত্ত অরবিন্দকে জমি

দেখাতে নিয়ে যাবে। কথা শেষ হয়ে গেলে সে ব্যাগে হাত দিল, 'কি দেব ?'

মনে পড়ল। মাথা নাড়ল সে, 'না না। আমি একা-একা মদ খাই না।'

'ও!' লোকটাকে খুব হতাশ দেখাল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

পূর্বপল্লীর জমি দেখা থেকে শুরু করে তার অধিকার আইনসম্মত করে নেওয়ার যে ঝামেলা, মধুসূদন দত্তই সামাল দিল। হ্যাঁ, অরবিন্দকে কয়েকবার আসতে হয়েছে। সঙ্গে কোনও বন্ধু থাকলে লোকটাকে নিরাশ করেনি। কলকাতার দামেই মদ বিক্রি করে এটা প্রমাণিত। কথাটা পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়ায় লোকটার চাহিদা বেড়ে গেছে।' দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা বোলপুর স্টেশনের গেট পার হওয়ার সময় ডান দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'মধুবাবু, অমুক বাড়িতে উঠছি। আসছেন তো ?

মধুসূদন দত্ত হাত জোড় করে জবাব দেন, 'সেবার সুযোগ দিচ্ছেন, আমি ধন্য।'

এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বাড়ির নকশা করে দেওয়ার আগে প্রশ্ন করেছিল, 'কিরকম খরচ করতে চাও। ছেলে তো আর শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করবে না।'

মাথা নেড়েছিল। আসলে ভেতরে ঢুকে পড়ার পর অরবিন্দর যেন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বাড়ি ইজ বাড়ি। কে থাকছে, কদিন থাকছে, তা ভাবার দরকার নেই।'

অতএব যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হল। ইতি মাঝে একবার দেখতে গিয়েছে। সেটা ভিতপূজোর সময়। দেখে বলেছিল, 'এখানে বাড়ি হলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার। কেউ দেখতে আসবে না।'

ভিত তৈরি হয়ে গেলে মধুসূদন দত্ত বলল, 'প্রথমে দুটো কাজ করতে হবে। এক, পাঁচিল দেওয়া—দুই, গাছ লাগানো।'

'গাছ লাগানো মানে ?' অরবিন্দ বুঝতে পারল না।

'বাড়িটাকে ঘিরে এখন গাছ লাগিয়ে দিলে গৃহপ্রবেশের সময় দেখবেন ওগুলো বেশ ডাগর হয়ে গিয়েছে। এখানকার মাটিতে তরতরিয়ে বাড়ে। তবে কি গাছ লাগাবেন, সেটা ভাবুন। ফুলের গাছ, যেমন, টগর লাগাতে পারেন আবার শিরীষ, দেবদারু, কদম জাতীয় গাছও লাগানো যায়। শেষের গাছগুলো বহু বহু বছর বেঁচে থাকবে। আর যদি সরকারি গাছ কিনে এনে লাগান তা হলে কয়েক বছর বাদে প্রচুর টাকা পাবেন বিক্রি করে। ব্যবসাও হয়ে যাবে।' মধুসূদন দত্ত মতলব দিল।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে কিন্তু জমি থেকে গাছ কাটার কথা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগল। মধুসূদনবাবুকে বলল, 'ইউক্যালিপটাস, শিরীষ, দেবদারু গাছ লাগান চারপাশে। দুটো কদমগাছ থাকবে দুপাশে। কাটাকাটির মধ্যে আমি নেই।'

বাড়ি তৈরি হতে লাগল। গাছ পোঁতাও শেষ। প্রতি শনিবার অরবিন্দ চলে আসে শান্তিনিকেতনে। প্রতিটি ইঁট বসছে আর অরবিন্দর মনে হচ্ছে পাঁজরগুলো তার চেনা হয়ে যাচ্ছে। সিমেন্ট পড়ার আগে বাড়িটার যে আসল খাঁচা, যা বহু বছর খাড়া হয়ে থাকবে তার সঙ্গে পরিচিত হতে যে কি আরাম, তা কাউকে বোঝানো

যাবে না। ইঁটের ওপর সিমেন্ট মেশানো বালি ফেলে আর ইঁট চাপিয়ে যখন উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে তখন যেন সিমেন্ট মেশানো বালি কিরকম মায়া-মায়া হয়ে যাচ্ছে। অরবিন্দর মনে হল সে যখন থাকবে না তখন এই বাড়িটা থাকবে। এত টান সে কখনও অনুভব করেনি।

যেসব বন্ধুরা ইতিমধ্যেই ওখানে বাড়ি বানিয়েছে তারা অরবিন্দকে বোঝাল, 'লোকটার হাতে সব ছেড়ে বসে থেকো না। নিজে সিমেন্ট ইঁটের দরাদরি কর। নইলে মেরে ফাক করে দেবে। কণ্ট্রাক্টর টেন পার্সেন্ট নিয়ে থাকে, তোমার মধুবাবু কত নিচ্ছে কে জানে!'

অরবিন্দ অসহায় বোধ করল। মধুসূদন দত্তের কথা এবং কাজে কোনও অসঙ্গতি পায়নি সে। লোকটা তাকে ঠকাচ্ছে কি না খোঁজ করতে গেলে ওকে অপমান করা হয়। তবে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত লোকটার টিকি দেখা যায় না। অরবিন্দ অনুমান করে, তখন মধুসূদন দত্ত মদের ব্যবসা করে বেড়ায়। এ নিয়ে কোনও আপত্তি করার মানে হয় না। কারণ তার বাড়ি তৈরির কাজে কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না। তবে একটা অস্বস্তি কাটাতে পারছে না, তাকে কি দিতে হবে। সেই জমি কেনা, প্ল্যান স্যাংশান করানো থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের মিটার আনবার দরখাস্ত করা পর্যন্ত যে লোকটা একটুও গাফিলতি করেনি, তার দক্ষিণা কত এটা জানা দরকার। ট্যুরিস্ট লজের ঘরে বসে একবার প্রশ্নটা করেছিল সে। মধুসূদন দত্ত জিভ বের করে শব্দ করল, 'থাক না ওসব। আমিও মরে যাচ্ছি না, আপনিও থাকছেন। অন্তত দু-এক বছর তো আছি। পরে হবে ওসব কথা। আগে মনের মতো বাড়িটা হোক, দেখে প্রাণ জুড়োক, তারপর কথা বলা যাবে।'

অরবিন্দ বলেছিল, 'কিন্তু আগে থেকে জানলে আমি বাজেট করতে পারব।'

'এই দেখুন, বেফাঁস কথাটা বলে ফেললেন। বাজেট। পৃথিবীতে কেউ কখনও তার বাজেট ঠিক রাখতে পেরেছে! অর্থমন্ত্রীরাই পারে না তো সাধারণ মানুষ! তাছাড়া শখের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস অত বাজেট মাথায় রেখে হয় না। শাজাহান কখনওই তাজমহলের জন্য বাজেট করেননি। ঠিক কি না বলুন!' মধুসূদন দত্ত হাসল।

অরবিন্দ শেষপর্যন্ত প্রশ্নটা করে ফেলল, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা কিন্তু আমি জানি না।'

'আপনি স্যার জিজ্ঞাসা করেননি কখনও, তাই বলিনি। আসলে আমার কোনও ঠিকানা নেই। এর কাছে কদিন, ওর কাছে কিছুদিন, এভাবেই চলে যায়। এই যে আপনি বাড়ি বানাচ্ছেন, আপনি তো পাকাপাকি থাকবেন না, হয়তো শনি রবিবারে আসবেন প্রথম প্রথম, তা বাকি পাঁচদিন তালাবন্ধ থাকবে, থাকবে তো? তখন যদি বলেন আমাকে পাহারা দিতে, তা হলে একটা মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে। এই রকম।'

'আপনার পরিবার ?'

'ছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। সন্তান হয়নি, তখন দুবরাজপুরে থাকতাম। চাকরি করতাম। সে ভাবল, আমি অপদার্থ তাই পছন্দসই পুরুষ পেয়ে ছেড়ে গেল আমাকে। লোকে বলেছিল থানায় যেতে, আমি যাইনি। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে চাবুক মেরে কোনও কাজ হয় না।'

'আপনার নামটা নিয়ে কখনও ভেবেছেন ?'

এক গাল হাসল লোকটা, 'কবিতা লিখতাম। বাল্যকালে। চতুর্দশপদী। একেবারে তাঁর নকল করে। বন্ধুবান্ধবরা বলত, ভাল হয়েছে। বড় হয়ে বুঝলাম, কিস্যু হয়নি। লেখার চেষ্টা আর করি না। সবার তো সব হয় না।'

'আর একটা কথা', অরবিন্দ বলল, 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আপনি ঘুরে ঘুরে মদ বিক্রি করেন, কখনও কোন বাধা আসেনি ?'

'আজ্ঞে না! মানুষের প্রয়োজন আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। তিন পেগ মদ খাওয়ার পর টেপে "এ পরবাসে" অথবা "সখী আঁধারে" শুনতে যাদের ভাল লাগে তাদের বঞ্চিত করি না আমি। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করত, সেইভাবে চিরকাল কেন করবে ? সময়ের সঙ্গে গ্রহণ করার ধরনটা বদলাবে না ? তিন পেগ পেটে পড়ার পর "সহে না যাতনা" কেউ যদি সত্যিকারের দরদ দিয়ে গায় তা হলে তাকে কি আপনি রবীন্দ্রবিরোধী বলবেন ? তা ছাড়া সে তো পাবলিক ফাংশানে গাইতে যাচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নির্জনে বাস করছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে অরবিন্দর মনে হল কথাগুলোয় যুক্তি আছে। কলকাতায় তো বটেই, এখানে যে-সমস্ত শিক্ষিত মানুষ সাপ্তাহিক মাসিক অথবা বাৎসরিক ভ্রমণে নিজের বাড়িতে আসে তাদের বয়স এখন পঞ্চাশের সামান্য ওপরে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা চলে গেছেন। সন্ধেবেলায় তারা মদ্যপান, কিঞ্চিৎ খিস্তিযোগে রসালাপ যেমন করেন, তেমন কোনও গাইয়ে সঙ্গে থাকলে রবীন্দ্রনাথের গানও শোনেন। এই মিশ্রিত মানুষেরা কেউ রবীন্দ্রবিরোধী নয়। তফাত এই, এরা কেউ তাঁকে গুরুদেব গুরুদেব করেন না।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি তৈরি হল। গাছগুলো বড় হয়ে গেছে। এক বছরে সব কটা ঋতুর স্পর্শ পেয়ে অনেক অনেক বছরের জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ কলকাতা থেকে চমৎকার আসবাব আনিয়ে নিল। রান্নাঘরে গ্যাস চলে এল। পাখাগুলো ঘুরতে লাগল বনবন করে। তিনটে শোওয়ার ঘর, তিনটে টয়লেট, ডাইনিং কাম বসার ঘর আর বাগানঘেরা একটা বারান্দা। মধুসূদন দত্তর অনুরোধে একটা ছোট জেনারেটারের ব্যবস্থা করেছে সে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকালে মনে হয় স্বপ্নের বাড়ি। কলকাতার ফ্ল্যাট এর কাছে কিছু নয়।

বন্ধুরা বলল, 'গৃহপ্রবেশ কর অরবিন্দ, দল বেঁধে কলকাতা থেকে যাব সবাই।'

ইতি বলল, 'তোমার বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে গেলে থাকতে দেবে কোথায় ?

ওই তো কটা ঘর। সবাইকে বল বিশ্বভারতীতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরে ফিরে আসতে।'

এ কথা বলা যায় না। থাকতে দিতেই হবে এমন তো কথা নেই। ববি গুহর বাড়ি আছে, সন্ধি গুহঠাকুরতার বাড়ি আছে, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির তো অভাব নেই। কিন্তু যে দিনটি গৃহপ্রবেশের জন্যে ঠিক করা হল সেদিন দেখা গেল প্রত্যেকের অসুবিধে। কেউ না কেউ কলকাতায় কাজেকর্মে জড়িয়ে থাকবে। ইতি বলল, 'বাড়িটা আমাদের, আমাদের সুবিধেমত গৃহপ্রবেশ করব, যার সুবিধে যাবে, আমরা দিন পালটাব কেন ?'

অরবিন্দর সেটা মত ছিল না, তবু মানতে হল। বন্ধুরা জানাল, সপ্তাহের মাঝখানে না গিয়ে সামনের শনিবার হাজির হবে। লেটে গৃহপ্রবেশ সেলিব্রেট করবে সবাই। ইতি বলল 'বাঁচা গেল।'

দুই

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝকঝকে সাদা নতুন ডিজাইনের একতলা বাড়ি। পূর্বপল্লীতে এর কোনও জুড়ি নেই। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছগুলো এক বর্ষাতেই তরতরিয়ে উঠছে। কি সবুজ ছেয়ে গেছে বাড়িটার চারধার। প্রাসাদ নয়। কিন্তু ছোট্ট অথচ মজবুত বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক অনেক বছর। একটু যত্ন করলে তিন চারশো বছর থেকে যেতে পারে। যখন অরবিন্দ থাকবে না, তার ছেলে অথবা বংশধর বলবে বাড়িটা যে বানিয়েছিল তার কথা। এটাকেই কি রেখে যাওয়া বলে ?

'কেমন দেখছেন স্যার ?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম মধুসূদন দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন খানিক দূরে।

জবাব দিলাম, 'ভালই। শুধু সাদা রঙটা যেন বড্ড চোখে লাগছে।'

'ধুয়ে যাবে। বর্ষাটা যেতে দিন। শীত পড়লে আর এক প্রস্থ মোলায়েম রঙ মাখিয়ে দেব। হ্যাঁ, শনিবার অতিথিরা আসছেন, কি কি ব্যবস্থা করতে হবে বলে দিন।'

'চারজন এখানে থাকবে বাকিরা বন্ধুদের বাড়িতে। দুপুর আর রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার স্ত্রী অবশ্য তখন থাকতে পারছেন না।'

'না থাকাই ভাল বললে খুশি হতাম।'

'বলতে পারছেন না কেন ?'

'দেখুন, বাড়ি যদি নিজের হয় তা হলে তার কোণে কোণে মায়া জড়ানো থাকে। আর এই মায়া স্থায়ী হয় প্রিয় মানুষীর স্পর্শ পেলে। ঘরের সঙ্গে তাই ঘরনীর সম্পর্ক এত নিবিড়। তিনি থাকলে বাড়ি কখনওই অশুচি হয় না। যাক গে, কত বোতল দেব ? দুপুরে এসেই তো খেতে বসবেন না, ভদকা বা বিয়ারের ব্যবস্থা রাখতে

হবে। আবার সন্ধ্যের পর হুইস্কি। পরিমাণটা যদি বলেন।'

হঠাৎ আমার খারাপ লাগা শুরু হল। এত জ্ঞানগর্ভ কথা বলার পরই লোকটা চট করে ওর মদ বিক্রির ব্যবসায় চলে এল। আমি দেখতে পেলাম আমার বাড়ির লম্বা বারান্দায় বসার ঘরে বন্ধুরা মদ আর চাট নিয়ে বসে আছে। যদি মধুসূদনকে না বলতে পারতাম তা হলে এই মুহূর্তে আমার ভাল লাগত। কিন্তু ওসবের ব্যবস্থা না থাকলে আমার শিক্ষিত ভদ্র রুচিবান বন্ধুরা কি পরিমাণ বিরক্ত হবে, তা আমি জানি। হয়তো বিকেলেই ওরা আসর বসাবে ববি গুহর বাড়িতে। আমার গোঁড়ামি নিয়ে কটূক্তির বন্যা বইয়ে দেবে। মধুসূদনবাবুকে বললাম, 'আপনার তো স্টকের অভাব নেই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন, আমি দাম দিয়ে দেব।' বলেই খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এই যে আপনি বাড়ি বাড়ি মদ বিক্রি করেন, এটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি, না ?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ-ও বলা যায় আবার না-ও।'

'না কেন ?'

'আমি দোকান থেকে এনে আপনাদের দিচ্ছি। এক্সাইজ ডিউটি তো দোকানদার দিচ্ছে, আমি বাহকমাত্র। হরিদ্বারে মাছমাংস খাওয়া যেমন বেআইনি, শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করা তো তেমন অর্থে বেআইনি নয়। খোদ কবিগুরু তাঁর কবিতায় হুইস্কির কথা লিখে গিয়েছেন। আর এখন লোকে মদ খায় কিন্তু মাতলামি করে না। যে করে তাকে অসভ্য বলা হয়, পরের বার আর ডাকা হয় না। তার মানে মদ খাওয়াটাও আর বেআইনি নয়। যাক সে কথা, বাড়িটার একটা নাম দেবেন না ?'

মাথা নাড়লাম। এই নিয়ে ইতির সঙ্গে কদিন কথা হয়েছে। বাড়ির একটা নামকরণ করা দরকার। শ্বেতপাথরের ফলকে সেটা লিখে গেটের মাঝখানে বসিয়ে দিতে চেয়েছে সে। আমি বলেছি গেটে নয়, ঢুকতেই যে দেওয়াল চোখে পড়ে তার মাঝখানে ওটা বসাবো। বাড়ি রইল ঠিকঠাক অথচ গেট ভেঙে গেল এমন তা হতেই পারে। ইতি রবীন্দ্রনাথ হাতড়েছিল। পূর্বপল্লী রতনপল্লীর বেশির ভাগ বাড়ির নামকরণের পেছনে তিনি রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বাড়ি হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নামকরণ হবে এ কি সম্ভব ? ইতি গোটা দশেক নাম ঠিক করেছিল আমার পছন্দ হয়নি। রেগেমেগে সে বলেছিল, 'তা হলে তোমার বাবা-মায়ের নামে নামকরণ কর। মাতৃস্মৃতি পিতৃস্মৃতি গোছের।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ভাগ্যিস বলনি বাড়ির নাম দাও, ইতি।'

ও গম্ভীর মুখে সরে গিয়েছিল আর এ নিয়ে কথা বলেনি। ভাবনাটা তখনই মাথায় এল। বাড়িটার নাম যদি দিই 'অরবিন্দ' তা হলে কেমন হয় ? যুগ যুগ ধরে অরবিন্দ বেঁচে থাকল। তার পরেই খেয়াল হল আশি বছর বাদে লোকে দেখে ভাববে ঋষি অরবিন্দর নামে নামকরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো ভদ্রলোককে নমস্কার-টমস্কার জানিয়েছেন। তখন কেউ আমার কথা ভাববে না। একই নামে

বিখ্যাত কেউ থাকলে এই হয় মুশকিল। এক্ষেত্রে নাম এবং পদবী দুই লিখতে হয়। কিন্তু সেটা কল্পনা করতেই অস্বস্তি হল। লোকে ভাববে, আমি আমার ঢাক নিজেই পেটাচ্ছি। নির্লজ্জ বলতে পারে। বাইরের কেউ মুখের ওপর কিছু না বললেও ইতি ভাবতে পারে সে কথা। কলকাতায় ফ্ল্যাটের দরজার পাশে লেটার বক্সে ওর নাম ওপরে আমার নাম নিচে লেখা আছে। এখানে একা আমার নাম দেওয়ালে থাকলে দৃষ্টিকটু হবে। অথচ আমি নিজের টাকায় বাড়িটা বানিয়েছি, প্রতিটি স্তর নিজের চোখে দেখেছি, এই বাড়ির সঙ্গে বহু বছর নিজের নামটাকে জড়িয়ে রাখার দাবি আমারই আগে। শালা, চক্ষুলজ্জা করেই বাঙালি শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হল। মধুসূদন দত্তকে বললাম, 'একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন।'

'ওই যে বাগানের মাঝখানে খোলা জায়গাটা রয়েছে ওখানে অন্তত তিরিশ ফুট গভীর একটা ভিত করতে হবে। ছয় বাই চার ফুট। মাটির তলায় গাথুনি থাকবে তিরিশ ফুট। মাটির ওপরে ফুট পাঁচেক। খুব মজবুত। কদিন লাগবে?'

'ঘর হবে?'

'না না। একদম সলিড। ভেতরে কোনও গর্ত থাকবে না।'

'এরকম একটা থাম্বা করবেন কেন?'

'দরকার আছে। আজই শুরু করে দিন কাজ।'

স্টেশনে যাওয়ার সময় ইতি দাঁড়িয়ে গেল, 'ওরা গর্ত খুঁড়ছে কেন?'

'পিলার হবে।'

'কেন?'

'এমনি। দেখতে ভাল লাগবে।'

'এত বাজে খরচ কর!' সে গেট পেরিয়ে রিকশায় উঠল। তাকে তুলে দিলাম শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার আগে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি। পাশের বাড়ির মুকুদি, ডক্টর মুখার্জির স্ত্রী, মদ খাওয়া একদম পছন্দ করেন না। ওপাশে মিস্টার হাজরা আছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন, শুদ্ধ মানুষ। বাড়িতে এমন কাণ্ড বন্ধুদের নিয়ে করো না যাতে ওঁরা আঘাত পান। আমাকে এখানে আসতে তা হলে আর বলবে না। মনে রেখ।'

ট্রেন চলে যেতেই দেখলাম মধুসূদন দত্ত আজও দুজন খদ্দের পেয়ে গেছেন। তাদের ঠিকানা টুকে নিচ্ছেন। একটুও ভয়ডর নেই লোকটার। অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। আই জি-ডি আই জি থেকে আবগারি বিভাগের বড় কর্তারা ট্রেন থেকে নেমে হাত তুলে ওকে বলে যান, 'দত্ত, আমি এসেছি।'

আজ দুপুরের ট্রেনে বন্ধুরা আসবে। মধুসূদন দত্ত ঠাকুরচাকর আনিয়ে রান্নার তদারকি করছিল। বাগানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম গর্ত খোঁড়ার পর নীচে ইঁট

সিমেন্ট বালির গাথুনি চলছে। চারপাশে লোহার রডকে বেঁধে তাকে ঘিরে মোটা পিলার ওপরে উঠে আসবে। মধুসূদন দত্ত চেয়েছিল পুরোটা ইঁট না দিয়ে বালি সিমেন্ট মিশিয়ে ভরাট করতে। আমি রাজি হইনি। খরচ হোক কিন্তু মজবুত করা দরকার। মিস্ত্রিদের তাগাদা দিচ্ছিলাম। ওরা বলল বিকেলের মধ্যেই ভরাট করে ফেলতে পারবে।

দুটো মারুতি ভাড়া করে মধুসূদন দত্ত ওদের নিয়ে এল স্টেশন থেকে। আমি গেটে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে দেখে সবাই হই-হই করে উঠল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওরা বাড়িটার প্রশংসা করতে লাগল, 'দারুণ, গ্র্যাণ্ড, সুপার্ব, বিউটিফুল, মিসেস কোথায় ?'

কলকাতায় কাজ ছিল বলে চলে গেছে শুনে ববি গুহ বলল, 'বুদ্ধিমতী মহিলা। এতগুলো দামড়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ভেবেছেন। ওখানে কি হচ্ছে?'

সবাই গর্তটাকে দেখল। তখনও মিস্ত্রিরা নিচে। ওপর থেকে যোগানদার যোগান দিচ্ছে। পাশ থেকে মধুসূদন দত্ত বলল, 'বসার জায়গা হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কারও আর আগ্রহ থাকল না। মোট সাতজন এসেছে। এদের একজন এই প্রথম শান্তিনিকেতনে। বাগানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কত খরচ হল অরবিন্দ ? টোটাল কত হবে ?'

'হিসেব করিনি।'

'কম হবে না। কিন্তু ভাই যাই বল ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। এত দূরে এসে তুমি নিশ্চয়ই পার্মানেন্টলি থাকবে না।' তপন যেন আমার জন্যে আফসোস করল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি প্রতিবাদ করল, 'তোর শালা কোনকালে কিছু হবে না। সারা জীবন কিপ্টের মতো কাটিয়ে দিলি। আরে, টাকা জমিয়ে কি হবে যদি নিজে ভোগ করে না যেতে পারিস! এই বাড়ি গাছপালা আকাশ এসবের মর্ম তুই জীবনে বুঝবি না।'

বললাম, 'তোরা হাতমুখ ধুয়ে নে। খাবার রেডি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হই-হই করে উঠল সবাই, 'আরে এখন সবে একটা বাজে, এখনই লাঞ্চ। মধুবাবু, ভদকা বিয়ার বের করুন।'

যে যার মতো জামাকাপড় পালটে বসে গেল বারান্দায়। মধুসূদন দত্ত সযত্নে মাছভাজার সঙ্গে পানীয় পরিবেশন করছেন। তপন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ? গ্লাস কোথায় ?'

মধুসূদন দত্ত মাথা নাড়লেন, 'আমার নামের এক মহাত্মা যা খেয়ে গেছেন তারপর আর কোন্ মুখে খাই। আপনাদের সেবা করতেই আমার আনন্দ।'

ববি গুহ গেয়ে উঠল, 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর।'

সৌমেন ধমক দিল, 'হেঁড়ে গলায় গাইবি না।'

ববি বলল, 'যা ইচ্ছে তাই করব। আজ আমরা বাঁধনহারা।'

তপন বলল, 'সেই রবীন্দ্রনাথ।'

রবি গুহ বলল, 'যাচ্চলে! বাংলাভাষা কি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক সম্পত্তি?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। ওই ভদ্রলোক না জন্মালে আমরা এখনও বঙ্কিমী ভাষায় কথা বলতাম।'

রবি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বাঁকা ভাষায় লেখেননি?'

'বাঁকা ভাষায়?'

'ধর, দুটি কিশোরীর বিয়ে হল। খুব বন্ধু। ভোরবেলায় স্বামী একজনকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ? তোমার চোখে জল কেন? সে জবাব দিল, "কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।" রবি গুহ চুমুক দিল।

সবাই হই-হই করে উঠল। সন্ধি জিজ্ঞাসা করল, 'দ্বিতীয়জনের কেসটা কি?'

রবি বলল, 'দ্বিতীয়জনকে সকালবেলায় বান্ধবী জিজ্ঞাসা করল, "কিরে কেমন আছিস?" সে বলল, "কাল রজনীতে ঝড় বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।" আর স্বামী চলে গেল তার কাজের জায়গায়। কয়েক মাস বাদে স্ত্রীর চিঠি গেল প্রবাসে স্বামীর কাছে, "এক রজনীব বরিষণে মোর সরোবর গেছে ভরিয়া।" আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল। রবি এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো বাঁকা ভাষায় লেখা নয়?'

তপন বলল, 'তোদের মন বিষাক্ত তাই সর্বত্র বিষ খুঁজে বেড়াস।'

সন্ধি বলল, 'মানুষটাকে গুরুদেব বানিয়ে লোকে কি বিপদে ফেলেছিল ওঁকে। একটু যে প্রাণ খুলে তরল রসিকতা করবেন, তারও উপায় ছিল না। ফলে এইরকম আড়াল আবডাল বেছে নিতে হয়েছে, কি বলেন মধুসূদন দত্ত মশাই!'

মধুসূদন দত্ত চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও দোষ নেই।'

'তার মানে?' রবি গুহ জিজ্ঞাসা করল।

'দেখুন অচিন্ত্যকুমার অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি অশ্লীল শব্দ লেখেন আপনাদের আপত্তি নেই। বুদ্ধদেব বসু বা সমরেশ বসু লিখলে সাহিত্যের সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন না। আমি অবশ্য তেমন বুঝি না, বিদেশি ক্লাসিক এবং মহাভারতে তো ওসবের ছড়াছড়ি। এতে কোনও অন্যায় হয় না। যত দোষ রবীন্দ্রনাথের বেলায়? তাঁর প্রেমের কবিতা কামহীন হবে? নীরক্ত মানুষ নিয়ে কবিতা লিখবেন এমন ধারণা নিয়ে এখনও বসে আছেন আপনারা? তিনি অশোভন ভাষায় লিখতে পারেননি কিন্তু চমৎকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সেটা উপভোগ না করে বক্র কথা বললে যে কি আনন্দ পাওয়া যায় তা বুঝি না।' কথা বলতে বলতে মানুষটার গলা চড়ছিল। শেষ হওয়া মাত্র যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ভেবে মাথা নিচু করলেন।

আমার বন্ধুরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সন্ধি বলল, 'আপনার দেখছি বেশ পড়াশুনা রয়েছে, তা হলে মদ বিক্রি করেন কেন?'

মধুসূদন দত্ত জিভ বের করলেন, 'ছি ছি! আমি নিতান্তই মূর্খ। অবসর সময়ে ভাল লাগে বলে ওঁর বই-এর পাতা ওলটাই। আর এক প্লেট মাছভাজা দেব?'

আমি বুঝতে পারছিলাম, তাল ভঙ্গ হয়ে গেছে। বন্ধুদের মেজাজ চলে গেছে। তাই বললাম, 'আপনি লাঞ্চের ব্যবস্থা করুন। বেলা তো বেশ হয়ে গেছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে ববি গুহ বলল, লোকটা তো বহুৎ খচ্চর। দিল মেজাজের বারোটা বাজিয়ে। একে টাইট দিতে হবে।'

বললাম, 'গরিব মানুষ, ওকে টাইট দিয়ে কি হবে?'

'অনধিকার চর্চা করল। ওর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে করল। মানছ?'

'মানছি। তবে ভুলে যাও এটা।'

খাওয়া শেষ হলে সবাই গা এলালো। খাটে না কুলোতে মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। আমি বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিস্ত্রিরা এখন ওপরে উঠে এসেছে। দ্রুত কাজ করছে ওরা। এবার সোজা মাথা তুলে দাঁড়াবে পিলার। মধুসূদন দত্ত মাথা নিচু করে কাছে এল, 'আমাকে মাপ করবেন স্যার।'

'কেন?'

'ছোট মুখে বড় কথা বলা ঠিক হয়নি।'

'কখনও কখনও অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। আপনি কোনও অন্যায় করেননি।'

'কিন্তু ওরা অতিথি। একটু প্রমোদ করতে এখানে এসেছেন। আসলে আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারি না। যাক গে।' নিশ্বাস ফেলল মধুসূদন দত্ত, 'আচ্ছা, এটা ঠিক কি বানাতে চাইছেন বলুন তো। পাঁচ ফুট লম্বা হবে অথচ সিঁড়ি থাকবে না ওপরে ওঠার। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'শেষ হোক, তারপর বলব। আপনি শুধু একটা কাজ করুন। বোলপুরের খোয়াই স্টোর্সে কাউকে পাঠান। ওরা একটা শ্বেতপাথরের ফলক দেবে, বিকেলের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। টাকাপয়সা দেওয়া আছে।'

'শ্বেতপাথরের ফলক! তার মানে স্মৃতিসৌধ?'

'এখন নয়। কুড়ি পঁচিশ বছর বাদে হলেও হতে পারে। আমি হাসলাম, 'দাঁড়াও পথিকবর দেখে তো লোকে এখনও পার্কসার্কাসে দাঁড়িয়ে পড়ে।'

মধুসূদন দত্তের মুখ গম্ভীর হল, 'স্যার, আমি একবার গিয়েছিলাম ওখানে। মন টানছিল বলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে মনে হয়েছিল, না এলেই হত।'

'কেন?'

'মনে হল কবি যেন পথিকের অনুকম্পা ভিক্ষে করছেন। তোমরা যদি বঙ্গদেশে জন্মাও তাহলে দয়া করে একটু দাঁড়াও। বাঙালির মত স্মৃতিমোছা জাত আর কোথায় আছে, তা তো জানা নেই। ছেলেপিলে না থাকলে অথবা ব্যবসা না হলে এদেশে কোনও মহৎ স্রষ্টার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয় না। জন্মদিন পালন তো দূরের কথা। মধুসূদন দত্ত সেটা জানতেন না। তাই এখন ওই লেখার দিকে কেউ অবহেলায় তাকায় না। আচ্ছা চলি, আবার সন্ধেবেলার স্টক আনতে হবে।'

বিকেলে খোয়াই স্টোর্স থেকে প্যাকেট এল। বন্ধুরা তখন চা পান করছে। আমি মোড়ক খুললাম না। মিস্ত্রিদের কাজ শেষ হয়নি। ওরা কথা দিল কাল সকালের মধ্যেই কাজ শেষ করবে।

আজ খুব হাওয়া দিচ্ছে। গাছেরা বেশ দুলছে যদিও আকাশে মেঘ নেই। স্নানটান সেরে সবাই গুছিয়ে বসেছে বারান্দায়। সন্ধি বলল, 'আজ চাঁদ উঠলে ভাল লাগত।'

তপন বলল, 'আমার একসময় ধারণা ছিল, শান্তিনিকেতনে এলে দারুণ দারুণ রমণীর দেখা পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে মহুয়া আর সারারাত নাচ।'

'ননসেন্স। পঞ্চাশে পৌঁছেও প্রিমিটিভ ভাবনা নিয়ে বসে আছিস। এখন আমাদের হিম্মত বলে কিছু নেই। ইচ্ছে হলেও কেউ একা সোনাগাছিতে যেতে পারব না। এখন এইসব উল্টোপাল্টা কথা বলে লাভ কি! মহাকবি মধুসূদন কোথায়?' সন্ধি বলল।

ববি গুহ চেঁচালো, 'মধুবাবু! মাল নিয়ে আসুন। সন্ধে যে যায়!'

কোন সাড়া দিল না। আমি উঠলাম। হোস্ট হিসেবে এখনই মদ পরিবেশনের দায়িত্ব আমার। কিন্তু মধুসূদন দত্ত তো এখনও ফিরে আসেনি। তবে কি স্টক যোগাড় করত পারেনি অথবা সেটা করতে বাইরে গেছে! আমরা আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম।

ববি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না।' মাথা নাড়লাম আমি।

'লোকটা থাকে কোথায়?'

'ঠিকানা জানি না। কখনও কামাই করেনি।'

'এ বাড়ি তৈরির জন্যে তোমার কাছে দক্ষিণা নেয়নি?'

'এখনও না।'

'মুশকিল হয়ে গেল। এরকম সম্পূর্ণ অজানা লোককে দায়িত্ব দেওয়া কি ঠিক?'

'ভদ্রলোক আমার কোন ক্ষতি করেনি আজ পর্যন্ত।'

'এখন মদ না পেলে—! কেউ আমার সঙ্গে চল, বোলপুর থেকে কিনে আনি।'

আমার বাড়িতে এসে ওরা পয়সা দিয়ে মদ কিনে খাবে সেটা হয় না। অতএব আমিই ববি গুহর সঙ্গে চললাম। গাড়ি চালাতে চালাতে ববি যখন মধুসূদনকে গালাগাল দিচ্ছিল তখন তাতে কান দিচ্ছিলাম না। মধুসূদনের ওপর দুপুর থেকেই খেপে আছে সে। কিন্তু লোকটার কি হল? কখনও কথার খেলাপ করেনি আজ পর্যন্ত।

আইনসম্মত মদের দোকানে পৌঁছে দেখলাম সন্ধের পরেও কাউন্টার ফাঁকা। ববি গুহ যে ব্র্যাণ্ড চাইল পাওয়া গেল না। রুচি নিচে নামাতে হল, দামও বেশি। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার বলল, 'আনার খরচ আছে। তাছাড়া এখানে বিক্রিও কম হয়।'

'মধুসূদন দত্তকে চেনেন?' ববি গুহ আচমকা প্রশ্ন করল।

'কোন মধুসূদন?'

'বাড়ি বাড়ি ঘুরে মদ বিক্রি করে।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদের বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'ধরেননি কেন?'

'কে ঝামেলা করে বলুন।'

'কোথায় থাকে লোকটা জানেন?'

'না। তবে ও বোলপুরে বিক্রি করে না। শান্তিনিকেতনেই ঘুরে বেড়ায়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে রাগত স্বরে ববি বলল, 'একদম জালি লোক। কার পাল্লায় পড়েছিলে ভেবে দ্যাখো। আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাকে জ্ঞান দেয়।'

সেদিন জমবে না জমবে না করেও শেষ পর্যন্ত জমে গেল। আমার নতুন বাড়ির বারান্দায় প্রায় গোটা তিন বোতল মদ শেষ হয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ প্রত্যেকেরই নেশা জমজমাট। সন্ধি গান গাইছিল। আমাদের যে কোন পার্টিতে ও মেজাজ হলে গায়। ওর ভরাট গলায় আমার সর্বস্ব যেন কেঁপে উঠছিল, 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।' হয়তো সুরা কাজ করছিল কিন্তু আমি এই বন্ধুদের একপাশে বসে কী একা হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বুকের ভেতর রক্ত ঝরে যাচ্ছিল অসাড়ে। যখন সন্ধি গাইল, 'অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা আমারে তার অর্থ শেখা' তখন হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল। যতবারই সে আমার হয়ে 'বুঝিয়ে দে' গাইছিল ততবারই মনে হচ্ছিল এক জীবনে বোঝা যাবে না। আমি কাঁদছিলাম কিন্তু আমার চোখে জল ছিল না। আমার সর্বশরীরের সঙ্গে মিশে থাকা একাকীত্ব কেঁদে মরছিল। সন্ধি গান থামাল। তারপর ববি গুহর দিকে মুখ ফিরিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'কিছু ঢুকল মাথায়?'

'ঠিক হ্যায়।' ববি চোখ বন্ধ করে জবাব দিল।

'ঠিক নেই। দুপুরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাজে বকছিলি না? আজকের এই অন্ধকারে একচল্লিশ সালে অস্ত-যাওয়া রবীন্দ্রনাথের লিপি লেখা আছে তার অর্থ শেখা তোর কোনকালে হয়ে উঠবে না।'

'অ্যাই তুই আমাকে ইনসাল্ট করছিস!' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ববি গুহ।

'সত্যি কথা হজম করার চেষ্টা কর।'

'নো, নেভার। আমি এখানে অপমানিত হতে আসিনি। আমি চলে যাচ্ছি আমার বাড়িতে। এই, কেউ যাবে আমার সঙ্গে?'

আমি ববি গুহকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও সুস্থ ছিল না। তপন এবং সৌমেন ওর সঙ্গে চলল। ওরা যখন গেটের কাছে এবং আমি সঙ্গে থেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি ঠিক তখন একটা গাড়ি এগিয়ে এল। তার হেডলাইটে চারপাশ উদ্ভাসিত। একজন পুলিশ অফিসার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞাসা

করতে আমি মাথা নাড়লাম। উনি বললেন, 'আপনি মধুসূদন দত্তকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাকে কিছু কিনতে পাঠিয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক পাঠাইনি, উনি নিজেই আনতে চেয়েছিলেন। কেন? কি হয়েছে?'

'আমি একটা খারাপ খবর দিচ্ছি। উনি একটু আগে মারা গিয়েছেন।'

'মারা গিয়েছেন?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ। ব্যাগ হাতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসে ধাক্কা খান। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষপর্যন্ত সেন্স ছিল। মারা যাওয়ার আগে আপনার নাম-ঠিকানা বলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েও ব্যাগের হাতল ছাড়েননি। ওতে মদের বোতল ছিল কিন্তু ভদ্রলোক নেশা করেননি।' পুলিশ অফিসার একজন সেপাইকে বলতে সে মধুসূদন দত্তের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করব না। কাল সকাল দশটা নাগাদ একবার আপনি যাবেন। ওঁর আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া দরকার।'

'যতদূর জানি কেউ ছিল না ওঁর।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। ওর ডায়েরির নাম মধুসূদন দত্ত কিন্তু সেটা যে সত্যি তা আপনাকে অনুগ্রহ করে বলতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।' অফিসার গাড়িতে উঠতেই হেডলাইটের আলো ঘুরে ফিরে গেল। ওই গভীর গহন অন্ধকারে এখন আমরা একা।

বারান্দায় যারা বসেছিল তারাও পুলিশের গাড়ি দেখে বেরিয়ে এসেছিল। আমি পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলাম। মধুসূদন দত্ত নেই। বকরূপী ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উত্তর মানুষ কখনও মনে রাখে না।

হঠাৎ ববি গুহ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে, 'শালা, নিজেকে খুব ছোট লাগছে রে এখন। লোকটাকে আমি মিছিমিছি সন্দেহ করেছিলাম।'

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য! কী অবিশ্বাস্য!'

ববি গুহ ফিরে এল। আমরা আবার বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। মধুসূদন দত্তের ব্যাগটাকে তুলে আনতে হয়েছে। অন্ধকারে ব্যাগের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধি বলল, 'লোকটা আমাদের জন্যে মদ কিনতে গিয়ে মরে গেল। অবিশ্বাস্য।'

অবিশ্বাস্য শব্দটা যেন ওর জিভে আটকে আছে।

তপন বলল, 'আমি আমার ঠাকুরদা, বাবার মৃত্যু দেখেছি। ওঁদের বয়স হয়েছিল।'

'দূর! বাবর আকবর সিরাজ রামকৃষ্ণদেব রবীন্দ্রনাথ একসময় বেঁচেছিলেন, এখন নেই। তার মানে তাঁদেরও মরতে হয়েছে। সবাইকে মরতে হবে। তুই আমি কেউ শালা বাঁচব না। এই মধুসূদন দত্ত সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল। এই জন্যে

আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। যা ইচ্ছে তাই করি। ওর ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের কর।' ববি গুহ বলল।

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য।'

'হোয়াই?' ববি খেপে গেল।

'লোকটা মদ পাঠিয়ে দিল অথচ দাম নিতে আসবে না। এখন সে শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে আর তুই তার পাঠানো মদ খাবি?' সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'লোকটার আত্মা এতেই শান্তি পাবে।' ববি গুহ বোতল বের করল, 'বাঃ, এই তো আমাদের ব্র্যাণ্ড। ওর কাউকে তুমি চেন যাকে দামটা দিয়ে দিতে পারি?'

'না। কাউকে চিনি না।' অন্ধকারেই মাথা নাড়লাম আমি।

'তোমার কাছেও এই বাড়ি বানাবার জন্যে টাকা পেত তো?'

'পেত।'

'কি করবে?'

'জানি না।'

গত রাত্রে কেউ ডিনার খায়নি। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলো দুঃখী-দুঃখী হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ক্রমশ খারাপ লাগা অথবা লোকটির জন্যে যে কষ্টবোধ তা অসাড় হয়ে গেল। একসময় কিছুই ভাবছিলাম না আমি। মাথার ওপর অনেক তারা। এরা সব পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। গতকাল মধুসূদন দত্ত ছিলেন, আজ নেই। নিজের জন্যে যে ভাবনা তার কি কোন সুষ্ঠু মীমাংসা নেই?

ঘুম ভেঙেছিল সকাল-সকাল। বন্ধুরা সবাই মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। খাটে কুলোয়নি কিন্তু কেউ তার তোয়াক্কা করেনি। বাগানে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিস্ত্রিরা এসে গেল। কাজে লেগে গেল তারা। মনে হয়, ওদের নিষেধ করি। কোনও দরকার নই। ওইভাবে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও দরকার নেই। কিন্তু পিলারটাকে অসম্পূর্ণ রাখার তো কোন মানে হয় না। শেষ করুক ওরা।

বন্ধুরা উঠল। কয়েকজনের ইতিমধ্যে হ্যাঙওভার হয়ে গেছে। কালো কফি খেল তারা। খাওয়াদাওয়া করে দুপুরের ট্রেনে সবাই ফিরে যাবে কলকাতায়। হঠাৎ ববি গুহ বলল, 'তোমাকে তা আইডেন্টিফাই করতে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ। তোমরা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাও, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরব।'

'না। চল সবাই মিলে যাই। বডি যদি পাওয়া যায় লোকটার শেষ কাজ করে যাই আমরা। আফটার অল শেষসময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই তো ছিল।' ববি গুহ বলল। দেখলাম অন্যরাও একমত।

তখনও সদরে শরীর চালান দেয়নি পুলিশ। ববি গুহর তৎপরতায় সেটা বন্ধ করা হল। আমি মধুসূদন দত্তকে আইডেন্টিফাই করলাম। পোস্টমর্টেম ছাড়াই ববি দুপুর নাগাদ দাহ করার অনুমতি জোগাড় করল।

মধুসূদন দত্তকে শ্মশানে নিয়ে আসতে আমাদের কাঁধ দিতে হয়েছিল। আমরা কলকাতাবাসী সুখী মধ্যবয়সী সম্পন্ন মানুষ এতে অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও গম্ভীরভাবে কাজটি সম্পন্ন করলাম। সৎকারের ব্যবস্থা হল। হঠাৎ ববি কোত্থেকে এক বালককে ধরে নিয়ে এল। বলল, 'এ মুখাগ্নি করবে'—

'সে কি?' সন্ধি অবাক।

'আমরা শালা হিন্দু, পোড়াচ্ছি যখন তখন মুখাগ্নি করাতে তো হবেই। এই বাচ্চাটার বয়স আট। আরও সত্তর বছর বাঁচবে ধরে নিতে পারি। ওর বাপ মা নেই, চায়ের দোকানটায় কাজ করে। ওই করুক মুখাগ্নি। যতদিন বাঁচবে ততদিন মনে রাখবে লোকটাকে।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নে দশ টাকা। শোন, যাঁর মুখে আগুন ছোঁয়াবি তাঁর নাম মধুসূদন দত্ত। বল তো নামটা?'

কচি গলায় উচ্চারিত হল, 'মধুসূদন দত্ত।'

'আবার বল।'

'মধুসূদন দত্ত।'

'ভুলবি না?'

বালক মাথা নেড়ে না বলল।

পাটকাঠির আগুন বালক ছোঁয়ালো মধুসূদন দত্তের মুখে। আগুন জ্বলল চারপাশে, ববি চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।'

সন্ধি ধমকে উঠল, 'অ্যাই! চুপ কর। আমি মন্ত্র পড়ছি। শেষ মন্তর।' বলেই সে গান ধরল, 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।'

পূর্বপল্লীতে ফিরে এলাম শেষ দুপুরে। সারাদিন কারও খাওয়া হয়নি। স্নান হয়নি। সবাই খুব ক্লান্ত। আমার কেবলই মনে পড়ছিল সেই মহিলার কথা, যিনি ত্যাগ করেছিলেন মধুসূদন দত্তকে, যিনি এখনও জানেন না প্রচলিত অর্থে তিনি বিধবা। একটা মানুষ ছিল, একটা মানুষ নেই, কি সামান্য তফাৎ।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি মিস্ত্রিরা অপেক্ষা করছে। তাদের কাজ শেষ। তিরিশ ফুট মাটির তলায় ডুবে থাকা পিলার পাঁচ ফুট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণভাবে। হেডমিস্ত্রি এগিয়ে এল, 'এখন কি করতে হবে বাবু?'

বোলপুর থেকে মধুসূদন দত্ত যে প্যাকেটটা আনিয়ে দিয়েছিলেন সেটা ঘরেই পড়ে আছে। ওই প্যাকেট থেকে ফলকটা বের করে পিলারের ওপর লাগিয়ে দিতে হবে সিমেন্ট কাঁচা থাকতেই। যতদিন পিলারটা থাকবে ততদিন লোকে ফলক দেখে জানতে পারবে অরবিন্দ মিত্র নামে একজন মানুষ এখানে বাস করতেন। ইতি কি ভাবল, বন্ধুরা কি মনে করল তাতে কি এসে যায়। এদেশে লোকে যখন নিজের নামে একটা স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারে, তখন আমি একটা বাড়ি বানাতে পারি না?

কিন্তু এখন অস্নাত, অভুক্ত এই আমি একদম সময় পাচ্ছিলাম না ভেতর থেকে ওই ফলক বের করতে। আজকের দিনটা যাক, এর পরের বার যখন আসব তখন হয়তো মন এবং শরীর অনেক চাঙ্গা থাকবে, সায়ও পেয়ে যেতে পারি।

'যাদের হ্যাঙ ওভার হয়েছে তারা একটু পান করে নাও, ফিট হয়ে যাবে।' ববি গুহ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করল গ্লাস হাতে।

সন্ধি কিন্তু কিন্তু করল, 'খালি পেটে খাব?'

'নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্নান সেরে ভাত ঘুম। সন্ধের ট্রেনে কলকাতা। আরে, এই বাড়িতে এসেছি যা ইচ্ছে তাই করব বলে। নিয়ম মানতে তো কলকাতাই রয়েছে।' ববি চিৎকার করল।

সন্ধি যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, 'অরু, তোর বাড়ির নাম দে ইচ্ছে বাড়ি।'

ওরা সব ভেতরে চলে গেল। ইচ্ছে বাড়ি। বুকের মধ্যে খলবলিয়ে উঠল শব্দ দুটো। যা ইচ্ছে তাই নয়, আমার ইচ্ছে এইখানে থেকে যাক অনন্ত বছর। আমি মনে মনে একটা ফলক বসিয়ে নিলাম। ওই কাঁচা পিলারের গায়ে, ইচ্ছে বাড়ি। মধুসূদন দত্ত আমাকে বলেছিলেন, 'যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান। যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম, তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি রেখে যেতে পারেন।' আর সেই বাড়িটার নাম ইচ্ছে বাড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে! মিস্ত্রিদের আমি ছুটি দিয়ে দিলাম। সামনের রবিবার সকালে ওদের আবার আসতে হবে নতুন ফলক লাগাবার জন্যে।

আমি বন্ধুদের সঙ্গ পাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

জীবনে যেমনটি হয়

চিত্তপ্রিয় চ্যাটার্জী অবসর নিয়েছেন বছর ছয়েক হলো কিন্তু এখনও তাঁর শরীর স্বাস্থ্য মজবুতই আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী গত হয়েছেন তিন বছর আগে। যাওয়ার আগে প্রায় তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি চিত্তপ্রিয়। কিন্তু তিন বছর ধরে একজন মৃতপ্রায় মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত বাস করলে শোকের ধার কমে যায় বলেই স্ত্রী গত হবার পর তিনি স্থির আছেন। এখন চিত্তপ্রিয়র সময় কাটে বই পড়ে এবং নিয়মিত ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখে। বড়ছেলে অনুতোষ মাদ্রাজে আছে তার পরিবার নিয়ে। ভাল চাকরি করে সেখানে। মেয়ে অনন্যা দিল্লীতে। এরা সবাই তাঁকে কলকাতার বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে তাদের কাছে চলে যেতে বলে। চিত্তপ্রিয় রাজী হননি। একটি চাকরের ওপর ভরসা করে দিব্যি আছেন তিনি।

যেহেতু বয়স বাড়া সত্ত্বেও চিত্তপ্রিয় অশক্ত হয়ে পড়েননি, তাই তাঁর জীবনযাপনের ভঙ্গি একটু অন্যরকম। প্রত্যহ ভোরে তিনি কেডস পরে চার কিলোমিটার হাঁটেন। মদ অথবা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন বছর কুড়ি হলো। ইদানীং মাংস এবং ডিম খাচ্ছেন না। দীক্ষা নেবার কথা চিন্তাও করেননি, ওসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। বাড়িতে ঠাকুর দেবতার কোনো ছবি নেই। ইদানীং তাঁর শখ হচ্ছে বেড়াতে যাওয়ার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থলগুলো না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কিন্তু আজকাল চারধারে এত অব্যবস্থা যে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে সাহস হয় না। ট্রেনের টিকিট নিয়েই তো কত ঝকমারি। শেষপর্যন্ত চিত্তপ্রিয় ঠিক করলেন একটি বিখ্যাত 'স্পেশ্যাল' কোম্পানির সঙ্গী হবেন। হয়তো ইচ্ছেমতো ঘুরে দেখা হবে না কিন্তু টাকা দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত তো হওয়া যাবে।

সেইমতো ব্যবস্থা হলো। দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ হয়ে কেদার এবং বদ্রীনাথ। নামগুলোর গায়ে তীর্থের গন্ধ থাকায় একটু অস্বস্তি হয়েছিল প্রথমে, পরে ভেবে দেখলেন জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক আকর্ষণ তো কম নয়। তিনি তো পুণ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন না। প্রকৃতি দেখবেন প্রাণভরে। অতএব চাকরের হাতে সংসার ছেড়ে তিনি স্যুটকেস নিয়ে এক সন্ধ্যেবেলায় হাজির হলেন স্টেশনে।

যে কামরায় তাঁদের যাওয়ার কথা তার সামনের প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষেরা। বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষদের বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের পরিবার। ব্যবস্থাপকদের বারংবার সাবধান করে দিচ্ছেন যাতে অযত্ন না হয়। কামরায় উঠে মেয়ে মায়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে যাতে অসুবিধে না হয়, ছেলে বাবাকে মনে

করিয়ে দিচ্ছে সময়মতো ওষুধ খাওয়ার কথা। চিত্তপ্রিয় লক্ষ্য করলেন অধিকাংশ যাত্রীরই বয়স হয়েছে এবং কোনো আত্মীয় সঙ্গী নেই। এতই যখন দুশ্চিন্তা তখন বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা সঙ্গী হয়নি কেন?

চিত্তপ্রিয়র স্বভাব হলো কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা না বলা। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন এতদিন অপরিচিত বৃদ্ধবৃদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন এমন ভঙ্গিতে যে অপরিচয়ের গন্ধটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্যাসেজের পাশে জানলার ধারে যে মুখোমুখি দুটো আসন থাকে তার একটি বরাদ্দ হয়েছিল চিত্তপ্রিয়ের জন্যে। চিত্তপ্রিয় তাই চেয়েছিলেন। কারও সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসতে হবে না। কেউ গলা বাড়িয়ে কথা শুরু করতে পারবে না। ট্রেন ছাড়ার খানিক পরেই তিনি একটা বই খুলে বসলেন। ট্রেনে ওঠার আগে প্ল্যাটফর্ম থেকে ইংরেজি থ্রিলার কিনেছেন। কিন্তু আলোর তেজ এত কম যে ভাল করে পড়াও যাচ্ছে না। নাকি চশমার পাওয়ার বদলাতে হবে। চিত্তপ্রিয় বই বন্ধ করলেন। না, সত্যি তিনি এবার বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। শরীরে মেদ জমেনি বটে কিন্তু চামড়া শিথিল হয়েছে, কুঁচকে যাচ্ছে। চোখের নিচে বেশ ভাঁজ পড়েছে। এগুলো কখন অজান্তে এসে গেল খেয়াল করেননি। চারতলায় উঠতে কষ্ট হয়। দৌড়াবার কথা ভাবতেও পারেন না। চোখের আর দোষ কি!

চিত্তপ্রিয়র উল্টোদিকের আসনে যিনি বসেছিলেন তিনিও বৃদ্ধ! এই কামরা শেষ বয়সের মানুষে ঠাসাঠাসি। বৃদ্ধ বললেন, 'আমার শোওয়ার জায়গা পড়েছে ওপরে। বলুন তো, এই শরীর নিয়ে ওপরে উঠি কি করে? এত করে বললাম লোয়ার ব্যার্থ দিতে, কানেই তুলল না। মশাই কি এই প্রথম?'

চিত্তপ্রিয় মাথা নাড়লেন, না। মুখে কিছু বললেন না। কথা বললেই কথা বাড়বে। এবং সেসব কথা সে অভিযোগের নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই। বয়স হলে মানুষ সবসময় অসন্তুষ্ট থাকে!

এইসময় আর এক বৃদ্ধ ট্রেনের দুলুনি সামলে কোনোমতে এসে দাঁড়ালেন, 'ওহে হরিহর! উনি রাজী হয়েছেন।'

'হয়েছেন?' উল্টোদিকের বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

'হবে না কেন? পাঁচটা দামড়া বুড়োর মধ্যে কোনো মেয়েছেলে একা বসে থাকতে চায়? বললাম, আপনার এখানে অসুবিধে হলে সিঙ্গল সিটে চলে যেতে পারেন। ওখানে হরিহর আছে, বললে চলে আসবে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু আমার শোওয়ার ব্যার্থ যে ওপরে। ওঁর বয়স কত?'

'ষাটের মধ্যেই হবে। আগে এখানে পাঠিয়ে তো দিই তারপর দেখা যাবে। মালপত্র নিয়ে চলে এসো, জমিয়ে গপ্পো করতে করতে যাওয়া যাবে।'

দুই বৃদ্ধতে মিলে মালপত্র নিয়ে নড়তে নড়তে চলে যেতে চিত্তপ্রিয় বেশ অস্বস্তিতে

পড়লেন। উল্টোদিকে একজন মহিলা বসে থাকলে অনেক ঝামেলা। তাঁকেই হয়তো নিজের লোয়ার ব্যর্থ ছেড়ে ওপরে উঠতে হবে। না, তিনি উঠবেন না। টাকা দেবার সময় পইপই করে বলেছিলেন বলে বার্থটা পেয়েছেন। এখন সেটা ছাড়তে রাজী নন। সবচেয়ে ভাল, কথা না-বলা, প্রশ্রয় না-দেওয়া, আর তাহলে ভদ্রতার মুখোশ পরতে হবে না। চিত্তপ্রিয় আবার বই খুললেন। ভাল দেখতে না-পাওয়া সত্ত্বেও এমন ভাব করলেন যে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পড়ে চলেছেন। একটু বাদেই স্যুটকেস এল। সঙ্গে সাদা কাপড়। চিত্তপ্রিয় মুখ তুলে তাকালেন না। উল্টোদিকের আসনে কেউ বসলে কতক্ষণ না দেখে থাকা যায়?

একসময় চিত্তপ্রিয়কে মুখ তুলতেই হলো। মহিলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। যদিও এই রাতের অন্ধকারে বাইরের কিছুই চোখে পড়ার কথা নয়, তবু তাকিয়ে থাকা। সাদা শাড়ির নীল পাড় কপালের একটু ওপর থেকে ঘোমটা হয়ে নেমেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট, তবে বোঝা যায় যৌবন পার হয়ে এসেছেন অনেককাল। আজকাল অনেক মহিলাই এইসব ভ্রমণ কোম্পানিগুলোর ওপর ভরসা করে বাইরে যেতে পারছেন। ইনিও সেই দলের। নাক এবং হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে গায়ের রঙ একসময় খুবই উজ্জ্বল ছিল। চিত্তপ্রিয়র স্ত্রী সুস্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু খুবই ফর্সা ছিলেন। মেয়ে অনন্যা তার মায়ের রঙ পেয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি রকম ছিল, তা আজও স্পষ্ট নয় চিত্তপ্রিয়র কাছে। কোনোদিন অমর্যাদা করেননি, কর্তব্যে অবহেলা হয়নি, রোগশয্যায় সেবা করেছেন, কিন্তু মারা যাওয়ার পর আবিষ্কার করলেন স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। এখন তো তেমন করে মনেও পড়ে না। প্রেম ভালবাসার যে টানের কথা বইপত্রে পড়া যায়, তার কোনোটাই নিজের জীবনে স্ত্রীর প্রতি অনুভব করেননি তিনি। উল্টোদিকে বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো মহিলার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি। এখন পর্যন্ত শব্দ দুটো মনে আসতেই হেসে ফেললেন চিত্তপ্রিয় অন্যমনস্ক ভাবে। এই ষাটের ওপর পৌঁছে কোন মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তিনি? যাঁদের প্রতি হলে স্বাভাবিক দেখাবে তাঁদের তো বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। আর পঞ্চাশ ছাড়ালে বাঙালি মেয়েদের মন আর যাই হোক নতুন পুরুষের প্রেম গ্রহণের জন্যে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত থাকে না। বাসনা আসে কিনা জানেন না, কিন্তু তা চেপে রাখতে রাখতে ও ব্যাপারে চৈত্রের দুপুরের মতো সুনসান হয়ে যান।

ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন। তারপর দুটো হাত তুলে জানলার কাচ নাবাবার চেষ্টা করলেন। ওর শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। চিত্তপ্রিয় আর নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'আমি দেখছি, আপনি একটু সরুন।'

ভদ্রমহিলা তাকালেন। সামনের চুলে রুপোলি ছোপ, মুখের চামড়া বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনও টানটান। চশমার ভেতর চোখ দুটো। চিত্তপ্রিয় থমকে গেলেন। তাঁর মাথার মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। এইরকম ঘাড় বেঁকিয়ে বড় চোখে

তাকানো, না হতে পারে না। মানুষের চেহারা বদলে যায়। ভঙ্গিও। সময় সব কিছু চমৎকার গিলে ফেলে। তাঁর নিজের কুড়ি বছরের চেহারার সঙ্গে এখনকার একটুও মিল নেই। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শুধু চাহনি দেখে দুটো মানুষকে এক করে দেওয়া হঠকারিতা।

চিত্তপ্রিয় অনেকটা শক্তি প্রয়োগ করে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন ভদ্রমহিলা একই ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। সে ছিল ছিপছিপে, রোগা বলাই ভাল। হলুদ শাড়ি আর হলুদ জামা পরতে খুব ভালবাসত। কোঁচকানো চুল হাঁটুর কাছে নেমে থাকত ঝরনা হয়ে। ইচ্ছে করেই তাকে বন্দী করতো না সে। আর ওই মুখ দেখে মনে হতো পবিত্র শব্দটির বিকল্প আছে। তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই একমাত্র চাহনিটুকু ছাড়া।

চিত্তপ্রিয় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগ বাড়িয়ে কথা বলা তাঁর স্বভাবে নেই। মহিলাও পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। এখন আর বই পড়ার চেষ্টা করলেন না চিত্তপ্রিয়। অনেক, অনেকদিন বাদে সেই অস্বস্তিটা আজ ফিরে এল তাঁর মনে। পেছন ফিরে তাকালে অনেক বছর পেরিয়ে যেতে হয় আর তার সংখ্যাটা মোটেই স্বস্তিজনক নয়। কিন্তু সত্য যা, তা চিরকালই সত্য।

জামসেদপুরে থাকতেন তখন। বাবা চাকরি করতেন টাটা কোম্পানিতে। কুলসি রোডের কোয়ার্টার্সে থেকে সদ্য কলেজে উঠেছেন। ওই সময় সাকচিতে মানুষজন কম, সবাই সবাইকে চেনে। স্কুলে থাকতেই চিত্তপ্রিয় ভাল ক্রিকেট খেলতেন, নামও হয়েছিল। সাকচির মাঠে শীতের ছুটির দিনগুলো কাটতো। সেদিন ম্যাচ ছিল। ব্যাট করছিলেন তিনি। একটা ফুলটস পেয়ে সপাটে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় চিৎকার উঠল। মাঠের ওপাশে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার মাথায় গিয়ে পড়েছে বলটা। দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছে যে তার পরনে চকোলেট রঙের শাড়ি, বয়স সতের কি আঠারো। সবাই ছুটে যেতে চিত্তপ্রিয়ও গিয়েছিলেন। মেয়েটার ফর্সা আঙুলের ফাঁক গলে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সবাই মিলে মেয়েটাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েটির মা চিৎকার কান্নাকাটি করে বকাঝকা শুরু করে দিলেন। ওভার বাউণ্ডারির আনন্দ মুছে গিয়েছিল, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। ডাক্তার এল। আঘাত তেমন গুরুতর নয় কিন্তু স্টিচ করতে হলো। সেদিন আর খেলেননি চিত্তপ্রিয়।

সেই মেয়ে, যার নাম সরমা তার সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল চিত্তপ্রিয়র। আলাপ থেকে প্রেম। সরমার চুলের ফাঁকে তখনও ছোট্ট সাদা দাগ উঁকি মারত। জুবিলি পার্কে হাঁটতে হাঁটতে সরমা বলেছিল, 'তুমি আমার মাথায় সারাজীবন থেকে গেলে।'

সে বড় সুখের সময় ছিল। সুখের এবং আশঙ্কার। সপ্তাহে দুদিন লুকিয়ে চুরিয়ে

কিছুক্ষণের জন্যে দেখা আর দিন রাত ভাবা। তারপর অবধারিতভাবে সেই দিনটা এল। সরমা কাতর গলায় জানাল, তার বাবা বিয়ের ঠিক করেছেন, কিন্তু সে আত্মহত্যা করবে তবু অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। এখন সব কিছু চিত্তপ্রিয়র হাতে। সে যেটা চায় তাই হবে। চিত্তপ্রিয় নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। সরমাকে বাঁচাতে গেলে তখনই তাঁর একটি চাকরি দরকার। কিন্তু কে তাঁকে চাকরি দেবে? কলেজে পড়া এক তরুণ কোন চাকরি করতে পারে? বাবা মাকে বলে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না। বন্ধুরা পরামর্শ দিল সরমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। সেখানে চেষ্টা চরিত্র করে চাকরি যোগাড় করতে। আর সেই জায়গাটা কলকাতা হওয়া উচিত। অত লোকের ভিড়ে কেউ তাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। সবাই মিলে চাঁদা তুলে হাজার খানেক টাকা যোগাড় করে দিল। সেই টাকা হাতে পেয়ে চিত্তপ্রিয়র মনে হয়েছিল পৃথিবীটা তার মুঠোয় এসে গেছে। সরমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন তিনি। জামসেদপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা। একটা সাধারণ হোটেলে থেকে চাকরির খোঁজখবর নেওয়া এবং সেটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরমা বলেছিল, 'যদি না পাওয়া যায়?' তিনি বলেছিলেন, 'পেতেই হবে। এ ঝুঁকি না নিলে আমি তোমাকে কখনই পাব না সরমা। তুমি আমার ওপরে ভরসা করতে পারছ না?'

'নিশ্চয়ই কবি, আর চাকরি যদি না পাও ক্ষতি নেই, কোনো রকমে পেট চলার একটা কিছু জুটে যাবে। তোমার সঙ্গে বস্তিতে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু—।'

'শুধু কি?'

'আমবা স্বামী-স্ত্রী না হয়ে এক সঙ্গে যাই কি করে?'

ব্যাপারটা মাথায় ছিল না চিত্তপ্রিয়র। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন সত্যি তো, সরমার সঙ্গে বিয়ে হবে কখন? কি করে ? তারপরেই তাঁর খেয়াল হলো। বললেন, 'আমরা কলকাতায় পৌঁছেই কালীঘাটের মন্দিরে চলে যাব। ওখানে শুনেছি গেলেই বিয়ে করা যায়। খোদ ঠাকুরের সামনে বিয়ে হলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কি, রাজী?'

সরমার মুখে হাসি ফুটেছিল, 'রাজী।'

ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করেছিল। একেবারে ভোরের ট্রেন ধরবে ওরা যাতে বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া সঙ্গে কিছু নেবার দরকার নেই। চলন্ত ট্রেনের জানলার পাশে বসে দুজনে সূর্য ওঠা দেখবে। এখন এই মুহূর্তে শুধু বেড়াতে যাচ্ছি বললেও ওঁদের দুই পরিবারের কেউ ট্রেনে উঠতে দিতে রাজী হবে না। যেন ট্রেনে উঠলেই তরুণ-তরুণী নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা তখন স্বপ্নে ভাসছিল।

সরমা ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে তার মা পথ আগলেছিলেন।

হয়তো চিত্তপ্রিয়র কোনো বন্ধুই ওই উপকার করেছিলেন, নয়তো মেয়ের ভাবগতিক দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। স্টেশনে অনেকটা বেলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছিলেন চিত্তপ্রিয়। তখন তাঁর অবস্থা উন্মাদের মতো। বন্ধুরা বিকেলে খবর আনল সরমাকে নিয়ে তার বাবা-মা কলকাতায় চলে গিয়েছেন।

তারপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। সরমার বিয়ে হয়েছে এ খবর কানে এসেছিল। সে যে আত্মহত্যা করেনি জেনে স্বস্তি পেয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। সময় এমন একটা ওষুধ, যা সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দেয় ধীরে ধীরে। আরও পরে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে তাঁর হাসি পেয়েছিল। সেদিন যদি সরমা ঠিকঠাক স্টেশনে আসত তাহলে দুজনের জীবন কিভাবে ভেসে যেত, তা ভাবলে কষ্টের বদলে হাসি পায়। কারণ দুটো অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ শুধু আবেগ সম্বল করে জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল, এটা হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটু চাপা নিঃশ্বাস যে বুকের মধ্যে পাক খেত না তাই বা কে বলবে? নইলে, অনেক পরে বাবার পছন্দ-করা মেয়েকে বিয়ে করেও তিনি স্বাভাবিক হতে পারেননি কেন? কর্তব্য করা এক জিনিস আর ভেতর থেকে আসা ভালবাসায় আঁকড়ে-ধরা আর এক জিনিস। চিত্তপ্রিয় আবিষ্কার করেছিলেন সেই ভেতর থেকে আসার পথ সরমাকে হারানোর পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাঁর অজানা ছিল বিয়ে পর্যন্ত। যে যাদুমন্ত্রে সেই দরজা খোলা সম্ভব হতো, তা তাঁর স্ত্রীর জানা ছিল না। অবশ্য এত বছর এক সঙ্গে বাস করার পর তা নিয়ে আফসোস করার কথা মনেও আসত না চিত্তপ্রিয়র। সরমার স্মৃতিতে ধুলো জমতে জমতে কখন তা মনের আড়ালে চলে গিয়েছিল, তা টের পাননি তিনি। আজ হঠাৎই ওই চাহনির ঘূর্ণিঝড় এসে সেই ধুলোর কিছুটা সরিয়ে দিতে অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। চিত্তপ্রিয় উল্টোদিকে বসা প্রৌঢ়ার দিকে তাকালেন। এই মেয়ে কি সরমা? তিনি মহিলার চুলের ফাঁকে দাগটা খোঁজার চেষ্টা করলেন দূর থেকে। ওই দাগ নাকি আজন্ম বহন করতে হবে সরমাকে। ছোট্ট একটা কাটা দাগ কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়? ভাল করে চেহারাটা দেখলেন তিনি। না, তাঁর মনে একটুও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে না। যে সরমাকে এক সময় দূর থেকে আসতে দেখলেই হৃদয়ে কাঁপুনি আসত, তার বিন্দুমাত্র এখন নেই।

ট্যুর কোম্পানির কর্মচারীরা খাবার দিয়ে গেল। হালকা খাবার। ভালই লাগল। রাত হচ্ছে। এবার শোওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। রাত ন'টার পরে যে কোনো যাত্রী ইচ্ছে করলে তাঁর নিজস্ব জায়গায় শুতে পারেন। কিন্তু সেটা করতে হলে ভদ্রমহিলাকে বলা দরকার। ওঁকে ওপরে উঠে যেতে হবে।

কিন্তু কথাটা বলতে পারলেন না চিত্তপ্রিয়। তার বদলে নিজের বিছানা ওপরে করে নিলেন। টয়লেট থেকে ঘুরে এসে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিচের বার্থ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু, আপনার ওপরে উঠতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে—।'

'ধন্যবাদ।'

চিত্তপ্রিয় কোনো কথা না বলে ওপরে উঠে এলেন। বালিশে মাথা রেখে সরমার গলার স্বর মনে করার চেষ্টা করলেন। চল্লিশের বেশি বছর আগে একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর কি রকম ছিল আজ আর কিছুতেই মনে এল না। তবে নীচে যিনি বসে আছেন, তিনি অবশ্যই সরমা নন।

সকাল বেলায় আবার মুখোমুখি। দু-একটা কথা হয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে চা-ওয়ালাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। মহিলাও চা চেয়েছিলেন। খুব সামান্য সাধারণ কথা এবং চিত্তপ্রিয়র আর কোনো সন্দেহ রইল না। তিনি স্বাভাবিক হলেন। ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটছিল। ক্রমশ আলাপ হলো। ভদ্রমহিলা প্রতিবছরই বের হন। ছেলে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়িয়ে দেয়। ট্যুরিস্ট কোম্পানির সঙ্গে ঘুরলে কোনো চিন্তা থাকে না। যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন ততদিনই নিজেরাই ঘুরেছেন। একমাত্র ছেলে, বড় চাকরি করে, তার সময়ের খুব অভাব। চিত্তপ্রিয় নিজের কথা বললেন। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'এবার দেখবেন এটাই আপনার নেশা হয়ে যাবে। আমার তো ভারতবর্ষ এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি কি চিরকালই কলকাতায় আছেন?' চিত্তপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলেন।'

'না। বিয়ের পর এসেছি।'

'ও। বাবা বাইরে থাকতেন?'

'হ্যাঁ। জামসেদপুরে।'

শোনামাত্র নড়েচড়ে বসলেন চিত্তপ্রিয়। জামসেদপুর? সেকি! তাহলে এই কি সরমা? তিনি একটুও বুঝতে পারেননি? বুকের ভেতর বাতাস ধাক্কা মারছে। তিনি বললেন, 'আমিও একসময় জামসেদপুরের সাকচিতে থাকতাম।'

'আচ্ছা! কবে?'

'অনেককাল আগে। কলেজে পড়ার সময়।'

'আমি স্কুল শেষ করেই শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছি।'

'ও। কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি সরমা?'

'না তো। আমি কনক, কনকলতা মুখার্জী।'

বাতাসটা বুক থেকে বেরিয়ে গেল এক নিমেষেই। চিত্তপ্রিয় বললেন, 'ও। আমার নাম চিত্তপ্রিয় দত্ত। একসময় সাকচিতে খুব ক্রিকেট খেলতাম।'

ভদ্রমহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল। যেন মনে করার চেষ্টা করলেন, 'আমার দাদাও খুব ক্রিকেট খেলত। অনিল ব্যানার্জী।'

'আরে, অনিল আপনার দাদা? আমরা দুজনে ওপেন করতাম।'

'তাই?'

'অনিল এখন কোথায় ?'

'আমেরিকায়। ওখানেই সেট্‌লড। দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কি একবার একটা মেয়ের মাথা বল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন ?'

চিত্তপ্রিয় লজ্জা পেলেন, 'আমি ইচ্ছে করে ফাটাইনি। বলটা উড়ে গিয়ে পড়েছিল।'

'দাদার কাছে শুনেছি। তারপর মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাই না ?'

'বাঃ, এত কথা মনে রেখেছেন ?'

'মনে যে ছিল, তা নিজেই জানতাম না। অল্প বয়সের ব্যাপার একটু খুঁচিয়ে দিলে আপনি উঠে আসে। দাদারা চাঁদা তুলেছিল আপনাদের জন্যে, এটা মনে আছে। কারণ আমাকে জমানো টাকা থেকে দশ টাকা দিতে হয়েছিল। সেসময় দশ টাকার প্রচুর দাম ছিল।' কনকলতা হাসলেন, 'তা তিনিই আপনার সঙ্গে এতদিন—!'

'না। তার বিয়ে হয়েছিল অন্য জায়গায়।'

'সেকি ! কেন ?'

'সেসময় আমার রোজগার ছিল না।'

'আচ্ছা !'

'তখন মেয়েরা এভাবে ছেলেদের সঙ্গে বেরুতে সাহসও পেত না।'

'তা ঠিক। এই যে আমি একা যাচ্ছি, কতজনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, যেমন আপনার সঙ্গে গল্প করছি চলন্ত ট্রেনে বসে, তা নিয়ে কেউ কিছু ভাববেও না। কেন বলুন তো ?

'বোধহয় বয়সের জন্যে।'

কনকলতা বললেন, 'তার মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় ?'

চিত্তপ্রিয় হাসলেন, 'মানুষ সেরকম ভাবতে পছন্দ করে। এই যে আপনি একা ট্রেনে যেতে যেতে আমার সঙ্গে গল্প করছেন, কুড়ি বছর বয়সে পারতেন ?'

'তখন ভাল মন্দের তফাৎ তেমন করে বুঝতাম না। নিজের দায়িত্ব নিতে পারতাম না, তাই আড়ষ্টতা ছিল। এখন তো সেই সমস্যা নেই।'

'আপনার যুক্তি এটা। আত্মীয়স্বজন তখন যে আশঙ্কা করত এখন সেটা করবে না।'

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বোঝা গেল তিনি এখন কথা বলতে চাইছেন না। কিন্তু তাঁর মুখের আদলের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন চিত্তপ্রিয়। একটা তরুণীর টানটান মুখে কতটা চর্বি এবং বয়স মিশিয়ে দিলে এই মুখ হয় জানা নেই, কিন্তু তাঁর মনে হতো সরমাকে এতদিন পরে দেখলে কি তিনি চিনতে পারতেন না ? অসম্ভব।

হরিদ্বারে নামার পর ট্যুর কোম্পানির লোকেরা তাঁদের একটা ভাল হোটেলে

নিয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর আলাদা ঘর চাই। সেই ব্যবস্থা হলো। দু'রাত্ত কনকলতার মুখোমুখি থাকার পর চিত্তপ্রিয়র একটু খারাপ লাগছিল এখন। যদিও সেই সংলাপগুলোর পর তাঁদের আর তেমন কথাবার্তা হয়নি। তবু কনকলতার উপস্থিতি তাঁর ভাল লেগেছিল। কনকলতা এই হোটেলেই আছেন। তাঁর ঘর আলাদা। এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া অশোভন বলেই চিত্তপ্রিয় সেই চেষ্টা করলেন না।

সারাটা দিন একা-একাই ঘুরলেন তিনি। বিকেলে গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে নানান রঙ্গ দেখলেন। রঙ্গ বলেই মনে হচ্ছিল। এক প্রৌঢ়া কপালে তিলক এঁকে বাজনা বাজিয়ে রামায়ণ গান করছেন, পাশেই গীতা পাঠ হচ্ছে। সর্বত্র বুড়োবুড়িদের ভিড়। গ্যাসের আলো জ্বলছে কথকদের সামনে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের কাছে চলে এলেন তিনি। কনকলতাকে কোথাও দেখতে পেলেন না।

সন্ধ্যে নাগাদ তাঁর শীত-শীত করতে লাগল। তারপরই দুটো পা দুর্বল হয়ে পড়ল। শরীর ভাল বোধ না হওয়ায় হোটেল ফিরে এলেন তিনি। হরিদ্বারে এখনও ঠাণ্ডা তেমনভাবে পড়েনি তবু লেপের তলায় ঢুকেও শীত করছিল। চিত্তপ্রিয় বুঝতে পারছিলেন তাঁর জ্বর আসছে। অনেক অনেকদিন পরে অসুস্থ হচ্ছেন তিনি।

রাত্রে কোম্পানির লোক খাবার দিতে এসে জানল তাঁর অসুস্থতার কথা। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হলো। জানা গেল চিত্তপ্রিয়র শরীরের তাপ তিন ছাড়িয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল যখন তখন সমস্ত শরীরে ব্যথা। মুখ বিস্বাদ। গায়ে জ্বালা। চোখ খুলতেই কয়েকটা মুখ। কোম্পানির ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম লাগছে?'

ভাল না বলতে গিয়েও বললেন না চিত্তপ্রিয়। চোখ সরালেন। অবাক হয়ে দেখলেন কনকলতা রয়েছেন এ ঘরে। ম্যানেজার বললেন, 'ডাক্তারের মতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমরা তো কাল সকালে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাব। এ অবস্থায় ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়া কোনো পথ নেই। ওঁর পক্ষে একা ফিরে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

চিত্তপ্রিয় তারপরের কথাবার্তা শোনেননি। ঢেউ-এর মতো ঘুম এসে ডুবিয়ে দিয়েছিল তাকে। বিকেল নাগাদ আবার সেই ঘুম ভাঙল। টয়লেটে যাওয়া দরকার। উঠতে যেতেই বাধা পেলেন, 'কি হলো?'

কোনোরকমে মুখ ফেরাতে কনকলতার দেখা পেলেন। ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আছেন কনকলতা। চিত্তপ্রিয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

'আপত্তি আছে আমি থাকলে?'

'না, কিন্তু——।'

'টয়লেটে যাব।'

'পারবেন?'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন চিত্তপ্রিয়। চকিতে কাছে এসে তাঁর বাহু শক্ত করে ধরলেন কনকলতা, 'ইস, জ্বর দেখছি এখনও কমেনি। কি করে বাধালেন?'

'বেধে গেল।'

টয়লেটের দরজা পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিলেন কনকলতা। সাবধান হতে বললেন। টয়লেট সেরে ফিরে আসার পর ভদ্রমহিলা আবার যত্ন করে তাঁকে শুইয়ে দিলেন, 'এবার একটু মুখে দিতে হবে। তারপর ওষুধ।'

'আমাকে হাসপাতালে কখন নিয়ে যাবে?'

'কেন? সেখানে যাওয়ার খুব শখ আছে বুঝি।'

'তা নয়। আপনারা তো কাল চলে যাবেন?'

'যেতাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমি যেতে পারছি না।'

'আপনি আমার জন্যে থেকে যাবেন?'

'কথা বলবেন না। নিন, এই ফলের রসটুকু খেয়ে নিন। কি রকম ডাক্তার এখানকার জানি না, দুদিনেও জ্বর কমাতে পারল না।'

অনেক অনেকদিন পরে কারও সেবা পেলেন বলে মনে হলো তাঁর। চিত্তপ্রিয় কনকলতার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার শক্তি কমে আসছিল। নিস্তেজ, দুর্বল হয়ে কনকলতার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হলো তিনি যেন সরমাকে দেখছেন। কিন্তু সরমা কি এরকম দেখতে হয়েছে এখন? চোখ বন্ধ করলেন চিত্তপ্রিয়।

তৃতীয় দিনে ডাক্তারের নির্দেশে চিত্তপ্রিয়কে হাসপাতালে যেতে হলো। ট্যুরিস্ট কোম্পানি অন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেল তাদের প্রোগ্রাম মতো। কনকলতা গেলেন না। হোটেল ছেড়ে তিনি একটি আশ্রমে উঠে গেলেন। দুবেলা হাসপাতালে আসেন, ফল ওষুধের ব্যবস্থা করেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা যাওয়া।

একদিন, চিত্তপ্রিয় যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ তখন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমার জন্যে এত করছেন কেন?'

কনকলতা হাসলেন, 'অনেকে দিতে কার্পণ্য করে বলে জানতাম, কেউ কেউ নিতেও কুণ্ঠিত হয়, তা আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি।'

'কুণ্ঠা কি অকারণে?'

'হ্যাঁ। আপনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। বিদেশ বিভুঁই-এ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন দেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই কি করে? যদি আপনার পরিচয় না জানতাম তাহলে অন্য কথা ছিল।'

'কিন্তু আমার জন্যে আপনার বেড়ানো হলো না যে।'

'অনেক কিছুই তো জীবনে হয়নি।'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি?'

'আপনি সরমা!'

'পাগল। আমি সরমা হতে যাব কোন দুঃখে। আপনি তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সে সেই স্মৃতি নিয়ে থাকুক। আমি কেন সরমা হব।'

ট্যুরিস্ট কোম্পানি ফিরে আসার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হননি চিত্তপ্রিয়। ফেরার সময় এক ট্রেন, কিন্তু আগের মতো মুখোমুখি আসন নয়। কনকলতা বসেছেন তিনটে কুপের ওপাশে। ব্যবস্থাটা কে করল তা চিত্তপ্রিয় জানেন না। তাঁর সামনে বসা বৃদ্ধকে তিনি জায়গা বদল করার কথা লজ্জায় বলতে পারলেন না।

হাওড়া স্টেশনে নামার পর কনকলতা কাছে এলেন, 'একা যেতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে চলি।'

চিত্তপ্রিয় কিছু বলার আগে এগিয়ে আসা এক যুবককে দেখালেন কনকলতা, 'আমাকে নিয়ে যেতে এসে গিয়েছে। ভাল থাকবেন।'

'আমি কিন্তু ঠিকানাটা জানলাম না।'

কনকলতা হাসলেন, 'কি দরকার। চলি।'

কনকলতা চলে গেলেন, প্ল্যাটফর্মে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। ঠিকানা তিনি ইচ্ছে করলে পেতে পারেন। ট্যুর কোম্পানির খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর ঠিকানা লেখা রয়েছে। কিন্তু, সত্যি তো, ঠিকানা নিয়ে তিনি কি করবেন? কনকলতা যদি সরমাই হয় তাহলেই বা কি করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তিনি প্রশ্নটা করতে পারেন, কেন সেই দিন স্টেশনে এল না? উত্তর যাই হোক তাতে তো এখন আর জীবন বদলাবে না।

গোমুখে যে জল পবিত্র, হরিদ্বারে যার স্পর্শে শান্তি সেই গঙ্গার জল কালীঘাটে শুধু দুর্গন্ধ ছড়ায়। বয়ে-আসা নদীকে কেউ আর ছেড়ে-যাওয়া ঘাটে ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এরই নাম জীবন। বেঁচে থাকতে হলে এই সত্যিটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে

যিনি বলেছিলেন লাবণ্য না থাকলে সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না, তিনি একটু কম জানতেন। কুন্তী সুন্দরী একথা ওঁর কুকুর মদনও জানে। কুন্তী যে লাবণ্যবতী তা আয়নাগুলো সোচ্চারে জানিয়ে দেয়। আর এরকম সুন্দরী লাবণ্যবতী এই শহরে অন্তত আট হাজার একুশজন আছেন অথবা থাকতে পারেন। তবে কিনা ওইসব রূপসীদের অধিকাংশই বোকা-বোকা অথবা স্বার্থপর। আর সেই স্বার্থপরতা আড়াল করার কোনও কায়দাও তাঁদের জানা নেই। কুন্তী এই ভিড় থেকে অনেক দূরের। তাঁর সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য তো আছেই, সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে অহংকারের হালকা প্রলেপ। আর এটাই তাঁকে একদম আলাদা করে রেখেছে মিছিল থেকে। অহংকার মানেই সবজান্তাপনা নয়, নাক তোলা কিন্তু আকাশে রেখে দেওয়া নয়। ওঁর অহংকার একটা হালকা পারফিউমের মতো, শরীর জড়িয়ে থাকে কিন্তু ঠিক কোনখানে তার উৎস, সেটা টের পাওয়া যায় না। সেই রসজ্ঞের দুর্ভাগ্য, যিনি কুন্তীকে দ্যাখেননি। এখন কুন্তী পঁয়তাল্লিশ। ফিল্মস্টাররা যে বয়সটায় পৌঁছলে আর আড়াল খোঁজার চেষ্টা করেন না সেই বয়স। যে বয়সের মহিলাকে এককালে বৃদ্ধা বলা হত, দু'দশক আগে প্রৌঢ়া বলে চিহ্নিত করা হত, সেই বয়েসে পৌঁছনো কুন্তীকে দেখে শ্বাস ভারী হয়, এই যা। চট করে যুবতী বলতে নিশ্চয়ই বাধবে কিন্তু প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা নয়, বাংলায় এর কোনও সঠিক শব্দ না থাকার জন্যে আফসোস হবে। কুন্তী নিজের পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি শরীরটাকে যত্নে রেখেছেন। একটুও ধুলো নয়, আগাছা জন্মাতে দেবার সুযোগই নেই, সার এবং জলের সঙ্গে যত্ন সর্বত্র ছড়ানো। আর এই কারণেই সমবয়স্কাদের সঙ্গ কুন্তী এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। খামোকা কোনও নারীকে ঈর্ষান্বিত করে কষ্ট দিয়ে কোনও লাভ নেই। পৃথিবীতে যে যার মতো থাকুক।

কুন্তীর ভোর হয় ভোর হবার অনেক আগে। তখনও তাঁর এই আট তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কলকাতাকে ভুতুড়ে দেখায়। সারা রাত জ্বলে-থাকা আলোগুলো নিভে যাওয়ার জন্যে ছটফটিয়ে মরে। সেই আলো না-মরা ভোরেই কুন্তী হাঁটতে বের হন। শার্ট প্যান্ট জুতো পরে লিফট চালিয়ে নীচে নামতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দেয়। গুরুসদয় রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলারে পড়ে চক্কর দিয়ে ফিরে আসাটা এখন অঙ্কের মতো হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম সময় কমানোর চেষ্টা করতেন রোজ। এখন করেন না! দু-একবার হঠাৎ উৎসাহী কোনও পুরুষ তাঁকে বিরক্ত করলেও বৃষ্টি না হলে এইভাবে হেঁটে যাওয়া থেকে তিনি বিরত

হননি। মাটিতে রোদ নামার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে আসা, একটু বিশ্রাম তারপর মিনিট পনেরো আসন। প্রতিদিন আসন করার সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জানিয়ে দেয়, আমরা ঠিক আছি, ঠিক আছি। আর সেটা জানতে পারলেই মন ভাল হয়ে যায়। তারপর স্নান, বেশ সময় নিয়ে আরাম করে। বিন্তি লেবু চা আর সেঁকা পাঁউরুটি এনে দেয় খবরের কাগজের সঙ্গে। সকাল আটটা পর্যন্ত কুন্তী টেলিফোন ধরেন না।

এই ফ্ল্যাটটিতে কুন্তীর সারা সময়ের সঙ্গী বিন্তি। মাত্র সতের বছর বয়সে বিন্তির ইউটেরাসে টিউমার হবার জন্যে ওটাকে বাদ দিতে হয়েছিল। এ জীবনে আর মা হতে পারবে না বলে ও বিয়ে করেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। এ ব্যাপারে বিন্তিরও রাখঢাক নেই। চেহারা-পত্তর ভাল বলে যে সব পুরুষ বিন্তির দিকে এগোয় তাদের সাফ বলে দেয় তার অঙ্গহানির কথা। বিন্তির এখনও ধারণা, পুরুষরা মেয়েদের কামনা করে শুধু সন্তানের বাবা হবে বলে। কুন্তীর কাছ থেকে এই ব্যাপারটাকে ঘেন্না করতে শিখে গিয়েছে সে। তার শিক্ষায় এমন অনেক কিছু ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে যে, যার ফলে অন্য কারও বাড়িতে কাজ করা সম্ভব নয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এবাড়িতে কাজের লোক কখনই বঞ্চিত হয় না। কিন্তু কী খাওয়া-দাওয়া? কুন্তী লাঞ্চ করেন অফিসে। বাড়ী থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঠিক নটায় বেরিয়ে যান। সেই ব্রেকফাস্টে থাকে একটা ডিমের পোচ আর দুটো ফল। লাঞ্চে একটা চিকেন স্টুই তাঁর কাছে অনেক। ছুটির দিনে একরাশ স্যালাড, চার চামচ ভাত, দু-টুকরো মাছ অথবা মাংস এবং ফল। রাত্রে ফলটা বাদ যায়, বদলে আসে সেঁকা মাংস। এই খেয়ে খেয়ে বিন্তিরও অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। কুন্তীর কাছে সে জেনেছে বাঙালিরা অপ্রয়োজনে বেশি খায়। শরীরে যা প্রয়োজন তার বহুগুণ জিভের আরামের জন্যে ভেতরে ঠেসে দেওয়া হয়। বিন্তি সেটা এখন ভাল করে বুঝে গেছে। এই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য যে-কোনও কাজের লোকের চেয়ে তার ফিগার ঢের ঢের ভাল। কুন্তী বাড়ীতে যখন থাকে না তখন তার সময় চমৎকার কাটে টিভির সামনে বসে। কেবলে সিনেমা তো আছেই, বিবিসি, স্টার টিভির খুঁটিনাটি এখন তার মুখস্থ। আর এসব কারণেই ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামের বাড়িতে যেতে হলে দিনে দিনেই ফিরে আসে সে। এই হল কুন্তীর সংসার। সারাদিন একরকম, সন্ধের পর একটু আলাদা। অন্তত বিন্তির চোখে তো তাই। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে এ কাপ লেবু-চা আর চিকেন স্যাণ্ডুইচ খেয়ে কুন্তী কোনদিন টিভির সামনে বসলেন অথবা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালেন। বন্ধুরা কেউ এলে টেবিল সাজানো হয়। সেইরাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে বিন্তি। দিদিমণির আড্ডা ভাঙতে কখনও বারোটা অথবা কাছাকাছি। কেউ না এলে ঠিক দু-গ্লাস মদ্যপান করেন কুন্তী। বিন্তির প্রথম প্রথম পছন্দ হত না। এখন আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এক দুপুরে একলা বাড়িতে সে জিভে ঠেকিয়ে অবাক হয়েছিল। এমন বিশ্রী গন্ধওয়ালা জিনিস মানুষ কী করে আনন্দের সঙ্গে খায়!

আজ সকাল থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। দিনটা ছুটির বলেই মনে আলস্য এল। ব্যালকনির বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে চোখ থেকে চশমা সরাল কুন্তী। প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ। সামনের আকাশে ময়লাটে মেঘের ভিড়। হঠাৎই নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল তাঁর। পৃথিবীতে একটা কাছের মানুষ নেই, যাকে বলা যায় দ্যাখো তো আমার পিঠে কী হয়েছে? বিস্তি আছে অবশ্য। কিন্তু এই একাকিত্ব বিস্তিকে দিয়ে পূর্ণ হবে না কোনওদিন। একজন পূর্ণ পুরুষের জন্যে প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে মৃণালের সঙ্গে ভালবাসা এবং বিয়ে। ভাবপ্রবণতার বেলুনে সমস্ত পৃথিবী তখন আড়ালে। মা বাবা বাধা দেননি। বস্তুত ওঁরা কখনই কুন্তীর কোনও কাজে বাধা দেননি। কিন্তু তিনবছর যেতে না যেতেই মৃণালের চরিত্রের অনেক অসংগতি তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ওর কোনও সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলত, এসব তুমি বুঝবে না। মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিত মহিলাদের সম্পর্কে তার ধারণা কী! তখন চাকরি করতেন না কুন্তী। আর না চাইলে টাকা দিত না মৃণাল। টাকার জন্যে হাত পাততে পারতেন না কুন্তী। মৃণালের কিছু বন্ধুবান্ধব এমন বোকা-বোকা কথা বলত যে, প্রকাশ্যেই তাদের সমালোচনা করতেন তিনি। এইসব ব্যবধান বাড়তে বাড়তে একসময় বাক্যালাপ বন্ধ হল। তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স। এখন এতদিন বাদে মৃণাল সম্পর্কে তাঁর কোনও স্পষ্ট ভাবনা নেই। কিন্তু মৃণাল তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষ। শরীরের আনন্দ নিয়ে কথা উঠলেই তাই মৃণালের কথা মনে পড়ে। তিরিশে পৌঁছে রঙ্গন এল। এতদিনে জীবন পাল্টে গিয়েছে অনেক। ছেলে বন্ধু ছিল কয়েকজন কিন্তু রঙ্গন এসে সবাইকে আড়াল করে দিল। রঙ্গন কম কথা বলে এবং মেয়েদের স্বাধীনতায় হাত দেয় না। সে ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে মুদ্রা আসায় ভারত সরকারের প্রিয় পাত্র। সকালে ইচ্ছে হলে দুপুরেই দিল্লি হয়ে সিমলা চলে যেতে পারে। একটু আনপ্রেডিকটেবল, কিন্তু রঙ্গনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে ভাল লেগেছিল কুন্তীর। মদ্যপানের অভ্যেসটা রঙ্গনের কাছ থেকে পাওয়া। ফাইভ স্টারের মেনুকার্ড যার মুখস্থ, সে এক রবিবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বনগাঁর দিকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে গ্রামের একটা মেঠো দোকানে ভাত ডাল তরকারি খেল শালপাতায়, কুন্তীকেও খেতে হয়েছিল বলা ঠিক হবে না, কুন্তী নিজেই খেয়েছিল। রঙ্গন বলেছিল, ইচ্ছে না হলে খেয়ো না, গাড়িতে পার্কস্ট্রিটের খাবার আছে। রঙ্গনকে রোমান্টিক বলা যায় যদি কেউ তার সঙ্গে জীবন যাপন করে। কিন্তু ক্লাবে, পার্টিতে সে গম্ভীর, উদাসী। বাড়িতে গেস্ট এলে কিছুক্ষণ বাদে হাই তুলে ঘুমাতে চলে যায়। আবার সকালে উঠেই পাশপোর্ট নিয়ে ভিসা করতে ছুটে যায় নায়াগ্রার রামধনু দেখবে বলে। রঙ্গন তাঁকে অনেক দিয়েছে। এই বিত্ত, কর্তৃত্ব, বিশাল ব্যবসা এবং জয়তীকে। তের বছরের জয়তী শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মায়ের চেহারা আর বাপের স্বভাব পেয়েছে।

জয়তীর যখন চার আর কুন্তীর ছত্রিশ তখন আটত্রিশ বছরের রঙ্গন এক সকাল বেলায় ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় ও পার্সটাও নিয়ে যায়নি। সাত লক্ষ টাকা যে আয়কর দেয় তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঞ্জাবি। যত রকমের খোঁজখবর সম্ভব সব বিফলে গিয়েছে, পুলিশ শেষপর্যন্ত হার মেনেছে, মানুষটা উধাও তো উধাও। কেন রঙ্গন এভাবে না জানিয়ে চলে গেল তার উত্তর আজও পাননি কুন্তী। সত্যি কথাটা হল, রঙ্গনের অভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এখন। ব্যাপারটা মনে এলে জ্বালা আসে। কতখানি স্বার্থপর হলে মানুষ এইভাবে চলে যেতে পারে। তাঁকে তো বটেই মেয়েকেও এক ফোঁটা গুরুত্ব দিতে চায়নি রঙ্গন। টেবিল, চেয়ার, খাট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, শেয়ার, ইউনিট ট্রাস্ট অথবা ব্যবসার মতো তাঁদেরও ফেলে যেতে পেরেছিল অনায়াসে। সবচেয়ে আফসোস হয় যখন মনে পড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগের রাত্রে চূড়ান্ত মদ্যপান করে শরীরের আনন্দ খুঁজতে চেয়েছিল রঙ্গন। ও ব্যাপারে সে কখনই দক্ষ ছিল না, সেই রাত্রেও আলাদা কিছু হয়নি। আর পরদিন সকালে চা খেয়ে কাগজ পড়ে লোকটা চলে গেল। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল এর পেছনে কোনও অপরাধচক্র আছে, কিন্তু সেটা প্রমাণিত হয়নি, কেউ বলছে রঙ্গন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সেটাও একধরনের সান্ত্বনা। কিন্তু রঙ্গনের কথা মনে এলে অপমানবোধ আসে। কুন্তী এটা এড়াতে পারেন না। ন'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। মাঝে মাঝে একাকিত্ব প্রবল হলে বাঁধ ভাঙার বাসনা হয়। রঙ্গনের উধাও হওয়ার পরবর্তী পর্যায় নিয়ে আইনজ্ঞরা তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো ঠিকঠাক মানতে গিয়ে তাঁকে সংযত থাকতেই হয়েছে।

কুন্তী উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দিন গড়ালে মেঘের দুপুর এলে যন্ত্রণা তীব্রতর হবে। এইসময় কেউ যদি তাঁকে সঙ্গ দিত। কাকে বলা যায়! চোখের সামনে পরিচিত পুরুষদের মুখ ভাসল। এদের বেশির ভাগই বিবাহিত। বিবাহিত অথচ কুন্তী সম্পর্কে আগ্রহী। এদের কেউ কেউ বিদ্বান, স্মার্ট, অর্থবান অথচ কুন্তীর সামনে এলেই মদনের মতো লেজ নাড়তে থাকে। বোকা-বোকা স্বভাবের পুরুষদের তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত স্মার্ট। মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে শরীরে মেদ জমতে দেন না। এই ওপর চালাক লোকগুলো কাছে এলেই তাঁর অ্যালার্জি হয়। ওদের ভেতরের ফাঁপা বেলুনটাতে পিন ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তৃতীয় দলের পুরুষরা আসেন গম্ভীর মুখে। হুঁ হাঁ ছাড়া শব্দ বাড়ান না। যেন এই পৃথিবীর সব কিছু তাঁরা জেনে বসে আছেন। এঁদের দেখতেই কেষ্ট বলে মনে হয়। আর নয় বছর ধরে এইসব থকথকে কাদার মধ্যে পাঁকাল মাছ হয়ে বেঁচে থেকে তিনি যে বর্ম বানিয়ে ফেলেছেন, তা হুট করে আজ খুলে ফেলবেন কী করে? টেলিফোনটা বাজল। বিন্তি গিয়ে রিসিভার তুলল। কথাবার্তা বলে এসে জানাল, 'নাম বলল অণিমা, তোমার বন্ধু ছিল নাকি!' অণিমা! কে অণিমা?

হঠাৎ এক তরুণীর মুখ মনে এল। ফর্সা ঝকঝকে, চোখে চশমা। ওঁদের ক্লাসের প্রথম হওয়া মেয়ে। অণিমা সেন। সেনই তো। সে এতদিন পর হঠাৎ? কুন্তী আবিষ্কার করলেন তাঁর খুব ভাল লাগছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বললেন, 'কুন্তী বলছি। আমি ঠিক—!' ইচ্ছে করেই থামলেন তিনি। ওপাশের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, 'কুন্তী, আমি অণিমা, আমরা একসঙ্গে পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। অনেক কাল হয়ে গেল অবশ্য, চিনতে পারা যাচ্ছে কি?' 'ও ব্বাবা! তুমি!' কুন্তী এবার বোঝালেন তিনি চিনেছেন, 'কী খবর বল? হঠাৎ?' 'তেমন কিছু নয়। চৈতিকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে পড়ত, ইণ্টার কলেজ ড্রামায় বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল, হ্যাঁ, চৈতি বলেছিল তুমি নাকি এখন বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী। ক্ষমতায় থাকলেও চাও বা না চাও লোকে তোমার নাম জানবেই। আমার এক দেওর সাংবাদিক। তাকে বলতে সে তোমার অফিস আর বাড়ির ফোন নম্বর এনে দিল।'

'ভদ্রলোকের নাম?'

'সর্বজিৎ সেন।'

কুন্তীর মনে পড়ল। খুব ঝকঝকে চেহারার মধ্য-তিরিশের এক সাংবাদিক। অর্থনীতি নিয়ে ভাল কাজ করছেন। কয়েকবার লোকটাকে দেখেছে সে। দেখা অবধি! সাংবাদিকদের নিয়ে তাঁর কোনও কালে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেই লোকটা অণিমার দেওর! 'তোমার দেওর দেখছি দারুণ করিৎকর্মা।'

'তা বলতে পার। ওয়াশিংটনে একটা বড় কাজের অফার পেয়েছে অথচ বলছে যাবে না। যা হোক, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

'বিন্দুমাত্র না। কী করছ এখন?'

'যা কপালে ছিল। ছাত্রী পড়াই আর সংসার চালাই। তোমার স্বামীর....।'

'ওটা এখন ইতিহাস।' ঝটপট থামিয়ে দিলেন কুন্তী।

'ও! আসলে আমি একটি মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ। বছর তিরিশ বয়স হবে। বেশি পড়াশুনাও নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য ওর চাকরি দরকার। এখনই। কলেজে পড়ালে চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকে না। তোমাকে যদি অনুরোধ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেলেন কুন্তী।

প্রয়োজন ছাড়া যে এই টেলিফোন নয়, জানার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমার না বলা উচিত। চাকরি করার যোগ্যতা মেয়েটির আছে কিনা তাও যাচাই করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার নেই। কিন্তু তুমি বলেই সেটা বলতে বাধছে।'

'অনেক ধন্যবাদ ভাই। ওকে কবে পাঠাব?' ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। আজকের এই অলস দিনটার কিছু সময় না হয় অতীতের দায় মেটাতেই কাটুক। কুন্তী বললেন,

'আজই। দুপুরে।' বলে রিসিভার রেখে দিলেন। তাঁর মনমেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। দশটা নাগাদ দ্বিতীয় টেলিফোন এল, 'কেমন আছ?'

কুন্তী কথা না বলে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। ওপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কথা বলতে ইচ্ছে না করলে রিসিভার নামিয়ে রাখতে পার!'

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম অজস্র কণ্ঠস্বরের থেকে তোমারটা কত আলাদা।'
'হ্যাঁ, বলো।'

ভাল নেই। একদম ভাল নেই।'

'কেন?'

'উত্তরটা বোকার মতো শোনাবে। তোমার বউ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'ওকে নিয়ে চলে এসো এখানে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুন্তী। এবং তারপরেই আবার ডায়াল করলেন। বেছে বেছে আরও তিনজন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানালেন সস্ত্রীক তার ফ্ল্যাটে আসতে। শেষপর্যন্ত আয়নার সামনে বসে বিন্তিকে ডাকলেন, 'আজ একটু বেহিসাবি হব। তুমি বাজারে যাও। ইলিশ মাছ নিয়ে এসো।'

'ইলিশ?' বিন্তির চোখ বড় হল। এতদিনে সে জেনেছে ইলিশ শরীরের কিছুই উপকার করে না, 'তুমি ইলিশ খাবে?'

'হ্যাঁ। একদিন না হয় খেলাম। অনেকটা আনবে। আরও আটজন খাবে। মাথা পিছু চার পাঁচ পিস। পেটি দেখে নেবে। আর খিচুড়ি বানাবে।'

'খিচুড়ি?' হাঁ হয়ে গেল বিন্তি এবং পরক্ষণেই বলল, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'এমনি।'

টাকা দেওয়াই থাকে। বিন্তি চলে গেলে নিজেকে সাজালেন কুন্তী। সাজতে বসলে তাঁর মন ভাল হয়ে যায়, আজও হল। বিন্তির কথা ভেবে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর এই বেহিসাবি খাওয়া মেয়েটা মানতে পারছে না। একদিনই তো!

সাজ শেষ হয়ে গেলে সেলারে গেলেন তিনি। প্রচুর বিদেশি মদ থরে থরে সাজানো। ভদকাও আছে। দুপুরে ভদকা এবং বিয়ার। বিয়ারের বোতল আরও কয়েকটা আনানো উচিত। টাকা বের করে বাইরের ঘরে গিয়ে আবদুলকে হুকুমটা দিয়ে দিলেন। আবদুল রঙ্গনের আমলের কুক কাম বেয়ারা। এখন বৃদ্ধ কিন্তু মোগলাই রান্নার মাস্টার। কিন্তু এ বাড়িতে আজকাল ওকে রাঁধতে হয় না। বারোটা নাগাদ অতিথিরা এসে গেল। জোড়ায় জোড়ায়। দুপুর বলেই সবাই হালকা পোশাকে এসেছে। মহিলারা ফ্ল্যাটে ঢুকেই কুন্তীর প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। কুন্তী যেন দুহাতে ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অথচ মুখে নির্লিপ্তের হাসি ওঁদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিল। ট্রলিতে ভদকা বরফ জল এবং বোতলে বিয়ার। আবদুল পরিবেশন

করে যাচ্ছে। বিপ্তি ফিরে এসেছে দু-জোড়া ইলিশ নিয়ে। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি চলছে। এইসময় অমিত জানতে চাইল, 'এই হঠাৎ-আমন্ত্রণের কারণ জানা যাক!'

সোফায় বসা কুন্তীর দুহাতে গ্লাস মুখ ওপরে তোলা, ঠোঁটে ঈষৎ কুঞ্চন। বললেন, 'এখন নয়, আরও পরে। তোমাদের ফিরে যাওয়ার আগে।'

এসব আড্ডা জমে গেলে হোস্ট এবং গেস্টের আলাদা কোনও ভূমিকা থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই কুন্তী আলাদা হয়ে যেতে পারলেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি অতিথিদের দেখছিলেন। এই চারজন পুরুষই মোটামুটি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। কিন্তু এঁরা এমন অনেক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে স্পষ্ট তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ অসীম। সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে এসে এরা পোষমানা শেয়ালের মতো আচরণ করছে। অমিতকে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারতেন, আজ সকাল থেকে নিজেকে খুব একা লাগছিল। পেনফুল একাকিত্ব। মনে হচ্ছিল একজন পুরুষমানুষকে সঙ্গী হিসেবে দরকার। তোমাদের যে কোনও একজনকে একা ডাকলেই সেটা পেয়ে যেতাম। কিন্তু সেই পাওয়ায় চুরি-চুরি অনুভূতি। তোমরা মদ্যপান করো। নেশা হোক। তারপর তোমাদের স্ত্রীদের সামনে যদি উত্তরটা ছুঁড়ে দিই তখন দেখতে হবে কী আচরণ করো। ওই দেখার জন্যেই এই আমন্ত্রণ।

দুপুর যখন মাঝপথে, বিয়ার এবং ভদকা যখন অনেকটাই পেটে তখন আবদুল এসে জানাল একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আবদুলের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কুন্তী তাতে অণিমার নাম পড়লেন। তাড়িয়ে দিতে গিয়েও পারলেন না।

অতিথিদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে তিনি ড্রইং রুমে চলে এলেন। একটি কালো রোগা মেয়ে ছাপা শাড়িতে শরীর জড়িয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ ছাড়া হাতে নিঃসঙ্গ শাঁখা দেখতে পাওয়া গেল। কুন্তীকে দেখা মানে যে দেবীদর্শনের কাছাকাছি, তা ওর চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। কুন্তী বললেন,

'ইয়েস!'

'দিদি টেলিফোনে—!'

'হুঁ। কতদূর পড়েছ?'

'স্কুল ফাইন্যাল।'

'কী চাকরি করবে?'

'যে কোনও।'

'যে কোনও চাকরি করতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার তা তোমার আছে?'

মেয়েটি মাথা নিচু করল।

'টাইপ জান? শর্টহ্যাণ্ড? তাহলে কী জানো?'

মেয়েটি চোখ তুলল, 'লিখতে পারি!'

'লিখতে পার?' কী লেখা?'

'গল্প।'
'মাই গড! তুমি গল্প লেখ নাকি?' কুন্তী বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।
'হ্যাঁ।'
'কাগজে ছাপা হয়?'
মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'না। ওরা ফেরত দেয়।'
'কেন?'
'জানি না। কেউ বলে না দোষ কী হয়েছে। অবশ্য দিদি বলেছেন।'
'কী বলেছেন?'
'আমি নাকি পুরনো দিনের মতো গল্প লিখি। আসলে আমার বাবার দোকানে যে সব বই ছিল তাই পড়ে পড়ে শিখেছি তো। তবে এখন নতুন দিনের মতো লিখব।
'তোমার বাবার কিসের দোকান? বই-এর?'
'না, মুদির। ছোট দোকান।'
'কোথায়?'
'বনগাঁয়।'
'আচ্ছা! তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'
মাথা নিচু করল মেয়েটি, 'সোনারপুরে।'
'সেখানেই থাক?'
'না। বনগাঁয়।'
'কেন?'
চুপ করে রইল মেয়েটি।
কুন্তী বিরক্ত হল, 'দ্যাখো, তোমাকে দেবার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি তোমার দিদিকে একথা বলবে।'
'আমি জানতাম।' বিড়বিড় করল মেয়েটি।
'তুমি জানতে একথা বলবে?'
'হ্যাঁ, বড়লোকদের চরিত্র এমন হয়। গল্পে পড়েছি। লিখেছিও। কিন্তু বড়মহিলারা কি রকম হন, তা জানতাম না। আপনি রাগ করবেন না, আমি আসি।'
'দাঁড়াও। তোমার তো সাহস কম নয়। অণিমার সঙ্গে কি করে আলাপ?'
'আমাদের গ্রামের এক মাসি ওঁর বাড়িতে কাজ করে। আমাদের গ্রামের সবাই জানে যে আমি লিখি। মাসি গিয়ে দিদিকে আমার কথা বলেছিল!'
মেয়েটির গলার স্বরে চমৎকার দৃঢ়তা লক্ষ করলেন কুন্তী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বনগাঁ থেকে এখানে আসছ আজ?'
'হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম স্টেশনে নেমে।'
'কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে?'

'ভোর পাঁচটায়।'

'কিছু খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'বসো।' হুকুম করলেন কুন্তী। মেয়েটি সঙ্কোচ নিয়েই বসল।

'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?'

'অ্যাঁ? না, না। পছন্দ করার মতো কোনও ছেলে আমাদের গ্রামে ছিল না। বাবা সম্বন্ধ ঠিক করতেন কিন্তু,' মেয়েটি থামল, 'আমি আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখেছি, জানেন?'

'সেটা কি ছাপা হয়েছে?'

'না। আমার হাতের লেখা ভাল। আপনি পড়বেন? না, আপনার সময়ই হবে না।'

'তোমার কাছে গল্পটা আছে?'

মেয়েটি ব্যাগ খুলে ভাঁজ-করা কাগজগুলো দিল। প্রথম পাতায় লেখা, 'শবরীর প্রতীক্ষা', লেখিকা—নমিতা দেবী।

কুন্তী বিন্তিকে ডাকলেন। মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন। কিন্তু মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না দিদি, আমার হাতে সময় নেই। এমনিতেই বৃষ্টি পড়ছে, কখন বাড়ি পৌঁছতে পারব, জানি না। আপনি এই ডাকটিকিট-লাগানো খামটা রাখুন। পড়া হয়ে গেলে এই খামে লেখাটা ঢুকিয়ে পোস্টবাক্সে ফেলে দেবেন। হ্যাঁ?'

কুন্তী কিছু বলতে পারলেন না। মেয়েটি একটা স্ট্যাম্প-লাগানো খাম টেবিলে রেখে তাঁকে নমস্কার করে যাওয়ার সময় বলল, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনি না খুব সুন্দর। সিনেমার মতো সুন্দর। সিনেমায় নামেননি কেন?'

'নামলে উঠতে পারতাম না, তাই।'

'মানে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বললে না?'

মেয়েটি বুঝল। বুঝে চলে গেল।

হয়তো ওই লেখা, ওই কয়েকপাতার গল্প পড়তেন না কুন্তী, কিন্তু গোল বাধাল অমিত। ঘরে ফেরা মাত্র বলে বসল, 'কী ব্যাপার ভাই? আমাদের ঘরে বসিয়ে বাইরে কাকে সময় দিচ্ছিলে? মূল্যবান মানুষটি কে?' কুন্তী না বললে সেটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানাত। কিন্তু বললেন, 'তিনি এক লেখিকা।'

'লেখিকা? কী নাম?' অমিতের স্ত্রী জয়ী জিজ্ঞাসা করল।

'নমিতা দেবী।'

ইন্দ্রজিৎ অবাক, 'নমিতা দেবী? নাম শুনিনি তো। আমি অবশ্য বাংলা সাহিত্যের খবর ঠিক রাখি না। তবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর নাম শুনেছি।'

শোভন বলল, 'ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পত্রিকা দেখতাম। তখন দেবীদের লেখা ছাপা হত। এই নমিতা দেবীর নাম তখন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ। কোথায় তিনি ?'

'চলে গেছেন। যাওয়ার আগে এই গল্প দিয়ে গেছেন।' কুন্তী বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল। হয়তো ভদকা কিংবা বিয়ারের প্রভাব অথবা আলোচনার নতুন কোনও বিষয় না থাকায় সবাই গল্প শুনতে চাইল। আর কুন্তীকেই সেটা পড়তে হবে। এও এক মজা। কুন্তীর মনে হল স্কুলের স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতন ব্যাপারটা। সারাজীবন যা করব না তা একদিন টুক করে করে ফেলা।

সস্তায় কেনা কাগজ। লাইন টানা। হাতের লেখা গোটা-গোটা। বোঝা যায়, যত্ন করে লেখা হয়েছে। আটটি মানুষ কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কুন্তী পড়া শুরু করলেন। 'আমার নাম শকুন্তলা। সে যুগের নয়, এ যুগের। এ রকম নাম কেন যে আমার রাখা হয়েছিল তা বাবা মাকে প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি।'

'এক মিনিট।' ইন্দ্রজিত বাধা দিল, 'ভদ্রমহিলার নাম নমিতা না ?'

জয়ী বিরক্ত হল, 'আঃ, লেখিকা কি নিজের নামে নায়িকার নাম লিখবে ? দ্যাখো, পড়ার সময় কেউ কথা বলবে না।'

কুন্তী এগিয়ে দিলেন কাগজগুলো, 'জয়ী, তুমিই পড়ো।'

জয়ী খুশি হল। কুন্তী যেন রক্ষে পেলেন।

'আমরা খুব গরীব। আমার বাবা একটা সাধারণ দোকান চালান গ্রামে। দিনে কিরকম বিক্রী হয়, তা জানিনা। আমি কোনওমতে থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বাড়িতে বসে ছিলাম। তবে ঠিক বসে থাকা বললে যা বোঝায়, তা নয়। আমি রোজ চারপাতা লিখি। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস। আমি যে গল্প লিখি, তা অনেকেই জানে। এমন কি আমাদের সবচেয়ে বুড়ি মানদাঠাকুমাও সেদিন বলেছিল তার গল্প আমাকে লিখতে হবে। কিন্তু তার আগেই বুড়ি মরে গেল। আমি দেখতে ভাল নই। রোগা, কালো, স্বাস্থ্যটাস্থ নেই, তবে হাইট আছে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমি দেওয়ালে দাগ দিয়ে রেখেছি। সংসারের কাজ পারি, তবে করতে ইচ্ছে করেনা। বাবার দোকানে মাসিক পত্রিকাও বিক্রী হয়। কোনও মাসে সেটা না বিকোলে আমি নিয়ে আসি। গোগ্রাসে পড়ি আর তার ঠিকানায় লেখা পাঠাই। এসব করতেও পয়সা লাগে। বাবা দিতে চায় না বেশিরভাগ সময়।'

অমিত হাই তুলল, 'একটু বোরিং মনে হচ্ছে।'

জয়ী বলল, 'শাট আপ! কেমন সরল সরল কথাবার্তা। চুপ করে থাকো।'

'আমার বোঝা বাবা নামাতে চাইল। পাত্র পক্ষ আসে। জিজ্ঞাসা করে এটা পারি, ওটা পারি কিনা! আমি গান জানিনা, সেলাই জানিনা। রান্না একটু-আধটু জানি আর জানি লিখতে। অনুরূপা দেবী বা নিরুপমা দেবীর মত শকুন্তলা দেবীরও একদিন

নাম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর লিখতে জানি শুনলেই পাত্রপক্ষের মুখ কেমন হয়ে যেত। তাঁরা অদ্ভুত চোখে তাকাতেন। শেষপর্যন্ত বাবা আমাকে শাসালেন, কাউকে বলা চলবে না আমি লিখি। যেন লিখতে পারাটা পাপ। বাঙালি মেয়ের যেমন অনেক কিছু করা পাপ তেমনি লেখাও। আর এই করতে করতে সোনারপুরের হরিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের বউদি এসেছিল দেখতে। বিধবা বউদি। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে শুনে মা বিশ্বাস করতে চায়নি। লম্বা চওড়া, শরীর একটুও টসকায়নি। আমার মা ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওঁর স্বামী মারা গেছে পনেরো বছর বয়সে। ষোলতে শাশুড়ির ছেলে হয়। একবছরের ছেলেকে বিধবা বউমার কাছে রেখে তাঁরা গঙ্গাসাগর করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। নৌকাডুবি হয়েছিল। সেই থেকে ইনি একবছরের দেওরকে মানুষ করেছেন। বিয়ে থা করেননি। দেওরই ধ্যানজ্ঞান। বিষয় সম্পত্তি আছে। দেওরকে একটা স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছেন। আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। সংসারের কাজ পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। গান জানি না সেলাই, নাচ জানি না আঁকা, এসব প্রশ্ন না করে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভেতরের জামার সাইজ কি! ভয়ে ভয়ে বত্রিশ বলতে তিনি মাকে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। ওকে জা করে নিয়ে যাব।'

বাবা যা পারলেন দিলেন! বর এল বিয়ে করতে। স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রঙ কালো হলেও স্বভাবে লাজুক। বাসর ঘরে একটিও কথা বলল না। সবাই যখন বিশ্রাম নিতে গেল তখন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলব?'

তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে বল।'

'আমি না লিখি। মানে গল্প-টল্প। বিয়ের পর লিখলে আপত্তি আছে?'

তিনি অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'সারাদিন রাত বসে থাকতে হবে। ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পার। তবে মাসে দশটাকার বেশি হাত খরচ পাবে না, এইটা মনে রেখ।'

সেই রাত্রে ওই অবধি। কিন্তু আমার চেয়ে সুখী বোধহয় পৃথিবীতে কোনও মেয়ে ছিল না। দশটাকায় যত কাগজ পাওয়া যাবে তা তো সারা মাসে লিখে ফুরোবে না।

শ্বশুর বাড়িতে এলাম। শ্বশুর শাশুড়ি নেই, বউদিই সব। ফুলশয্যার রাত্রে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি। হরিপদর শরীর ভাল নেই, ওকে বিরক্ত করবে না।'

মেয়ে হয়ে মানে বুঝতে পারবনা তা কি করে হয়। রাত্রে তিনি যখন শুতে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীরে কি হয়েছে?'

'কি হবে আবার? কিস্যু হয়নি। ঘুমাও।' সকালে উঠেই তিনি বেরিয়ে যেতেন দোকানে। দুপুরে খেতে এলে বউদি যত্ন করে তাঁকে খাওয়াতেন। খেয়ে দেয়েই

আবার দোকানে ছোটা। ফিরতে ফিরতে রাত্ত দশটা। তখন স্নান শেষ করে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে সিগারেট খেতে বাইরে যেতেন। ফিরতেন কখন টের পেতাম না। এত ঘুম পেত যে জেগে থাকতে পারতাম না। বিয়ে হল, শ্বশুর বাড়িতে এলাম কিন্তু যেসব ঘটনা এইসময় ঘটে তার কিছুই আমার ক্ষেত্রে ঘটল না। দ্বিরাগমনে গ্রামে ফিরে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব? এখন আমি সকালে উঠি। ঘর গোছাই। বউদির নির্দেশে রান্না করি। তারপর সারাদুপুর লিখি আর লিখি। দুপুরের পর বউদি সেজেগুজে বেরিয়ে যান। তখন একা। আর এই সময় পাশের বাড়ির বউটা আসে আমার কাছে। আমি লিখছি দেখে চোখ কপালে তোলে। আমার বিরক্ত লাগলেও কিছু বলিনা। বউটা নানান কথা জানতে চায়। স্বামী আমাকে কীরকম আদর করে, তাও! ওসব ঘটনা ঘটেনি বলে দিয়েছিলাম। শুনে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'জানতাম।'

এসব চরিত্রের কথা আমি জানি। ঘর ভাঙতে এদের জুড়ি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও এঁদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, সেই রাত্রে মনে হল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাঁর সত্যি হয়তো অসুখ আছে। অসুখটা কি? অসুখ থাকলে কেউ অত পরিশ্রম করতে পারে! তাহলে বউটাও বা বলবে কেন, জানতাম!

রাত্রে স্বামী এলেন। খাওয়া-দাওয়া হল। বউদি তাঁকে জানিয়ে দিলেন নিয়ম মানতে আগামীকাল আমাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যেতে হবে দ্বিরাগমনে। তবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেই হবে। রাত কাটাতে হবেনা। স্বামী কিছু বললেন না।

স্বামী সিগারেট খেতে বাইরে গিয়েছেন। আমি কিছুতেই ঘুমাবো না। আধঘণ্টা এক ঘণ্টা চলে গেল। রাত বাড়ছে। সব চুপচাপ। এখনও তিনি ফিরছেন না কেন? শেষ পর্যন্ত ওঁকে খুঁজতে বাইরে বের হলাম। লম্বা বারান্দা। পরিষ্কার উঠোন। উঠোনে চাঁদের আলো। তিনি নেই। কোথাও। উঠোন পেরিয়ে দরজায় গেলাম। রাস্তা দেখা যাচ্ছে ছবির মত। এরকম বর্ণনা আমার একটা গল্পে আছে। তাঁকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার ভয় করতে লাগল। কিছু হয়নি তো তাঁর। মনে হল বউদিকে ব্যাপারটা জানাই। কিছু হলে তিনিই আমাকে দুষবেন না-জানানোর জন্যে। বউদির ঘরটা ওপাশে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম ওটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়। ঠেলতেই পাল্লাদুটো খুলে গেল। আর আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। এক ছুটে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। তারপর একটু সামলে উঠে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। চোখের পাতায় দৃশ্যটা যেন এঁটে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছিল খাটে। বউদি এবং আমার স্বামী পরস্পরকে সাপের মত জড়িয়ে অদ্ভুত চাপা শব্দ করে যাচ্ছিলেন। মানুষ খুব যন্ত্রণা পেলে মুক্তির জন্যে এমন শব্দ করতে পারে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ওই শব্দগুলো আমার বুকটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। চোখ থেকে ঘুম উধাও। শরীর থেকে শক্তি। ওই ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় টের পেলাম পাশের বিছানায় স্বামী এসে শুয়ে পড়লেন।

তারপর ভোর হল। সারারাত আমার ঘুম নেই। স্বামী জাগলেন এবং রোজকার মত বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম না। এমনকি কলতলাতেও নয়। বউদি এলেন, 'তৈরি হয়ে নাও।'

আমি মাথা নিচু করলাম।

তিনি কিছু ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন, 'আমার ঘরে শব্দ না করে ঢুকে তুমি অন্যায় করেছ।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমাকে একটা কথা বলি। অল্প বয়সে বিধবা হবার পর অনেক প্রলোভন এসেছিল। শরীর আমার এমনিতেই পুরুষের মাথা ঘোরায়। কিন্তু আমি সংযত ছিলাম। কেউ আমার নামে কোনও দুর্নাম দিতে পারবে না। শরীরে ভরা যৌবন অথচ ব্যবহার করতে পারছি না, এ যে কী যন্ত্রণা, তা আমিই জানি। তোমার স্বামী তখন ছোট। তাকে মানুষ করেছি দরদ দিয়ে। আমি খাওয়ালে খাওয়া, শোওয়ালে শোওয়া। আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে শুতে চাইত না। আমারও ভাল লাগত। সেই ভাবে কাটিয়ে কখন একদিন আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল আমি নিজেই জানিনা। তার কাছে আমিই সব। মা বল তো মা, সঙ্গিনী বল তো সঙ্গিনী। আমার কাছে ও যা পেয়েছে, তা পৃথিবীর কোনও মেয়ে ওকে দিতে পারবে না।'

'তাহলে ওঁকে বিয়ে দিলেন কেন?'

'না দিয়ে পারিনি। সত্যি বলতে কি আমি দিতে চাইনি। কিন্তু পাড়ার লোকজন যে আমাদের সম্পর্কটাকে সন্দেহ করছে, তা টের পেলাম। আমার বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যদি শরীর ভাঙত, চুল পাকত, তাহলে কেউ সন্দেহ করত না। তাই ঠিক করলাম ওর বিয়ে দেব। বিয়ে দেব এমন মেয়ের সঙ্গে যার শরীরে আকর্ষণ নেই। যার কোনও গুণ নেই। অনেক খোঁজ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এমনিতেই তোমার বিয়ে হত না। এখন এখানে এসে ভালই তো আছ। এভাবেই সারাজীবন থাকতে পারবে যদি ইচ্ছে কর। আর কাল যা দেখেছ তা যদি কাউকে জানাও, তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারবে।'

উনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন আমি কেঁদে ভাসাচ্ছিলাম। কান্না ছাড়া তখন আমার কিছুই করার ছিল না। উনি আমার পাশে বসলেন, 'এত কান্নাকাটির কি হয়েছে? ষোল থেকে তিরিশ আমি বঞ্চিত ছিলাম, সেটা জানো? আর মেয়েদের ব্যাপারটা মেয়ে বলেই আমি জানি। সব মেয়ে এসবের জন্যে কষ্ট পায় না। তোমার মত রোগা ছেলেছেলে মেয়ের তো কষ্ট হবার কথাই নয়। তুমি এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ সব কর, আমি আপত্তি করব না। তবে হ্যাঁ, তুমি নাকি কিসব লেখালেখি কর, এইসব কথা লেখা চলবে না বলে দিলাম।'

হুকুম হয়ে গেল। একটা লেখায় পড়েছিলাম, রাজা ইচ্ছে হলে লেখকের লেখা

বন্ধ করে দিতে পারতেন। লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন। পরে সরকার সেই কাজ করেছেন, কিন্তু লেখকরা লেখা থামাননি। মনে মনে স্থির করলাম আমিও হার মানব না। আমার স্বামী আমাকে বনগাঁতে পৌঁছাতে এলেন। সারাপথে একটা কথা নয়। রওনা হতে দেরি হওয়ায় আমরা পৌঁছেছিলাম প্রায় বিকেল-বিকেল। বাবা মা জোর করে তাঁকে ফিরতে দিলেন না তখনই। বললেন রাত কাটিয়ে যেতে হয়।

নিজেদের বাড়িতে এতকাল আমার আলাদা শোওয়ার ঘর ছিল না। আজ রাত্রে সেই ব্যবস্থা হল। রাত্রে তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব ?'

তিনি ঘুমাবার চেষ্টা করছিলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি ?'

'আমাকে তোমার একটু পছন্দ হয়নি, না ?' তিনি উত্তর দিলেন না। না দেওয়াটাই বড় উত্তর। পরদিন সকালেই ফিরে গেলেন কাজের চাপ দেখিয়ে। আমি থেকে গেলাম বাপের বাড়িতে।

দিন গেল। মাসও। সোনারপুর থেকে কেউ আমাকে নিতে আসে না। এমনকি একটাও চিঠিও নয়। মা আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। আমি ভয় পেতাম সত্যি কথা বলতে। কিন্তু জানি না জানি না বলে আর কতদিন চাপা দিতে পারব। শেষ পর্যন্ত বলতে হল। মা পাথর হয়ে গেল! এ কি সম্ভব ? মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে ? যাব কাছে একমাস থেকে বড় হয়েছে তার সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক ? কিন্তু সত্যি যা, তা চিরকালই সত্যি।

অথচ তার মধ্যেই আড়াল। মা বাবাকে এসব জানালেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ থেকে চলে গেলেন সোনারপুরে। পাড়ার সবাই দেখল আমরা গেলাম এবং খানিকসময় বাদে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখে জলও তারা দেখতে পেল। অতএব ওদের কৌতূহল হল। একজন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মা তাদের বলল, 'মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিরাগমনের সময় সেই যে মেয়েকে দিয়ে এল হরিপদ আর আনতে গেল না। অনেক অপেক্ষার পর নিজে নিয়ে এসেছিলাম মেয়েকে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে দিল, মেয়েকে নাকি তার পছন্দ হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা গর্জে উঠল। আর আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে হরিপদ এবং তার বউদির কেচ্ছাকাহিনী শুনতে লাগলাম। প্রথম প্রথম গ্রামের লোক ভাবত মাতৃস্নেহ। তারপর কেউ-না-কেউ কিছু-না-কিছু দেখেছে। লোকের চোখ ঢাকার জন্যে যে হরিপদর বিয়ে দেওয়া হল, সেকথা সবাই জানে। এমন অনাচার মেনে নেওয়া চলে না। বউ ফিরিয়ে নিতে হবে বলে পাড়ার লোক আমাদের সামনে রেখে চিৎকার করতে করতে চলল। আমার খুব লজ্জা করছিল কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। আমার স্বামী প্রথমে দরজা খুলছিলেন না। তাঁর বউদিও নাকি বাড়িতে নেই। দরজায় আঘাত করছিল সবাই। শেষপর্যন্ত তিনি দরজা খুলে চিৎকার করলেন, 'আপনারা করছেন কি ? আমাদের বিয়ের ব্যাপারটায় নাক গলাচ্ছেন কেন ?' মানুষ

তখন খেপে গিয়েছে। তাঁকে দেখতে পেয়েই কিলচড় শুরু হয়ে গেল। আমি আর পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল সবাই মিলে মারলে তিনি মরে যাবেন। আমি আমার রোগা শরীর নিয়ে ছুটে গেলাম তাঁকে আড়াল করতে। একটা লোক তাঁকে মারতে যাচ্ছে দেখে একটু ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম, দেখলাম সে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। স্বামী ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুনলাম লোকটার নাকি মৃগীরোগ আছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হল। আমি এবং মাও ওদের সঙ্গে গেলাম। লোকটাকে সুস্থ হতে দেখে ফিরে আসছি যখন, তখন একজন সেপাই এসে বলল, থানার বড়বাবু আমাদের ডাকছে। আমাকে আর আমার মাকে। গেলাম। দারোগাবাবু জানালেন, আমার স্বামী এসে ডায়েরি করে গেছেন যে আমি এবং আমার দলবল নিয়ে তাঁকে মারতে গিয়েছিলাম, তাঁকে ধাক্কা দিতে গিয়ে আর একজনকে এমন আঘাত করেছি যে লোকটাকে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, স্ত্রী হিসেবে আমার অক্ষমতা জানার পরই নাকি আমি বাপের বাড়ি চলে যাই। তাছাড়া ওঁর কাছে আমার লেখা বেশ কিছু কাগজ আছে যাতে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমার চরিত্র ভাল নয়।

দারোগাবাবু হাসলেন। বললেন, 'সবই বুঝলাম কিন্তু কাগজে কি লিখেছেন?'

'গল্প!'

'অ্যাঁ? আপনি গল্প লেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেব্বাস ভাবা যায় না।' দারোগা নাক চুলকে ফেললেন, 'ঠিক আছে, কোর্ট থেকে সমন গেলে হাজির হবেন।'

ব্যাস হয়ে গেল।

এরপর থেকে আমি বনগাঁয়ে, আমার বাপের বাড়িতে। সংসারের কাজ করে দিই, তিনটে ছাত্রী পড়াই আর দুপুরে গল্প লিখি। বাবার কাছে হাত পাততে হয় না। মুশকিল হল আমার গল্পগুলো ঠিক কোন কারণে ছাপা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। হলে সোনারপুরে গিয়ে পত্রিকাটা দিয়ে আসতাম। আমার এখন ভাল লাগে না। সাতদিন যে মানুষটার পাশে শুয়েছিলাম তিনি আমাকে খুব টানেন।

মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝাই তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন, কিছু বুঝতেন না। বউদির সঙ্গে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল হঠাৎই। যেমনভাবে দুর্ঘটনা হয়। তারপর সেইটে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মন মানতে চায়, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হচ্ছে!

আমার এখন সোনারপুরে যেতে খুব ইচ্ছে করে। ভাইরা বড় হচ্ছে। ওরা বুঝতে শিখেছে, আমি এবাড়িতে বাহুল্য। আমার এখানে থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমার এক বান্ধবী আমাকে একটা সত্যি কথা বলল। ভগবান মানুষকে তৈরি করেছেন কতগুলো নিয়ম মেনে। শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্ধক্য।

কোনওটাতেই কেউ চিরদিন আটকে থাকতে পারে না। তাকে এগিয়ে যেতেই হয়। আমার স্বামীর বয়স এখন তিরিশ, তিনি ছেচল্লিশ। আর কতদিন? বড়জোর বছর চারেক। তারপর তাঁর শরীর থেকে যৌবন উধাও হয়ে যাবেই। আর বাইরের যৌবন যদি বা থাকে ভেতরের যৌবন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তখন তাঁর কোনও আকর্ষণ থাকবে না আমার স্বামীর কাছে। গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের দিকে মানুষ কবার তাকায়। পাঁচ বছর পরে আমার মাত্র তিরিশ বছর বয়স হবে। কী-ই বা এমন। তখন তিনি আমাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

আমি তাই মাসে একবার সোনারপুরে যাই। দূর থেকে বউদিকে দেখে আসি। লোকে বলে এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হলেও মানুষের শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তেমন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবু এটাই আমার একমাত্র আশা। আমি অপেক্ষা করব।' জয়ী পড়া শেষ করল। তারপর বলল, 'ইম্পসিব্‌ল!'

অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'এই জন্যেই বাঙালি মেয়েরা এক্সপ্লয়েটেড হয়ে চলেছে। স্বামী আর একজনের সঙ্গে ফুর্তি করছে দিনের পর দিন আর আমি অপেক্ষা করব কখন তিনি মুখ ফেরাবেন সেই আশা নিয়ে!' জয়ীর গলায় জ্বালা স্পষ্ট হল। শোভন বলল, 'কিন্তু গল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু যৌবন দিয়ে অনন্তকাল কেউ কোনও সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই উপলব্ধিটা গল্পটার চমক।'

ওরা খিচুড়ি এবং ইলিশ খেল। বিকেল নামতেই যে যার বাড়ি ফিরে গেল ধন্যবাদ জানিয়ে' দেখা যাচ্ছিল গল্পটা কিছুই নয়, খুবই সাধারণ ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও খেতে বসেও এ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করছে না। একমাসের শিশুকে মাতৃস্নেহে বড় করে কোনও মহিলা শেষপর্যন্ত ওই সম্পর্কে যেতে পারেন কিনা তাও তর্কের বিষয়। কুন্তী কোন কথা বলছিলেন না। একজন ঠাট্টা করে বলল, 'আহা বেচারা। লিজ টেলার যদি স্বামীর বউদি হত তাহলে ওঁকে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হত কম করেও। তদ্দিনে মেয়েটাই বুড়ি হয়ে যেত!'

বাড়িটা এখন ফাঁকা। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিলেন কুন্তী। ঘোলাটে মেঘগুলো ব্লটিং-এর মতো। সমস্ত আলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। ওপাশের একটা ঘরে টিভি চলছে। দর্শক বিস্তি এবং আবদুল। শব্দ বাইরে বেরুচ্ছে না। কী একটা সিনেমা চলছে সেখানে।

গল্পটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না কুন্তী। বাঙালি মেয়েদের যে বয়সে ওই পর্বটিকে ছেড়ে আসতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে একটু আগেই যেন এসে গিয়েছে। ডক্টর দত্ত বলেছেন, এটা জীবনের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। একটুও মাথা ঘামাবেন না। শরীর নিয়ে চিন্তা করা বোকামি। আসলে মন তাজা রাখাই প্রয়োজন। শুনতে খারাপ লাগে না এইসব উপদেশ। শুনলে স্বস্তি হয় বলেই খারাপ লাগে না।

কিন্তু ওই যে মেয়েটি লিখেছে, গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের কথা! এখনও এই সময়ে তিনি যখনই একাকী তখনই এমন কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন যে বোকাবোকা নয়, যে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করে না অথবা বোদ্ধা হবার ভান করে না। এই যে কামনা তা তাঁর বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে। তাঁর শরীরের সব কিছু মন্থন করে নিঃশ্বাসের মতো আন্তরিক হয়ে ওঠে। রঙ্গন চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল থিতিয়ে ছিল এইসব ভাবনা। এখন একটু একটু করে প্রবল হচ্ছে। শেষঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর লোকে যেমন হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমন? শেষ ঘণ্টা? তাঁর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন কুন্তী। অসম্ভব। এই তো, ভরদুপুরে বাড়ি এসে ভদকা খাওয়ার আগেই মানুষগুলো তাঁর রূপের কত প্রশংসা করে গেল। অফিসে যখন ঢোকেন তখন কর্মচারীদের মুখে যে স্তাবকদৃষ্টি থাকে তা তাঁর অদেখা নয়। ম্যাডাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তারা এক-একজন চকোলেট হয়ে যায়। সেদিন রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলেন বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। একটি বছর পঁচিশেকের ছেলে এগিয়ে এসেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?' কুন্তীর কপালে ভাঁজ পড়েছিল, 'কেন?'

'আপনার মতো কাউকে কখনও দেখিনি।'

'সরি। আমার বাজে কথা বলার মতো সময় নেই।' কুন্তী পাশ কাটিয়েছিলেন অবহেলায় কিন্তু তার ভাল লেগেছিল।

আর এসব শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে কারও জীবনে ঘটে? পৃথিবীতে এমন মেয়ে অনেক আছে যাকে কখনও কোনও পুরুষ প্রস্তাব দেয়নি। যেমন এই মেয়েটি। কী নাম যেন, হ্যাঁ নমিতা। চেহারার মতো সাদাসাপটা নাম। কুন্তী কলকাতার দিকে তাকালেন। ঝাপসা জলের মধ্যে আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে। কলকাতায় সন্ধে নেমেছে বর্ষা জড়িয়ে। দিন শেষ হল। একটা গোটা দিন। কুন্তী ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

দেওয়ালজোড়া আয়নায় এখন তিনি। মিষ্টি, অহঙ্কারী। দূর! কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! বরং স্নান করা যাক। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে অবিরত ভিজে চলেছেন তিনি। আজকের দিনটা অবহেলায় কাটল। শরীরটার দৈনন্দিন পরিচর্যা হল না। একটু আলস্যঘন দিন। আগে মন্দ লাগত না, এখন অস্বস্তি হয়। এই বুঝি ফাঁক গলে শনি ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলেন তিনি। কোনও এক রাজা নাকি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না শনিদেব। কোথাও তাঁর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাজা যখন তাঁর পা ধুচ্ছিলেন তখন গোড়ালির কাছে জল পৌঁছায়নি অন্যমনস্কতার কারণে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে শনিদেব সেইখান দিয়ে রাজার শরীরে প্রবেশ করে ধ্বংস ডেকে আনলেন। এমন যেন না হয়, এমনটা হতে দেবেন না কুন্তী।

স্নান সেরে বড় তোয়ালেতে শরীর মুছতে মুছতে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। না, কপালে ভাঁজ পড়েনি, চোখের তলায় একটু ঢেউ নেই। হাসলে গালে কুঞ্চন ওঠে না। চামড়া কী টানটান। গলায় একটু, নাঃ, এ তাঁর চোখের ভুল। গতকাল যখন ছিল না আজ কোত্থেকে আসছে! মুখ উঁচু করতেই সন্দেহটা মিলিয়ে গেল। কাঁধ থেকে কনুইদুটো এখনও সতেজ। এবং নিজের বক্ষদেশ দেখতে গেলেই মৃণালের ওপর তাঁর খুব রাগ হয়। প্রথম যৌবনে মৃণাল যথেচ্ছাচার যদি না করত তাহলে এখনও ঈশ্বরী ঈর্ষিতা হতেন। সেইসময় তিনি বোঝেননি, মেয়েরা ভালবাসলে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না অথবা চায় না। সঙ্গে সঙ্গে গল্পটার কথা মনে এল। নমিতা অথবা শকুন্তলার স্বামীর বউদি, মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ভেতরের জামার মাপ কত? বেচারা, কী অপমানকর প্রশ্ন!

হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইচ্ছে করল কুন্তীর। পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেও যিনি তিরিশকে শাসনে রেখেছেন। সেই মহিলা নিশ্চয়ই তার মতো এমন বিত্তে নেই, হাত বাড়ালেই সমস্ত পৃথিবীকে পান না। তাঁর কৌশল কী?

'ও। ব্যাড লাক্। তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে খারাপ লাগছে। মেয়েটার কপালটাই মন্দ। ওর বাবা এসেছেন স্বামীর শেষকৃত্যে নিয়ে যেতে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠলেন কুন্তী।

'আজ দুপুরেই ওঁরা খবর পেয়েছেন লোকটা নাকি ভোরে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে। শেষকৃত্যে না গেলে সম্পত্তির ভাগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারে।'

'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'আমি জানি না। আচ্ছা রাখছি।'

রিসিভার রেখে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়লেন কুন্তী। তাঁর ভিজে চুল এখন তোয়ালেতে জড়ানো। হঠাৎই সেই তোয়ালের হিম তাঁর সমস্ত শরীর ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটা এখন কার জন্যে, কিসের জন্যে অপেক্ষা করবে? যার সময় গেলে সে জিতে যাবে বলে ভেবেছিল তার তো আজ ভোরেই সময় চলে গেল কিন্তু ওর তো জেতা হল না। এখন সেই মহিলা, যাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল একটু আগে, হঠাৎই যেন অনেক অন্ধকারে চলে গেলেন। আশ্চর্য! এদের কাউকেই তো তিনি চেনেন না।

কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎই সমস্ত শরীর যেন নির্জল বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। জিভ, গলা, পেট, সর্বাঙ্গ। জল মানে চলাচল, জল মানে সরস। অনেক দূরের মহাকাশে যেসব গ্রহ জলহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হিংসুটে চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তৃষ্ণায় বুক জ্বলে জ্বলে খাক!

কুন্তী প্রচণ্ড শক্তিতে বোতামে চাপ দিলেন। বিশাল ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে বেল বাজছে। বিন্তি ছুটে এল দরজায়।

কুন্তী বলতে পারলেন, 'জল দাও।'

একত্রিশ বছর পরের পুজোয়

কদিন থেকেই দেখছি আকাশের চেহারা বদলে যাচ্ছে, রোদের রং বদল হচ্ছে। আমার ঘরের জানলা দিয়ে যে শিউলি গাছটা দেখা যায় তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে থোকা-থোকা ফুল দিনভর সেই রোদ মেখে রাতের বেলায় মাটিতে সাদা চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে পারি যেখানে এখনও কাশবনেরা রয়েছে, সেখানে বাতাস বড় ঢেউ তুলছে। এই দু-হাজার পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীটা পৃথিবীর মত রয়ে গেল। আমার বয়স এখন একাশি। এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন। ভাবলেই মন কেমন হয়ে যায়। লোকে বলে আমার শরীর এখনও শক্ত, তিন তলার এই ছাদের ঘর থেকে দিব্যি ওঠা-নামা করতে পারি। দোতলায় ছেলে তার পরিবার নিয়ে থাকে। নাতি নাতনি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ভারী ভাল ওরা, আমার সঙ্গে খুব ভাব।

আজ সকালে নাতনি এল। ফরসা শরীরে বাসন্তী রঙের জামা। তার কাটছাঁট অন্য রকম। বেশ স্মার্ট দেখায়। এসে বলল, 'বিকেলে তৈরি হয়ে থেকো।'

'কখন ?'

'ঠিক পাঁচটায়। আজ শুধু তুমি আর আমি।'

'কেন ?'

'তোমার হাত ধরে একা হাঁটতে চাই, আপত্তি আছে? প্রশ্ন করেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সে চলে গেল। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির শরীরটা বেতের মতো।

আজ পাঁচটায় আমরা কোথায় যাব, তা আমার জানা। কদিন থেকেই টিভিতে প্রচার চলছে। বাৎসরিক আনন্দবাজার এসে গিয়েছে মাস দেড়েক হয়ে গেল। এখন আর তার মলাটে কোনও দেবীমূর্তির ছবি থাকে না। হয়তো এক কোণে একটা ত্রিশূল অথবা খাঁড়া পড়ে রইল অথবা মোষের শিং। আর এসব থেকেই একটা আন্দাজ পাওয়া যায় সময়টা আসছে। এই কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্যাণ্ডেল খাটিয়ে দেবীর আরাধনা আজকাল আর করা হয় না। কলকাতার নির্ধারিত দুশোটি সংস্থাকে ময়দানে পুজো করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আগে যেমন ময়দানে বইমেলা হত, তেমনি এখন হয় দেবীমেলা। এক-একটা মণ্ডপে এক-এক সংস্থার দেবী। ফলে এই সময় পাড়ায় পাড়ায় আর মাইক বাজে না। চাঁদার জুলুমের কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙালিকে আর ধারধোর করে পুজোর বাজার করতে হয় না। এসব তিরিশ বছর আগেও ভাবতে পারতাম না।

ঠিক পাঁচটায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নাতনির সঙ্গে বের হলাম। বাড়ির গায়েই

পাতাল রেলের স্টেশন। এখন কলকাতার সল্ট লেক থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত মাটির নীচে রেললাইন বসে গেছে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে হুস কর চলে যাওয়া যায়। মনে আছে প্রথম পাতাল রেল ঠিকঠাক চালু হতে দু-দশকের মতো সময় লেগে গিয়েছিল। এখন জাপানি সংস্থা মাত্র দু-বছরে ওই রকম চারটে লাইন তৈরি করে দিচ্ছে।

আমার টিকিট লাগল না। সিনিয়ার সিটিজেনদের লাগে না। হুস করে আমরা চলে এলাম ময়দানে। মাটির উপরে উঠে দেখলাম, বিশাল এলাকা জুড়ে আলোর নানান খেলা চলছে। ঢুকতে নাতনির টিকিট লাগল, আমি ফ্রি। এই রকম সময়ে নিজেকে বেশ মূল্যবান বলে মনে হয়। মাইকে মৃদু ঢাক কাঁসর বাজছে। একটাই কানেকশন সমস্ত ময়দান জুড়ে। মণ্ডপে মণ্ডপে সন্ধ্যারতির আয়োজন চলছে। পাঁচ দিনের এই মেলা দেখতে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড়। নাতনি আমার হাত ধরে হাঁটছিল। প্রথমেই আহিরিটোলার প্রতিমা, তারপর বাগবাজার, বালিগঞ্জ। এক এক প্রতিমার এ এক রকম রূপ। বাগবাজার ডাকের সাজ করেছে। আহা, মাকে কি দারুণ তেজস্বিনী দেখাচ্ছে।

প্রতিটি মণ্ডপের সামনে রেলিঙের আড়াল থাকায় দর্শকরা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ভিড়ের চাপ বাড়ছে। নাতনিকে নিয়ে মাঝখানের খোলা মাঠে দাঁড়ালাম। মাথার উপর নীল আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে। নাতনি বলল, 'দারুণ, না দাদু?'

'কি দারুণ?'

'এই যে একজন মহিলাকে নানান স্টাইলে সাজিয়ে দেখার কনসেপ্টটার কথা বলছি। শুনেছি এককালে বাঙালি মেয়েদের ওপর তোমরা খুব অত্যাচার করতে। তাদের পুড়িয়ে মারতে। তা তখনও এইভাবে এক সুন্দরী মহিলা আর তার দুই মেয়েকে নিয়ে পাঁচ দিন ধরে এমন উৎসব করা হত?' নাতনি প্রশ্ন করল।

'হত। প্রথমে ঘরে ঘরে পরে পাড়ায় হত।'

'কি রকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার? তখনকার মানুষের বিবেকে লাগত না?'

'ওটা বেশ.মোটা ছিল দিদিমণি।'

'আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? মায়ের চেহারার সঙ্গে মেয়েদের তেমন পার্থক্য নেই। শুধু মা একটু বড়সড় কিন্তু বয়স দেখে তাও বোঝা যায় না। অথচ দুর্গার তো বয়স্কা হওয়ার কথা, অত বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে যার, সে কেন যুবতী হবে? আমার মা যতই যোগা করুক আমার মতো দেখতে নয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, এটাও ঠিক।'

'দুর্গার চুলে একটু পাক ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

দৃশ্যটা আমি কল্পনা করলাম। আমার মায়ের বয়স যখন চল্লিশ তখন তিনি আর কুচি দিয়ে শাড়ি পরতেন না, কেমন মা-মা ধরনের দেখাত তাঁকে। আমার স্ত্রী পঞ্চাশে পৌঁছেও সেই চেহারা আয়ত্ত করেননি। বউমা তো পঞ্চাশ পেরিয়ে এসেও

প্যান্ট সালোয়ার পরে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে এবং আমার চোখে তা খারাপ লাগে না। অথচ দুর্গার মাথায় যদি ইন্দিরা গান্ধীর মতো একটা সাদা ছোপ থাকত তা হলে কি বেশি জননীরূপ খুলত? তিরিশ বছর আগে যেভাবে ঠাকুর গড়া হত তা এখন হয় না। কোথাও কার্তিক-গণেশ নেই, কোথাও অসুরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, দুর্গার চেহারাপত্র পাল্টেছে কোনও কোনও মণ্ডপে, কিন্তু তার বয়স কোথাও বাড়েনি। প্রতি বছরই আমি নাতনির সঙ্গে এখানে আসছি এবং নতুন নতুন প্রশ্নের সামনে দাঁড়াচ্ছি।

হঠাৎ নাতনি বলে উঠল, 'আমরা মিছিমিছি ভাবছি।'

'তার মানে?'

'এটা তো জাস্ট একটা একজিবিশন। পাঁচ দিনের গেটটুগেদার। দাদা বলে, ফালতু খরচ, কিন্তু আমার মনে হয় কত ব্যাপারে তো অকারণে খরচ করা হয়, এই উপলক্ষে তবু তো সবাই হই-হই করতে পারে।'

'আর কোনও অনুভূতি হয় না তোমার?'

'আর কিসের?'

আমি উত্তর দিলাম না। দেওয়াটা বোকামি। ওর কোনও মন-কেমন-করা স্মৃতি নেই। না থাকার কারণ ধর্মটাই, যাকে ধর্ম বলে আমাদের এককালে বোঝানো হয়েছিল, তা এখন মৃত। আমাদের চব্বিশ ঘণ্টায় কোনও ধর্মাচরণ করতাম না তিরিশ বছর আগে। বেদ উপনিষদ পড়া অথবা নিয়মিত পুজো-আর্চা যা আমি বাল্যকালে চারপাশের মানুষকে করতে দেখে এসেছি, তা আমাদের যৌবনেই উধাও হয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ নিজেদের অসাড়ে হিন্দু বলত। কিন্তু হিন্দু নামে কোনও ধর্মের সন্ধান আমি পাইনি। জিজ্ঞাসা করলে শুনতাম, ওটা ধর্ম নয়, সম্প্রদায়, আসলে ধর্মটা হল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মণরা মাথা ঘামাতে পারেন, অব্রাহ্মণরা কখনওই চিন্তিত ছিলেন না। আমাদের মা পিসিরা অভ্যাসে পুজোআর্চা অথবা ঠাকুর সাজাতেন। মহাভারতের গল্প অথবা রামায়ণ পড়ে নিজেকে হিন্দু ভাবতেন। ক্রমশ ব্যাপারটা কমে আসতে লাগল।

বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজোর পাট চুকল। তবু বিয়ে শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময় পুরোহিত দেখে সংস্কৃত মন্ত্র শুনতে তথাকথিত হিন্দু বাঙালি কম উৎসাহী ছিল না।

'দাদু! পুজোর মন্ত্র কেন সংস্কৃতে বলা হয়? বাংলা কি দোষ করল?'

'মূল মন্ত্র সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল, সেই রেওয়াজটাই চলেছে।'

'আশ্চর্য! যে ভাষায় মানুষ কথা বলে না, যে ভাষাটা মানুষ বোঝে না সেই ভাষাটাকে আরাধনা করার সময় কেন ব্যবহার করা হবে?'

'এখন তো কেউ বাড়িতে বাড়িতে পুজো করে না তাকে সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। সময় ঠিকই বাহুল্যকে সরিয়ে দেয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু এই প্রদর্শনীতেও সংস্কৃত মন্ত্রের কি দরকার?'

'অতীতকে ঠিকঠাক রাখতে গেলে ওটা দরকার।'

'খুব ফানি, না ? তুমি সংস্কৃত বোঝ ?'

'একটু আধটু।'

'বাবা মোটেই বোঝে না। বাবা বলেছে তোমার কোনও পূর্বপুরুষ সংস্কৃতে কথা বলত না। তোমার কি ব্যাপারটাকে বিদেশি-বিদেশি বলে কখনও মনে হয়নি ?'

'মনে হয়নি। কারণ আমাদের শৈশব থেকেই ওভাবে ভাবানো হয়নি। তা ছাড়া বাংলা সংস্কৃতের সন্তান বলে শব্দের মিল খুঁজে পেতাম বলেই মেনে নিতে খারাপ লাগত না। চলো, আর একটু ঘুরে দেখি।'

আমরা হাঁটতে লাগলাম। পার্কসার্কাসের মণ্ডপের পাশেই রাসবিহারীর মণ্ডপ। এখানে মায়ের সেই পরিচিত চেহারা নেই। সারদাময়ীর মতো মা দুহাতে লক্ষ্মী সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পার্কসার্কাসে। রাসবিহারীতে শুধু একটি বিশাল গোল মাতৃমুখ। যে যেমন ভাবছে তেমন গড়ছে।

'হাই দাদু!'

ডাক শুনে নাতিকে দেখতে পেলাম; সঙ্গে উগ্র পোশাকের একটি যুবতী। আড়চোখে দেখলাম নাতনির মুখ গম্ভীর এবং দূরের মণ্ডপ দেখছে খুব মন দিয়ে। বললাম, 'কখন এলে ?'

'অনেকক্ষণ। এ রকম ইন্টারেস্টিং জায়গায় না এসে পারা যায়। আমার বান্ধবী নিয়া।'

নিয়া বলল, 'হাই! আপনি তো পুরনো লোক। বলুন তো, সরস্বতী বিবাহিতা ?'

'না।'

'দেখলে ?' নিয়া নাতিকে চোখের ইশারা করল।

নাতি বলল, 'ওয়েল, লক্ষ্মী ম্যারেড ছিল। তার স্বামীর নাম নারায়ণ। সেই লোকটাব সঙ্গে সরস্বতী লিভ টুগেদার করত ?'

'আমি শুনিনি। তবে বোধ হয় ভাবের অভাব ছিল না।'

'লক্ষ্মী সেটা টলারেট করত ?'

'তা কি কোনও মেয়ে করে ? সেই জন্যই বোধ হয় যাকে সরস্বতী দয়া করত তাকে লক্ষ্মী বিমুখ করতেন। এসব নিয়ে ভাবছ কেন ?'

নিয়া কাঁধ নাচিয়ে হাসল, 'আপনাদের সময় দেবদেবীরা খুব মড ছিল। আমি শুনেছি তখন সেক্স নিয়ে কোনও বাছবিছার ছিল না।'

নাতনি বলল, 'দাদু চলো!'

আমি কিছু বলার আগেই নাতি হাত নেড়ে তার বান্ধবীকে নিয়ে হাঁটতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি ওদের সঙ্গে কথা বললে না কেন ?'

নাতনি বলল, 'দুচক্ষে দেখতে পারি না ওই মেয়েটাকে। তুমি জানো না দাদু, ও এর মধ্যে দু-ডজন ছেলেকে ঘুরিয়ে এখন দাদাকে ধরেছে। মহাকাশ নিয়ে ডক্টরেট করছে বলে যেন মাথা কিনে নিয়েছে।'

'মহাকাশ নিয়ে ডক্টরেট? তা হলে সে তোমার দাদার চেয়ে বড়!'

'পাঁচ বছরের বড়। অথচ ভাব দেখায় আমার চেয়েও ছোট। দাদাটা একটা গাধা।'

'দাদাকে গাধা বলতে নেই। আজকাল গাধা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আগে ধোপারা পুষত। এখন তো মেশিনের দৌলতে ধোপার কাজ কেউই করে না। চিড়িয়াখানায় গেলে অবশ্য দেখা যায়।

পাতাল রেলে চেপে হুস করে আবার ফিরে এলাম। তিরিশ বছর আগে এটা কল্পনা করা যেত না। পুজোর কটা দিন মাইকের জ্বালায় কানের বারোটা বাজত। পথঘাটে গাড়ি নড়ত না ভিড়ের চাপে। এখন সব সুনসান। বেশির ভাগ অফিস কাছারি চলে গিয়েছে নিউ সল্ট লেকে। ডালহৌসি ধর্মতলা ফাঁকা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আর মন্ত্রীরা বসেন না। তাঁদের জন্য এয়ারপোর্টের পিছনে ক্যালকাটা ডাউনটন বলে একটা জায়গায় মন্ত্রিভবন হয়েছে। সি এম ছাড়া অন্য কোনও মন্ত্রী গাড়িতে লাল আলো জ্বালতে পারেন না, অন্যায় করলে তাঁদের গাড়ির নম্বর পুলিশ টোকে।

বাড়ি ঢোকার আগে মনে পড়ল বছর পাঁচেক আগে কাছাকাছি একটি মঠ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম। তাঁরা আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলেন। মঠ আশ্রম এ সব ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ না থাকায় জবাব দিইনি। আজ মনে হল আমার যৌবনে ওঁরা জাকজমক করে পুজো করতেন। এখন বারোয়ারি পুজো বন্ধ হলেও মঠের পুজো নিশ্চয়ই চালু আছে।

নাতনিকে নিয়ে সেখানে হাজির হলাম। ভর সন্ধে। মঠের বাইরে থেকে ভিতরে পুজো হচ্ছে কি না বুঝবার কোনও উপায় নেই। দেখলাম, দেড়শো বছরের পিতলের দুর্গা ঠাকুরের সামনে এক বৃদ্ধ ধুনুচি নিয়ে আরতি করছেন। জনা পনেরো বৃদ্ধবৃদ্ধা সেই দৃশ্য দেখছেন তন্ময় হয়ে। আমাকে দেখে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, 'আসুন, মা আপনার মঙ্গল করবেন।'

আমি কিছু বলার আগেই নাতনি প্রশ্ন করল, 'আপনি নিশ্চয়ই পেতলের দেবীর কথা বলছেন। উনি কীভাবে মঙ্গল করে থাকেন তা কি আপনি জানেন?'

'আমরা বিশ্বাস করি উনি জগতের মাতা। সর্বশক্তির আধার।'

'কী কারণে বিশ্বাস করেন?'

'মা, তুমি পড়াশুনা করলে এসব জানতে পারবে। আমরা হিন্দু। আমাদের ধর্ম শাশ্বত। তুমিও নিশ্চয়ই হিন্দু?'

'আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় ওসব ফালতু ব্যাপার। রিলিজিয়ন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আর নেই। মানুষের ধর্ম হল নিজের কাজ ঠিকঠাক করা আর যে অশক্ত তাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা। ধর্ম যদি বলেন ওটাই হওয়া উচিত।'

নাতনি চোখা চোখা কথা বলে ফেলল।

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি অস্বীকার করলে কী হবে, রক্তসূত্রে তুমি হিন্দু। আর হিন্দুধর্মে

মানুষের উপকার করার কথাই বলা আছে।'

'তাহলে মা-মা করছেন কেন? একটা মূর্তি কারও মঙ্গল করতে পারে না। এ কথা যদি আগে কেউ বলত, আপনারা তাকে ভয় দেখাতেন। কারণ দুর্বল মুহূর্তে মানুষকে ভয় দেখিয়ে হাত করা খুব সোজা ব্যাপার। রক্তের সুবাদে আমি কী করে হিন্দু হব? আমার ঠাকুর্দা, এই উনি, কখনও পুজো করেননি। মন্ত্র পড়েননি। বিফ হ্যাম খেয়েছেন। বাবার হ্যাম খেতে খুব ভাল লাগে। রেড মিট বলে খান না। অতএব আমাদের বংশের রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।'

নাতনি হাসল।

'হ্যাঁ। তুমি নব্য সংস্কৃতির মানুষ, তুমি তো এ কথা বলবেই। মশাই, আপনি প্রবীণ। এই এত হাজার বছর ধরে যে ধর্মকে আমাদের পূর্বপুরুষরা রক্ষা করে এসেছেন তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে আপনি কি আগ্রহী নন?'

আমি হাসলাম, 'আপনি যদি পুজোর কথা বলেন তা হলে তো বলব ময়দানে পুজো হচ্ছে। সবাই সেখানে দেখতে যাচ্ছে।'

'ওটাকে কি পুজো বলে? একজিবিশন হচ্ছে। এক ফোঁটা ভক্তি আছে সেখানে? ফাজলামি মারা হচ্ছে। এখন আমরাই বৈদিক মতে পুজো করি। ওরা টেপে মন্ত্র বাজায়, আমাদের গুরুদেব মুখস্থ বলেন। প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ সুন্দরভাবে করা হয়। মুশকিল হল, তরুণ প্রজন্ম বিপথে চলে যাওয়ায় তেমন ভিড় হচ্ছে না। একসময় রাস্তায় 'নো এনট্রি' বোর্ড বসত। ভিড়ের চাপে গাড়ি ঢুকত না। পুলিশ হিমসিম খেত, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা দিন-রাত খাটত। এখন সব শেষ। এই কজন মানুষ তবু আসেন। অবশ্য রোজ পারেন না শরীরের কারণে। কোনও আর্থিক সাহায্য পাই না বলে বেশ কষ্ট হয়। মাইক আমরা কখনই বাজাতাম না, কিন্তু কাঁসরঘণ্টা ঢাকঢোল বাজত। পুলিশ থেকে সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। পাড়ার মধ্যে থেকে ওসব শব্দ করা যাবে না, তাতে বাকি মানুষের অসুবিধে হবে। আপনি বলুন, ঢাকের বাজনা কানে গেলে কোনও মানুষের অসুবিধে হয়? বলেছিল ময়দানে গিয়ে বাজাতে। ইম্পসিবল।'

ভদ্রলোককে খুব ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ নাতনি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এত বড় বাড়ি, সারা বছরে এখানে কি হয়?'

'বাড়ি নয়, মঠ মন্দির। সারা বছরই আমরা পুজোআর্চা ধর্মালোচনা নিয়ে থাকি।'

'তাতে আপনাদের কোনও লাভ হয়েছে?'

'মন শুদ্ধ হয়। পবিত্রতা আসে।'

'মন পবিত্র হলে আপনি অমন রেগে গেলেন কেন?'

'রাগব না? রাগ আপনি আসে।'

'তার মানে আপনার কিছুই হয়নি। অবশ্য আপনি বৃদ্ধ, কোনও কাজ করার

নেই তাই এ সব করেছেন। অল্পবয়সী হলে কোনও এক্সকিউজ দেখাতে পারতেন না। তখন বলতাম একটা মেকি আড়াল সামনে রেখে আরামসে থাকবেন বলে এ সব করছেন।' বৃদ্ধ লাল চোখে আমার দিকে তাকালেন, 'এসব কি আপনার শিক্ষা ? তা হলে বলুন চৈতন্যদেব ভুল ? বিবেকানন্দ মিথ্যাচার করেছেন ?'

বললাম, 'ওঁদের আবার টানছেন কেন ? আর, বিবেকানন্দ তো মূর্তিপুজো করতে বলেননি। বলেছেন কাজ করতে। আর আমরা যেমন সংস্কৃত বলতাম না, শুধু কয়েকটা কাজে পুরোহিতের মুখে শুনতাম, তেমন এরা ধর্ম অথবা পুজোকে বাৎসরিক একজিবিশন করে দেখে নেয়। এই পরিবর্তন মেনে নিতে হবে।'

'হবে! এক সময় ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ এ দেশে হত না জানেন ?'

'হ্যাঁ। সেই গোঁড়ামিও তো ভেঙেছিল। তারপর এল এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের বিয়ে। দুজনের যদি আলাদা বিয়ের মন্ত্র হয় তখন সরকারি নিয়ম মানা শুরু হল। সারা জীবন বাপ-মাকে যন্ত্রণা দিয়ে তাঁদের মৃত্যুর পর মাথা মুড়িয়ে শ্রাদ্ধ করে লোক খাওয়ানো এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে। যারা সত্যি শ্রদ্ধা করত তারা একটা শ্রাদ্ধবাসরে পাঁচজনকে আমন্ত্রণ জানায়। এটাই ঠিক।'

রাত্রে খাওযার টেবিলে বসে দেখলাম অন্য দিনের চেয়ে মেনু ভাল হয়েছে। বউমাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'আপনি বলতেন এই কটা দিন ছেলেবেলায় ভালমন্দ খেতেন। তাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আজ টিভিতে অনেক পুরনো বাংলা ছবি দেখাবে।'

'কী ছবি ?'

'দেবী। সত্যজিৎ রায়ের।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে জামদানি রঙের আকাশ দেখতে দেখতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের নায়িকা দয়াময়ীর মুখ মনে পড়ল! আহা, আমার নাতনির সঙ্গে যদি ওর দেখা হত!

আর একজনের মত আমি

বিকেলে খবর এল আমাকে আজই দার্জিলিং যেতে হবে। কাজটা অত্যন্ত জরুরি, আগামীকাল দুপুরে মিটিং। ইদানীং ট্রেনে যাতায়াত করি না। দার্জিলিং মেলের টিকিট চাইলেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া চোদ্দ ঘণ্টা একা ট্রেনে বসে থাকতে একদম ভালো লাগে না। টেলিফোন করে জানলাম, আজকের ফ্লাইট চলে গেছে। কাল বাগডোগরায় কোনো প্লেন যাবে না। অতএব অস্বস্তি হলেও কোনো উপায় নেই। বেয়ারাকে পাঠালাম স্টেশনে। সে টিকিট কেটে রাখবে। শুনেছি টি.টি.-কে অনুরোধ করলে বার্থ পাওয়া যায়।

আমার বেয়ারা যে এত তৎপর জানতাম না। সে মাত্র তিরিশ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে একটি সেকেণ্ড ক্লাস থ্রি-টায়ার ব্যার্থ জোগাড় কবে ফেলেছে। এককালে জলপাইগুড়ি থেকে প্রতি বছরে বার-দুয়েক যাওয়া-আসা করতাম জেনারেল কম্পার্টমেণ্টে, রিজার্ভেশন ছাড়াই। সে বড় আনন্দের দিন ছিল। কলেজের বন্ধুদের নিয়ে সেসব যাত্রায় দারুণ মজা হত। তারপর সেকেণ্ডক্লাস রিজার্ভেশন, পরে ফার্স্টক্লাস অথবা এসি ছাড়া যাওয়ার কথা ভাবতেই পারিনা। সেকেণ্ডক্লাসের টয়লেটে যাওয়া যায় না, অবিরত কিচির মিচির, জোর করে সিট দখল করা, ভোরে মুখ ধোওয়ার জল পাওয়া যায় না। বেয়ারার হাত থেকে টিকিট নিয়ে অসহায় চোখে তাকালাম। ও ভেবেছিল এখন আনন্দিত হয়ে বাহবা দেব।

ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল। ভিড় উপচে পড়ছে। যত লোক যাবে তত লোক তুলতে এসেছে। নির্দিষ্ট কামরায় উঠে সিট খুঁজে খুঁজে আমি হতভম্ব। একেবারে টয়লেটের সামনে আমাকে চোদ্দ ঘণ্টা কাটাতে হবে। এখনই দুর্গন্ধ ছুটে আসছে। এভাবে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবলাম নিচে নেমে টি.টি.-কে বলে বার্থটা পাল্টে নিই।

সেকেণ্ডক্লাসের টি.টি.-র সামনে যাওয়ার উপায় নেই। চাক-ঘিরে-থাকা মৌমাছিদের মতো বার্থবিহীন যাত্রীরা তাঁকে অনুরোধ করে যাচ্ছেন সমানে। ট্রেন ছাড়ার আগেই লোকটা নিশ্চয়ই খালি বার্থগুলোর দখল দিয়ে দেবে। কি করা যায় ?

দূর থেকেই দেখতে পেলাম এক মোটাসোটা গোলগাল টিকিট চেকার আসছেন। বিনা বার্থের যাত্রীরা তাঁকে দেখে ছুটে যাচ্ছে কাছে আবার তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনে ছিটকে যাচ্ছেন যেন। বোঝা যাচ্ছে বার্থ দেবার ক্ষমতা এর নেই। আমার সামনে এসে যেন থমকে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে হাত জোড় করলেন, 'আরে আপনি স্যার ? কেমন আছেন ? কোথায় যাচ্ছেন ?'

গোলগাল, মাংসল মুখ, মাথায় বিস্তর টাক, কালো কোট-পরা মানুষটিকে আমি আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই ধরা পড়ছে আমার স্মৃতি মধ্যে মধ্যে বেইমানি করে। কি লজ্জাজনক অবস্থা হয় তখন। হয়তো এঁর সঙ্গে কখনও আলাপ হয়েছিল—, হেসে বললাম, 'যাব তো শিলিগুড়ি কিন্তু এত বিচ্ছিরি বার্থ পেয়েছি...।' আমি কথা শেষ করলাম না। ভঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমার একটা ভালো বার্থ চাই।

'দিন, ব্যাগটা আমাকে দিন। আরে দিন না। আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি ব্যাগ হাতছাড়া না করে ওঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। উনি হনহনিয়ে হাঁটছেন। দুপাশ থেকে অনুরোধ আসছে আর উনি নিঃশব্দে হাসিমুখে মাথা নেড়ে হেঁটে চলেছেন। এই হাসি মহাপুরুষ ছবিতে চারুপ্রকাশ ঘোষ হাসতে পেরেছিলেন।

সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট ছাড়িয়ে ফার্স্টক্লাস এল। ভদ্রলোক যদি ফার্স্টক্লাসের চেকার হন তাহলে আমার টিকিটটা এ্যাডজাস্ট করে নেব। কিন্তু উনি ফার্স্টক্লাসও পেরিয়ে গেলেন। দার্জিলিং মেল যে এত লম্বা হয় আমার জানা ছিল না। এসি ফার্স্টক্লাসের সামনে পৌঁছে উনি হাত বাড়ালেন, 'এবার ব্যাগটা আমাকে দিন স্যার।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম। জীবনে কখনো এসি ফার্স্টক্লাসে উঠিনি। শুনেছি এখানকার ভাড়া প্লেন ভাড়ার সমান। প্লেনে চড়তে যার আপত্তি নেই তার কেন এসি ফার্স্টক্লাসে আপত্তি? আসলে প্রথমে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস, পরে দার্জিলিং মেলে গত তিরিশ বছর ধরে দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করতে করতে একটা মানসিক স্থিতি এসে গিয়েছে, তা এতক্ষণে টের পাচ্ছি। চব্বিশ ডলার দিয়ে বিদেশি পারফিউম নিতে অসুবিধে হয় না কিন্তু হাজার টাকার আতর মরে গেলেও কিনব তা। অনেকটা এই রকম।

ভদ্রলোক তাহলে এসি ফার্স্টক্লাসের টিকিট চেকার অথবা কণ্ডাকটর। আমাকে যত্ন করে যে কুপেতে বসালেন সেখানে আর কোন যাত্রী নেই পায়ের তলায় কার্পেট। বাইরের গরম, হল্লা কিছুই এখানে ঢুকছে না। ব্যাগ সিটের নিচে চালান করে হাত ঝেড়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন স্যার, বলুন!'

আমি দ্রুত মাথা নাড়লাম, 'না না কিছুর দরকার নেই।'

'তা কি হয়! এতদিন পরে আপনাকে পেয়েছি।' পরদা টেনে নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি হতভম্ব। এতদিন পর মানে? কোথায় দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে? এখন এই অবস্থায় সেকথা জিজ্ঞাসা করি কি করে? অস্বস্তি বাড়ছিল। এরকম উপছে-পড়া ভিড়ের ট্রেনে আমি একটু আগে যে অবস্থায় ছিলাম আর এখন যেভাবে আছি, তা কল্পনাও করা যায় না। সবে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছি এইসময় দরজায় শব্দ হল। ভদ্রলোক উঁকি মারলেন, 'স্যার, একজন মহিলা, মানে লেডি যদি এখানে ঢোকেন, তাহলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?' প্রশ্ন করেই নিজেই উত্তর দিলেন, 'হবে না মনে হয়। এই বার্থগুলো তো খালি রয়েছে। এ্যাই কোলি, সমান নামাও।'

হুকুম দেওয়া মাত্র কুলি দুটো ভারি স্যুটকেস ঢোকাল। তাদের চেহারা এত বড় যে সিটের নিচে ঢুকছিল না। একপাশে সরিয়ে রাখতে হল। করিডোরে মহিলার মিহি গলা শুনতে পেলাম, কত দিতে হবে ভাই?

কুলি বলল, 'পঞ্চাশ।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ধমকালেন 'মারব গালে থাপ্পড়। পঞ্চাশ। চল্লিশ নে হতভাগা। মেয়েছেলে পেয়ে ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা? ম্যাডাম চল্লিশ দিন।'

'আমি মেয়েছেলে না ম্যাডাম?' গলার স্বর তীক্ষ্ণ হল। বুঝলাম যিনি আসছেন তিনি লবঙ্গলতিকা নন।

ভদ্রলোক বললেন, 'হেঁ হেঁ। ঘরের মানুষকে বলতে বলতে মুখ ফসকে এখানে বলে ফেলেছি ম্যাডাম।'

কথাবার্তায় বুঝলাম মহিলা তিরিশ টাকায় কুলিকে বিদায় করলেন, 'আপনাকে কত দিতে হবে বলুন?'

'ফাইভ হাণ্ড্রেড ফিফটি।'

'গতবার তো পঞ্চাশ কম নিয়েছিলেন।'

'জিনিসপত্রের দাম যেভাবে হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, আচ্ছা পঞ্চাশ কম দিন। আপনি হলেন যাকে বলে পুরনো কাস্টমার।' আমার দিকে পেছন ফিরে ভদ্রলোক টাকা পকেটে নিয়ে চলে গেলেন দ্রুত। এতক্ষণ তাঁর শরীর আড়াল করে ছিল, আড়াল সরে যেতে মহিলাকে দেখতে পেলাম। অন্তত পাঁচ-ছয় লম্বায়, গায়ের রঙ পাকা ধানের মতো, ঈষৎ মেদবতী, এই মহিলা একদা অনেক পুরুষের মাথা ঘুরিয়েছেন, কিন্তু সেই স্মৃতি ভুলতে পারেননি বলে এখনও মুখের ওপর শিল্পকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। কুপের ভেতরে ঢুকে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উল্টো দিকের গদিতে ধপাস করে বসলেন। তারপর হাতের ব্যাগ থেকে একটা ইংরেজি সিনেমার পত্রিকা বের করে পড়তে লাগলেন।

মেয়েদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস আমার কখনো ছিল না। কিন্তু অতিনাটকীয়ভাবে পত্রিকা পড়তে তো কাউকে দেখিনি। এইসময় একটা উর্দি-পরা লোক ট্রে নিয়ে ঢুকল, 'সাব, আপনার চা।'

আমি কিছু বলার আগেই লোকটা ট্রে রেখে গেল। দেখলাম সুন্দর চায়ের পট, কাপ ডিস চিনি দুধ এবং কয়েকখানা বিস্কুট রয়েছে। ট্রেনে এত পরিষ্কার কাপ ডিস এই প্রথম দেখতে পেলাম। বুঝলাম চেকার ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। গম্ভীর মুখে কাপে চা ঢালছি, এইসময় প্রশ্ন ভেসে এল, 'এসব কি ইনক্লুসিভ?'

তাকিয়ে দেখলাম নতুন কেউ কুপে ঢোকেনি অতএব প্রশ্নটির উত্তর দিতে প্রশ্ন করতে হল, 'তার মানে?'

উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার পড়া শুরু করলেন। আমি চা শেষ করলাম। এবার

সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাতে যেতেই মহিলা বললেন, 'এক্সকিউজ মি, আমি কড়া সিগারেটের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না।'

অতএব বেরিয়ে করিডোরে চলে এলাম। ট্রেন ছাড়ল। এসি ফার্স্টক্লাস বলে খালি নেই কোনো কুপে। দার্জিলিং মেলের ভিড় এখানেও পৌঁছেছে। চেকার ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। সিগারেট শেষ করে ভেতরে ফিরে এলাম। মহিলা বই পড়ে যাচ্ছেন। মনে হল কথা বলা দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এন জি পিতে যাচ্ছেন?'

বই সরিয়ে রেখে মাথা নাড়লেন, 'আপনি?'

'আমিও।'

'বাঃ, কী ভালো। বেশ কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। এর আগের বার একটা ভুল করে ফেলে খুব বোর হয়েছিলাম।'

'কিরকম?'

'এই আপনার মতো, না, আপনার চেয়ে ফর্সা, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি একা যাচ্ছেন? শুনে মাথা জ্বলে গেল। দেখছে একা যাচ্ছি, তবু প্রশ্ন করছে। ন্যাকামো।'

বলে দিলাম, 'এরপর জিজ্ঞাসা করবেন তো, স্বামী নেই কিনা, বাচ্চা আছে কিনা, বাড়ির ফোন নম্বর কি? আমি কিভাবে যাচ্ছি, তা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন?' বলতেই লোকটার মুখ চুপসে গেল। সারাটা পথ আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারি না, তবে হঠাৎ হঠাৎ রাগ হয়ে যায়। এই যে একটু আগে আপনি আমায় অফার না করে চা খাচ্ছিলেন তখন আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।'

মাথা নাড়লাম, 'সরি। তখনও তো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি।'

'আলাপ কি এখনও হয়েছে? আমার নাম সুহাসিনী ভট্টাচার্য।' আমি নিজের নামটুকুই বললাম। উনি আবার পত্রিকায় মন দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে চলন্ত ট্রেনে চেকার দুলতে দুলতে এলেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার?'

'না, ঠিক আছে।'

'একটু আসবেন?'

'কোথায়?'

'এই, একটু বাইরে।'

আমি বের হতেই উনি হাঁটা শুরু করলেন। কামরার এক প্রান্তে দেওয়ালের ভেতর কণ্ডাক্টর গার্ডদের জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা আছে। সেখানে পৌঁছে চেকার খুব বিনীত ভঙ্গিতে আগেই ঢেলে রাখা এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দিলেন, 'আপনার জিনিস স্যার। ভাগ্যিস এই বোতলটা আমার কাছে ছিল নইলে বর্ধমান থেকে নিতে হত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হবে, এই যা। আপনার কুপেতে ভদ্রমহিলা আছেন,

খুব রগচটা মহিলা।' যেন আমাকে সেবা করছেন ভদ্রলোকের এমন মুখের ভাব।

মাঝে মধ্যে পান আমি করি। কিন্তু নেশায় পড়িনি। দিনের পর দিন না খেলেও চলে যায়, খেলেও তুরীয় আনন্দ অনুভব করি না। কিন্তু এভাবে চলন্ত রাতের ট্রেনে বন্ধ দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে মদ খাব কেন? ভদ্রলোক এমন ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে আছেন যে আমি না খেলে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাচ্ছে না। অর্থাৎ উনি আমাকে যা ভাবছেন সেই মানুষটি যে এই মদ খেতেন, তা ওঁর জানা। কিন্তু আমাকে দেখে এত ভুল করছেন কেন? লোকটি কি আমার ডুপ্লিকেট? শুনেছি এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও একটি মানুষের চেহারায় দুজন ঘুরে বেড়ায়। তুমি কলকাতায় আর সে হয়তো লসভেগাসে। এত কাছাকাছি আমার মতো কেউ থাকলে তো বেশ মুশকিলের কথা। আমি চুমুক দিতেই ভদ্রলোক জিভ কাটলেন, 'যা, একদম ভুলে গেছি, আপনি তো আবার বাদাম ছাড়া খেতে পারেন না।' আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি ছুটলেন।

মদ খেতে এত খারাপ কখনো লাগেনি। দু-একজন করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় আমায় দেখে গেল। আমি যতই গ্লাস আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকিনা কেন, ওরা ঠিক বুঝতে পারছে আমি কুকর্ম করছি। এই হুইস্কি, ওই চা, এসবের জন্যে কত পড়বে কে জানে! লোকটার হাত থেকে এবার বাঁচা দরকার।

শেষ চুমুক দেবার আগে ভদ্রলোক ফিরে এলেন, 'টাইমে এসে গেছি স্যার। বাদাম পেলাম না, কাজু নিয়ে এলাম। বর্ধমানে প্রচুর বাদাম পাওয়া যাবে। রানিং ট্রেন তো। দিন গ্লাসটা।'

'আর ঢালবেন না।' প্রতিবাদ করলাম।

'কি বলছেন স্যার। সেবার, মনে আছে, আপনি একটা পাঁইট একাই খেলেন।'

'এখন শরীর ভালো নেই।'

'তাহলে জোর করব না। আপনার এত ব্যবসা, কলকাতা শিলিগুড়িতে অতবড় ফ্যাক্টরি, এসব তো বাঁচাতে হবে। তা ডিনার কি করবেন?'

'আমার সঙ্গে আছে।'

'সেকি! না স্যার, আপনি বোধহয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'না না। একথা কেন বলছেন?'

'তাহলে ডিনার আনতে গেলেন কেন? আমি বর্ধমানে ব্যবস্থা করতাম সেবারের মতো। আর হ্যাঁ, মহিলার জন্যে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। এনাফ।'

ফিরে আসার সময় হুইস্কির কথা মনে এল। ভদ্রমহিলা গন্ধ টের পাবেন নাকি! ভেতরে ঢুকে গম্ভীর মুখে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে বসলাম। উনি শুয়ে শুয়ে পড়ছিলেন। উঠে বসলেন, 'আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন?'

চমকে উঠলাম, 'না মানে?' কি বলি?

'আমি একজন ভদ্রমহিলা, আমাকে না বলে চোরের মতো ড্রিঙ্ক করে এলেন ?' ওঁর গলার স্বর চড়ছিল। রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'একশো বার করেছেন।'

'আমার কি করা উচিত ছিল ?'

'আমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল, আমাকে অফার করা উচিত ছিল, আমি আপত্তি জানালে যেটা করেছেন করে আসতে পারতেন।'

'একজন মহিলাকে ওটা অফার করা যায় ?'

'কেন যায়না ? পৃথিবীর কোথাও কি মহিলারা ড্রিঙ্ক করে না ?'

'এটা যে ভারতবর্ষ।'

'ছাই। ভারতীয় নারী ভারতীয় নারী বলে তো আপনারা মেয়েদের বারোটা বাজাতে চাইছেন। কবে কোন ভারতীয় নারী একা আপনার মতো এক উটকো পুরুষের সঙ্গে এমন কুপেতে ট্র্যাভেল করেছে ? করেছে ?'

'না, করেনি।'

'তবে ? আপনি নিশ্চয়ই চাকরি করেন ?'

দ্রুত মাথা নাড়লাম। সদ্য শোনা পরিচয়টা উগরে দিলাম, 'ব্যবসা করি। শিলিগুড়ি কলকাতায় ফ্যাক্টরি আছে।'

'ব্যবসায়ীরা এত অভদ্র হয় জানতাম না।' ঠোঁট বেঁকালেন তিনি।

হঠাৎ ঠাট্টা করার বাসনা জাগল, 'আপনি খেলে আনিয়ে দিতে পারি।'

'থাক !' কড়া গলায় বললেন উনি।

খানিকবাদে ওঁর রাতের খাবারের বাক্স বের হল। প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, স্যাণ্ডউইচ থরে থরে, বললেন, 'নিজের ব্যবস্থা আছে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন, আপনাকে বলে তবে খাচ্ছি।'

চোখের সামনে বাক্স খালি হল। জলের বোতল থেকে জল খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, সম্ভবত টয়লেটে। খুব মেজাজ খারাপ হল। সাধারণত রাত্রের দিকে আমি কম খাই। আজ তাড়াহুড়োয় সেইটুকু খাবার আনতেও ভুলে গেছি। তখন চেকারকে না বলে ভুল করেছিলাম, এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করলাম।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে বললেন, 'এই যে মশাই, গা তুলুন, বাইরে যান।'

'কেন ?'

'আমি চেঞ্জ করব। টয়লেটে চেঞ্জ করতে আমার ঘেন্না লাগে।'

দ্রুত বেরিয়ে এলাম। করিডোরে পায়চারি করতে করতে চেকারের সঙ্গে দেখা। বর্ধমান এসে গেছে। খুব ব্যস্ত। স্টেশনে ট্রেন থামতেই একটু দূরে হেঁটে গেলাম। গরম পুরী তরকারি বিক্রি হচ্ছে। তাই খেয়ে নিলাম।

ট্রেন ছাড়ার আগে কামরায় ফিরে আসতেই চেকার বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন

স্যার ? দরকার পড়লে আমাদেরই বলতে পারতেন।'

'একটু হাঁটলাম।' হাসলাম আমি।

'আপনি আজ সেবা করলেন না, খুব খারাপ লাগছে।'

'তাই নাকি ? তাহলে দিন।'

'সত্যি ? শরীর টরীর ?'

'ঠিক আছে।'

আবার খোপ থেকে বোতল বের হল। জল এবং গ্লাস। বললেন, 'বাদাম আনি ?'

'দরকার নেই।' আমি গ্লাসে চুমুক দিলাম।

দেখলাম, আমি খাওয়ার পরও একটু কমে গেছে বোতল থেকে। তিন গ্লাস পেটে ঢালতেই তলানিতে চলে এল হুইস্কি। চেকার বলল, 'স্যার লুচি আর মাংস আছে, দেব ?' মাথা নেড়ে না বললাম।

চেকার যাওয়া-আসা করছিলেন। বললেন, 'আপনার বিছানা রেডি। কিন্তু না খেয়ে শোবেন কেন ?'

'আমি ঠিক আছি।'

সবসমেত চার পেগ পেটে পড়েছে কিন্তু ছুটন্ত ট্রেনে পা ফেলতে গিয়ে বুঝলাম নেশা হয়েছে। শরীর একটু বেটাল হচ্ছে। কুপের দরজা বন্ধ। টোকা দিতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। ভদ্রমহিলার চিৎকার শোনা গেল, 'কে ?'

'আমি। ফিরে এসেছি।'

'দরজা খোলাই আছে।'

টানতেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমার বার্থে চমৎকার বিছানা করা আছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা শুয়ে পড়লাম দেওয়ালের দিকে মুখ করে। ভদ্রমহিলার প্রতিবাদ কানে এল। এিক ! দরজা বন্ধ করলেন না ?'

উত্তর দিলাম না।

'অসভ্য লোক তো।' দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, চাকার আওয়াজে এবং দুলুনিতে ঘুম এসে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রশ্ন কানে এল, 'কত দিলেন ? আমি অবশ্য পাঁচশোর বেশি দিইনা। ওদের তো বাঁধা রেট আছে। সেকেণ্ডক্লাসে একশো, ফার্স্টক্লাসে তিনশো আর এখানে পাঁচশো। প্রচুর টাকা বেঁচে যায় এবং টিকিট কাটার ঝামেলা থাকে না।'

সর্বনাশ ! ঘুম চটকে গেল। তার মানে সকাল হলেই লোকটা আমার কাছে টাকা চাইবে। পাঁচশো প্লাস মদের দাম প্লাস চায়ের বিল। আমার সেকেণ্ডক্লাসের টিকিটটা কোনো কাজে লাগবে না।

'আপনার নাক ডাকে ?'

কুঁকড়ে গেলাম ? সেটা যে একটু-আধটু হাঁকাহাঁকি করে না, তাই বা বলি কি করে ? ঘুমিয়ে পড়লে আমি অবশ্য টের পাইনা।

উত্তর দিলাম না।

'তাজ্জব মানুষ। ড্রিঙ্ক করেন কেন যদি স্ট্যাণ্ড না করতে পারেন।'

সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন ট্রেনটা মাঝরাত্রের নির্জন কোনো মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সিগন্যালের অপেক্ষায়। উঠে বসলাম।

আহা, একি দৃশ্য। ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে আছেন রাজেন্দ্রাণীর মতো। ওঁর নীল রাতপোশাক কি সুন্দর। পা সরে যাওয়ায় পোশাকের কিছুটা উঠে গেছে। ফলে নিটোল চামড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মদের গন্ধ পেলাম, মদ খেলে কেউ মদের গন্ধ পায় না। অথচ এই কুপেতে সেরকম একটা গন্ধ ভাসছে। তাকিয়ে কোনো কিছু দেখতে পেলাম না। ভদ্রমহিলার মাথার পাশে ছোট্ট টেবিলে একটা কাঁচের গ্লাস রয়েছে। সেটা তুলে শুঁকতেই অ্যালকোহলের গন্ধ নাকে এল। অর্থাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি পান করেছেন। সঙ্গে ছিল অবশ্যই।

এখন উনি সুন্দর ভাবে ঘুমাচ্ছেন। মহিলা একদা সুন্দরী ছিলেন এখন ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী। ওঁর স্বামী নিশ্চয়ই আদর টাদর করেন। অবশ্য ইনি বিবাহিতা কিনা বুঝতে পারছি না। তবে এখনও যৌবন আছে এমন মহিলা নির্জন ট্রেনের কুপেতে অচেনা পুরুষকে পাশে রেখে এভাবে ঘুমাতে পারে কি করে, তা নিয়ে তর্ক উঠলেও যা সত্য তা চিরকালই সত্য।

ঘুমানোর ফলে আমার নেশা চলে গিয়েছিল। আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমন্ত সুন্দরীকে দেখতে লাগলাম। আমি যদি ওঁকে জড়িয়ে ধরি উনি চিৎকার করবেন। লোকজন ছুটে আসবে। পরের স্টেশনে পুলিশে দেওয়া হবে এবং কালকের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে। একটা বাইশ বছরের মেয়ে লজ্জায় যা মেনে নেবে, তা একজন চল্লিশের মহিলা নেবেন না। তাছাড়া আমি জড়াতে যাবই বা কেন ? আমার তো এতক্ষণ টয়লেটের নোংরা গন্ধ নাকে নিয়ে বসে থাকার কথা ছিল। কে জানত মদ খেয়ে ভালো বিছানায় বসে ঘুমন্ত সুন্দরী দেখতে পাব।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা চিৎ হয়ে শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাক ডাকতে লাগল। আস্তে আস্তে আওয়াজটা বাড়তে লাগল। কী বীভৎস শব্দাবলী। মনে হচ্ছিল ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারেন। এখন ওঁর সমস্ত সৌন্দর্য উধাও হয়ে গিয়েছে। এমন কি বুকের রহস্যও ফ্যাকাসে।

শেষপর্যন্ত আমি ডাকতে বাধ্য হলাম। ডাকামাত্র হড়মড়িয়ে উঠে বসে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ?'

'আপনার কষ্ট হচ্ছে ?'

'কেন ?'

'নাক ডাকছিল অমন করে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জেগে জেগে কি করছিলেন?'

'নাক ডাকার শব্দে জেগে গিয়েছিলাম।'

'মিথ্যা কথা। আমি গান গেয়েছি কিন্তু আপনি জাগেননি আর নাক ডাকার আওয়াজে জাগবেন ? এই ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে শব্দ পেলেন ?'

'পেয়েছি। বীভৎস আওয়াজ। আপনার যে কোনদিন হার্ট অ্যাটাক হবে।'

'হোক। আপনার কি!' ভদ্রমহিলা চোখ ঘোরালেন, আপনার খারাপ লাগবে ?'

'তা লাগতে পারে।'

'লাগতে পারে। লাগবে বললেন না।'

'লাগবে।' বললাম। 'পাশ ফিরে শোন, ঠিক থাকবে সব।'

'কি করে জানলেন ?'

'পাশ ফিরে শুলে আপনার নাক ডাকেনা।'

'তার মানে আপনি অনেকক্ষণ থেকে দেখছেন। নাক ডাকার শব্দে আপনার ঘুম ভাঙেনি। আপনি আমাকে দেখছিলেন।' চিৎকার করলেন তিনি।

আমি হাতজোড় করলাম। 'প্লিজ, চেঁচাবেন না।'

'আলবৎ চেঁচাব।'

'চেঁচানি শুনে লোক এলে তারা আপনার মুখে মদের গন্ধ পাবে।'

'ও তার মানে আপনি একটুও ঘুমাননি! ঘাপটি মেরে সব দেখেছেন ?'

'যা ইচ্ছে ভাবুন!'

আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

ইসলামপুর আসছে। আলো ফুটে গেছে অনেকক্ষণ। টয়লেট থেকে ফিরে এসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিজের নামটা মিথ্যে বলার কি দরকার ছিল ?'

'তার মানে ?'

'চেকারের কাছে সব শুনলাম। আট বছর আগে স্ত্রী গত হয়েছেন ?'

'কে বলল ?'

'কে আবার ? চেকার। তারপর থেকেই মদ গিলছেন! আমিও!'

'মানে ?'

'ও চলে গেছে বছর চারেক। ও খেত আমি খেতাম না। এক-আধ দিন শখ করে একটু-আধটু মাঝে-সাঝে। এখন খাই। রাত্রে নিজের ঘরে বসে।'

'ও।'

'কবে ফেরা হবে ?'

'পরশু।'

'আর একদিন বাড়ানো যায় না ?'

'কেন ?

'একসঙ্গে ফিরতাম। কেউ আপনার মতো আমাকে পাশ ফিরে শুতে বলেনি

জানেন ? কাল এত ভালো লাগছিল।'

'দেখি।'

'না। কথা দিতে হবে। স্টেশনে আমার দেওর নিতে আসবে, ওদের সামনে এসব বলব না। তরশু দার্জিলিং মেলের এসি ফার্স্টক্লাসে দেখা হবে। আমি চেকারকে বলে রাখব আপনার বার্থের জন্যে। ও.কে. ?'

মাথা নাড়লাম।

এন জি পি এসে গেল। সঙ্গে কুলির ঝাঁক। উনি আমার গায়ের কাছে চলে এলেন, 'আপনার একা লাগে না ?'

'তা লাগে।'

'আমি শিলিগুড়িতে দেওরের কাছে আসি আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে। ভুল বুঝবেন না।'

উনি কুলিকে নিয়ে ব্যস্ত হলেন। আমি ব্যাগ নিয়ে বের হলাম। চেকার ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, কোনো অসুবিধে হয়নি তো স্যার ?'

'না না।' আমি দাঁড়ালাম, 'কত দিতে হবে।'

'একটা কথা বলব স্যার ?'

'বলুন।'

'আমার ওয়াইফ লাইফ হেল করে দিচ্ছে।'

'কেন ?'

'আর বলবেন না। আমার শালাটা বেকার। কাঁধে বসে আছে। চাকরি পাচ্ছে না। আপনি যদি ওকে শিলিগুড়ির ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দেন।'

'কদ্দূর পড়েছে ?'

'বি কম। অ্যাকাউন্টস জানে। আমি কাল পাঠাই ? ওর নাম বলরাম ঘোষ। ও গিয়ে আমার কথা বললেই বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক আছে।' মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

চেকার হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন আমার সঙ্গে।

'আপনাকে কত দিতে হবে ?'

'ছি ছি ছি। একি বলছেন ? আপনার সেবা করে আমি ধন্য। অ্যাই শ্যামল ! চিৎকার করে পাশের কাগজের স্টলওয়ালাকে ডাকলেন তিনি, 'সাহেবকে চিনে রাখ যখনই আসবেন এসি ফার্স্টে তুলে দিবি।'

'ও.কে. বস !' শ্যামল জানাল !

'আপনি কোনো চিন্তা না করে চলে আসবেন। আমি না থাকি, শ্যামলকে বলবেন। অন্য কেউ থাকলে পাঁচশোর বেশি দেবেন না।'

'ঠিক আছে।' আমি পা বাড়াচ্ছিলাম।

'আর একটা কথা স্যার।'

‘বলুন।’

‘ভদ্রমহিলা আপনাকে খুব জ্বালাননি তো?’

‘আপনি ওঁকে চেনেন?’

এই ট্রেনে যাতায়াত করতে আলাপ। আপনার সম্পর্কে খুব কৌতূহল। একটু রাগী কিন্তু পয়সাওয়ালা ঘরের বউ। বউ মানে এখন বিধবা। আমি ইচ্ছে করেই আপনার কুপেতে ওঁকে দিলাম। সেবার বলেছিলেন স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আপনার কিছু ভালো লাগে না, মনে ছিল, স্যার।’

‘অনেক ধন্যবাদ।’

ওভারব্রিজে হাঁটতে হাঁটতে নীচে তাকালাম। ভদ্রমহিলা লটবহর নিয়ে আসছেন। তাঁর মাথায় আঁচল ঘোমটার মতো তোলা। পাশে একটি প্রৌঢ় গম্ভীর মুখে হাঁটছেন। পারিবারিক ছবি।

অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে মনে হল, তরশু আবার দেখা হবে। কিন্তু তরশু কি আমি আসব? আমার কি আসা উচিত? অবশ্য এ নিয়ে ভাবার সময় হাতে অনেক আছে।

অন্ধকারের মানুষ

টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম তরুণ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে। তরুণবাবু তখন একটি ভি.ডি.ও. কোম্পানীর হয়ে জঙ্গল নিয়ে সিরিয়ালের কথা ভাবছিলেন। সে-ব্যাপারে একটা খসড়াও করে ফেলেছিলেন। আলোচনা ছিল সেই ব্যাপারেই। গিয়ে প্রথম কিস্তি শুনে মুগ্ধ হলাম। মনে হল একটা নিটোল ছোট গল্প শুনলাম। ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম লেখাটাকে ছোট গল্প হিসেবেই 'দেশ' পত্রিকায় দিতে যাতে অনেক মানুষ পড়তে পাবেন, জানতে পারেন কলম ধরলে এই চলচ্চিত্রকার অনেক সাহিত্যিকের চেয়ে কিছু কম নন। দু'কাপ চা শেষ করে বেরুচ্ছি এক নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও থেকে। ট্যাক্সি ধরতে হবে গেটের বাইরে এসে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁকে আগেও দেখেছি আমি। ঘনিষ্ঠতা খুব একটা ছিল না। লম্বা ফর্সা সুখী-সুখী চেহারা। পোশাকে বেশ চাকচিক্য রয়েছে। নমস্কার করে বললেন 'আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'বলুন।' আমার জন্য টালিগঞ্জে কেউ দাঁড়িয়ে আছে শুনতে ভাল লাগল।

'একটু ক্যান্টিনে বসে কথা বলা যাবে? আপনার সময় আছে?' খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। আমি রাজী হলাম।

আমি চা নিলাম না, তিনি নিলেন। বললেন, 'আমার নাম সারথি মিত্র। একটু আন-কমন নাম। আমার পরিবার আপনার লেখার ভক্ত।'

মেজাজটায় চিড় ধরল। অনেক লোককেই এমন কথা বলতে শুনেছি। বিশেষ করে যাঁরা উঁচুপদে কাজ করেন। সভাসমিতি করতে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। সেখানে উঁচু পদের মানুষরা যেন কৃতার্থ করতেই এক গাল হেসে বলেন, আমার ওয়াইফ অথবা আমার মিসেস আপনার কথা খুব বলেন। প্রকারান্তরে জানিয়ে দেন, তিনি এক বর্ণ পড়েননি। সেটা ঢাক পিটিয়ে বলার কি দরকার!

সারথি মিত্র বললেন, 'আমি ছবির সঙ্গে যুক্ত।'

'আপনি ছবিতে কি করেন?'

'এ্যারেঞ্জমেন্ট। সবাইকে একত্রিত করে ছবিটাকে শেষ করিয়ে দিই। আমার হাতে একজন নতুন প্রযোজক আছেন। তিনি ভাল গল্প পেলে ছবি করতে পারেন। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে একটা ভাল ছবি হয়।'

'ভাল ছবি বলতে?'

'পয়সা পাবে আবার সমালোচকরা প্রশংসা করবে। লোকে বলে সোনার পাথরবাটি, আমি বলি তা কেন? সাউন্ড অফ মিউজিক হয়নি? মডার্ন টাইমস্

হয়নি ? আরে আমাদের বাংলাতেও বালিকা বধূ, ছুটি হয়েছে। গুপী গায়েন হয়েছে। আপনি যদি এইরকম একটা গল্প দেন তাহলে বাধিত হব।' সারথি মিত্র জানালেন।

'আমার পক্ষে এভাবে নির্বাচন করা সম্ভব নয়।'

'বুঝতে পেরেছি। লেখকের কাছে সব লেখাই একরকম! আচ্ছা, চা-বাগান নিয়ে জমজমাট কোন উপন্যাস নেই আপনার ? আপনি তো ওদিকের লোক!'

এরপরে তিনদিন ধরে সারথি মিত্র আমার সঙ্গ ধরলেন। এক একটি মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে। তিনি শুধু কথা বলেই আমাকে নরম করলেন। আমার প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' ছবি হয়েছিল। তারপরে যতগুলো গল্প বিক্রী হয়েছে ছবির জন্যে, তার কোনটাই সম্পূর্ণ করতে পারেনি প্রযোজক পরিচালকরা। ফলে কোন সাধারণ মানের পরিচালক গল্প কিনতে চাইলে আমি অসম্মতি জানাই। চলচ্চিত্র-শিল্পে এখনও সাধারণ মানের এক ক্যামেরাম্যান যে টাকা পান তার চেয়ে অনেক কম দেওয়া হয় কোন বিখ্যাত লেখককে তাঁর গল্পের জন্যে! আর সেই গল্পও যদি সম্পূর্ণ ছবি হয়ে প্রেক্ষাগৃহে না যায় তাহলে গল্প বিক্রী করে কি লাভ! কিন্তু সারথি মিত্র আমাকে টলালেন। সিনেমা লাইনের একটা প্রথা আছে। বেশীর ভাগ লোকেই আলাপের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বয়স নির্বিচারে তুমি বলতে আরম্ভ করে। সারথি মিত্রও আমাকে তুমি বলছেন এই আবার পরক্ষণেই আপনিতে চলে যাচ্ছেন।

চতুর্থ দিনে তিনি একটি যুবককে নিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি প্রতীক সেন। আমাদের ছবির প্রযোজক।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি করেন ?'

'ফিন্যান্স একাউনটেন্ট। আপনার গল্প উপন্যাস খুব পড়ি। ভক্ত বলতে পারেন। আপনি রাজী হয়েছেন শুনে ছুটে এলাম। একটা ভাল ছবি হোক আমি চাই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করে বসবেন না। বেশীর ভাগ ছবি আরম্ভ হয়ে ফিন্যান্সের অভাবে আটকে যায়।' আমাকে থামিয়ে দিয়ে সারথি মিত্র বললেন, 'ও নিয়ে তুমি ভেব না দাদা। প্রতীকের সলিড ফিন্যান্স আছে।'

'কত ?'

প্রতীক বলল, 'পাঁচ লক্ষ টাকা।'

বললাম, পাঁচ লক্ষে ছবি হবে ?'

সারথি হাসল, 'কত লোক দাদা পঞ্চাশ হাজার নিয়ে শুরু করছে। মিনিট দশেকের ছবি দেখিয়ে কাস্টিং শো করে ডিস্ট্রিবিউটারকে দেখালেই ছবির টাকা এসে যায়। হ্যাঁ, ছকটা করতে হবে মজবুত ভাবে। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

কৈশোরে যখন লেখালেখির কোন স্বপ্ন ছিল না তখন নাটক ছবি নিয়ে ভাবতাম। মাথায় সেই পোকাটা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল। আজ তার নিদ্রাভঙ্গ হল। খোঁজ নিয়ে

জানলাম, একটি রঙিন বাংলা ছবির বাজেট ছয় থেকে বাইশ লক্ষ টাকা। অনেক হিসেব করে মনে হল পাঁচ লক্ষে শেষ করতে পারব। তখন আর আমি লেখক, শুধু গল্প বিক্রী করেই আমার কাজ শেষ, এটা খেয়াল নেই। ছবিটা শেষ করতে যা যা দরকার তার সবটাতেই ওই পোকার কল্যাণে জড়িয়ে পড়েছি। মনের ভেতরে একটি জেদ ক্রমশ বড় হচ্ছে, আমি দেখিয়ে দিতে চাই পাঁচ লক্ষ টাকায় ছবি তৈরী করা সম্ভব। আর যত এইসব ভাবছি তত প্রতীক সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রতি সকালে বাড়িতে মিটিং হত। কে পরিচালক হবেন? প্রতীক বলল, 'দাদা আপনি এত বছর ধরে 'দেশ' পত্রিকার চিত্র সমালোচনা করছেন। ওঁদের সবাইয়ের কাজকর্ম আপনি জানেন। আপনিই ঠিক করে দিন কাউকে।'

সারথি মিত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কাকে পছন্দ?'

সারথি বললেন, 'দেখুন তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারকে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ওঁরা বাজেট শুনলেই রাজী হবেন না। হাতেও ছবি আছে ওঁদের। নিতে হবে কাজ জানা অথচ খুব ঝামেলা করবে না এমন একজনকে। যেমন নাড়ু মুখার্জী।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক আপত্তি করল, 'একি বলছেন সারথিদা। সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে মুভিটোনে গিয়েছিলাম। দেখলাম ময়লা জামা-কাপড় পরে নাড়ু মুখার্জী ভাঁড়ে করে বাংলা মদ খাচ্ছে।'

'তা হতে পারে কিন্তু কাজ জানে লোকটা।'

সারথি মিত্র এবং প্রতীক সেন আমার সামনে প্রথম দ্বিমত হল। শেষ পর্যন্ত প্রতীক আমার ওপর দায়িত্ব দিল পরিচালক ঠিক করতে। এ ব্যাপারে আমার একটু মুস্কিল ছিল। আমার পরিচিত যেসব পরিচালক আছেন তাঁরা কষ্টে-সৃষ্টে ছবি করেন। সেই ছবি প্যানোরোমায় যায়। কারো কারো ভাগ্যে পুরস্কার জোটে কিন্তু সবাই বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ পান। সেই বছরটা তাদের বিদেশ ঘুরতেই কেটে যায়। বিদেশে কার কি রকম বিক্রী হয় জানি না কিন্তু আমরা একদিন টেলিভিশনে ছবিটা দেখতে পাই। ওদের ছবি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয় না। যেসব ছবি বিদেশের গুণীদের প্রশংসা পায় তা নাকি টিকিট কেটে এদেশের দর্শকরা দেখতে চান না। এই নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় আমি কিছু লিখেছি। এঁদের অনেকেই সেটা পছন্দ করেননি। কিন্তু আমার সোজা কথা, বাংলা ভাষায় ছবি করে যদি বাঙালী দর্শকের মন জয় না করতে পার তাহলে ওই ছবি করাটাই এক ধরনের ভাঁওতাবাজি। সেদিনই তপেন্দু চ্যাটার্জি আমার কাছে এল। তপেন্দুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভাল। ওঁর প্রথম ছবি রিলিজ করেনি। দ্বিতীয় ছবি হেমন্তবাবুর গান নিয়ে দারুণ ব্যবসা করেছিল। তৃতীয় ছবি থেকে ও দিক বদল করল। পর পর দুটো ছবি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো শুরু হতে না হতে উঠে গেল। এখন তপেন্দুর ছবি টেলিভিশনে দেখতে হয়। ঘন ঘন বিদেশে যায়। আর সেই হিট ছবিটার কথা উঠলে শিউরে ওঠে, 'কি করে অমন বীভৎস

ছবিটা করলাম বলুন তো?' মনে করিয়ে দিই ছবিটা দর্শক নিয়েছিল। ও সেটা উড়িয়ে দেয়। আমি তপেন্দুকে বললাম প্রতীকের ছবির দায়িত্ব নিতে। সব শুনে-টুনে তপেন্দু বলল, 'তোমার গল্প বলেই রাজী হচ্ছি।' প্রতীক এবং সারথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। সারথি নিমরাজী হল। আড়ালে আমাকে বলল, 'ভয় হচ্ছে জলছবি না হয়ে যায়। এরা প্রযোজকের পয়সায় নিজের নাম প্রচার করতে চায়। তবে আপনি যখন বলছেন তখন। কিন্তু স্ক্রিপ্টটা শুনে নেবেন দাদা।'

চিত্রনাট্য লেখার আগে তপেন্দু লোকেশন দেখতে চাইল। যে অঞ্চলে শুটিং করবে সেই অঞ্চলটা ভালভাবে দেখে না এলে ছবির কাঠামো তৈরী করা মুস্কিল। সারথি মিত্র বোঝালেন এক্ষেত্রে আমার যাওয়া উচিত ওর সঙ্গে। জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চল উপন্যাসের পটভূমি। আর সেই অঞ্চল আমার ভাল জানা। প্রায় বাধ্য হয়েই রওনা হলাম। সারথিও সঙ্গে গেলেন। তপেন্দু এবং সারথির মধ্যে ক্রমশ ভাব হচ্ছে! লোকেশন দেখে ওরা মুগ্ধ। তপেন্দুকে একা পেতেই বলতাম ভাল ছবি তৈরীর কথা। যে ছবি শুধু আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্যে তৈরী হবে না, সমস্ত দর্শকের ভাল লাগা অর্জন করবে। তপেন্দুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাওয়া যেত। সে সব সময় প্রথাবিরোধী চিন্তা করত। বামপন্থী মানসিকতা প্রবল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পের জন্যে সত্যি কথা বলতে পারত।

কলকাতায় ফিরে সে চিত্রনাট্য লিখতে বসল। আমি বলেছিলাম ওটা সম্পূর্ণ না হলে শুনব না। কারো কাজের মাঝখানে বিরক্ত করা সমীচীন নয়। সারথি মিত্র দুদিন অন্তর তার কাছে যেতেন। একদিন সারথি এসে আমাকে জানাল ওই চিত্রনাট্য চলবে না। তপেন্দু নাকি আমার গল্প থেকে সরে আসছে। চলচ্চিত্র কোন উপন্যাসের কার্বনকপি নয়, এই সত্য বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হল আমাকেই। সারথি খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ইতিমধ্যে প্রেস কনফারেন্স করল তপেন্দু। সমস্ত কাগজে তার বিবরণ ছাপা হল। কে ক্যামেরাম্যান হবে, সম্ভাব্য অভিনেতা, অভিনেত্রী কারা এই সব। কিন্তু প্রেস কনফারেন্সের পরেই প্রতীক ও সারথি ছুটে এল আমার কাছে। সারথি বলল, 'দাদা বাঁচান, তপেন্দু ছবিটাকে ফ্লপ করিয়ে দেবেই।' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেকি! ফ্লপ করাবে মানে?'

প্রতীক চুপ করে আছে। সারথি বলে চলল, 'প্রেস কনফারেন্সে যে লীলা মজুমদারকে ডাকবে তা আগে একবারও বলেনি। বললে বাধা দিতাম।'

লীলা মজুমদার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো ছবিগুলোতে তিনি অভিনয় করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পরিচালকরা ওঁকে ছবিতে নেন। তাঁকে যদি তপেন্দু ছবিতে নেয় তাহলে কি অন্যায় করল। সারথি বুঝিয়ে দিল, 'লীলা মজুমদার আজ পর্যন্ত যে কটা ছবিতে কাজ করেছে প্রত্যেকটা চার সপ্তাহের বেশী চলেনি। ও থাকা মানে ইল্-লাক দাদা। বিদেশীদের জন্যে বাংলা ছবিতে

ওকে নেওয়া যেতে পারে, মানছি অভিনেত্রী ভাল, কিন্তু বাঙালী দর্শক নেয় না। শুধু নেয় না বলা ভুল হবে, ও ছবিতে থাকলে ডুবে যেতে বাধ্য।'

অত্যন্ত কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ বলে মনে হল সারথিকে। লীলার হয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলাম এই সময় প্রতীক বলল, 'দাদা। ওর নাম নায়িকা হিসেবে দেখে একজন ডিস্ট্রিবিউটার জানিয়ে দিয়েছে ছবি নেবে না।'

'কেন ? লীলা কি দোষ করল ?'

'লাইনে প্রমাণ হয়ে গেছে ও থাকলে ছবি চলে না।'

'ডিস্ট্রিবিউটার টাকা না দিক, তোমার নিজের টাকায় তো ছবি হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু ফার্স্ট প্রিন্ট হয়ে গেলে তো ডিস্ট্রিবিউটারের টাকায় অন্য প্রিন্ট হবে। ওরাই রিলিজ করবে। তাছাড়া আপনার বউমা আপত্তি করছে। ঘরের টাকায় এই ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে ?'

এরপর আর তর্ক করা চলেনা। তপেন্দুকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসলাম। প্রথমেই সারথি বলল, 'আপনার চিত্রনাট্যে কান্না নেই, হাসি নেই। আরে মশাই, এত বছর লাইনে করে খাচ্ছি, সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ছাড়া বাঙালী দর্শক ছবি দেখবে না।'

হঠাৎ তপেন্দু বলল, 'তাহলে আমাকে বাদ দিন।'

সারথি দুম করে বলে বসল, 'বাদ পড়তে চাইলে কিছু করার নেই।'

দেখলাম লীলার কথা উঠছেই না। চিত্রনাট্য নিয়েই তর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আমি চিত্রনাট্য পড়িনি। একবার পড়ে দেখি তারপর এ নিয়ে কথা বলা যাবে।'

তপেন্দু কোন কথাই শুনতে চায়না। বলল, 'কার সঙ্গে ছবি করব সমরেশ ? এই সব অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে ? এরা ছবির কিছু বোঝে ? চরিত্রহীন কিছু ছবি তৈরী করিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে। না, না। তুমি আমাকে এদের সঙ্গে কাজ করতে বলো না। ছবি করা একটা সৃষ্টি। এভাবে হয় না।'

তপেন্দু ছবি ছেড়ে দিল। প্রতীক পর পর কয়েকদিন এল, 'কি করা যায় দাদা ?' বললাম, 'থাক। ছবি করে কোন দরকার নেই।'

'কি বলছেন দাদা ? আমি হেরে যাব ? আপনার সম্মান নষ্ট হবে ?'

'আমার সম্মান ?' আমি অবাক।

'হ্যাঁ। লাইনের সবাই জেনে গেছে ছবির পেছনে আপনি।'

সেদিন সারথিও ছিল সঙ্গে। গম্ভীর গলায় বলল, 'না, হেরে যাব না দাদা। আমি একটা প্রস্তাব করছি। আপনার বন্ধু কিঙ্কর ভট্টাচার্যকে পরিচালনার দায়িত্ব দিন।'

'হঠাৎ এই নামটা বললেন কেন ?'

'কিঙ্করবাবুর দুটো ছবি খুব ভাল হয়েছিল। কিন্তু তখনও ওঁর গায়ে আঁতেল

আঁতেল গন্ধ ছিল। ছবি ভাল হলেও তেমন পয়সা পায়নি বলে পাঁচ বছর চুপচাপ বসে আছেন উনি। পকেটে মাল না থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। এখন আপনি বললে উনি কৃতার্থ হয়ে ভাল ছবি তৈরী করতে চাইবেন।'

'সারথিবাবু, কারো দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এক্সপ্লয়েট করা আমার ধাতে নেই।'

'আচ্ছা, ওভাবে ভাবছেন কেন ? উনিও আপনার বন্ধু। আর সত্যি বলতে কি তপেন্দুবাবুর চেয়ে ওঁর ওপর বেশী ভরসা করা যায়।' সারথি জানাল। প্রতীকও দেখলাম একমত। ভেতরে-ভেতরে ছবিটা হল না বলে খারাপ লাগা বোধটা বেশী তীব্র হচ্ছিল। অতএব সারথি যখন কিঙ্করকে ডেকে আনল তখন রাজী হয়ে গেলাম। কিঙ্করের পড়াশোনা আছে। আমার লেখা একদা নিয়মিত পড়ত। বলল, 'সমরেশ আছে যখন তখন নিশ্চিন্তে ছবি করতে পারি। প্রতীকের কাছ থেকে এ্যাডভান্স নিস যেন।'

চিত্রনাট্য লিখছে সে আর সেই সঙ্গে চলছে শিল্পী নির্বাচন। নায়কেরই প্রাধান্য ছবিতে। অনেক ভেবেচিন্তে কিঙ্কর রবীন মল্লিকের নাম প্রস্তাব করল। শুনে প্রতীক খুব খুশী। কারণ মাস খানেক আগে রবীনের একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে যা চিরকালের বক্স-অফিস রেকর্ড করতে যাচ্ছে। সারথি মাথা নাড়ল, 'রবীন মল্লিকের ডেট পাওয়া যাবে না। আর শুনছি এখন যে আটটা ছবিতে সাইন করেছে তাতে আশি হাজার করে নিচ্ছে। অত টাকা দিলে আর পাঁচ লাখে ছবি শেষ হবে না।'

রবীন মল্লিকের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ ছিল। খুব অমায়িক মানুষ বলে মনে হয়েছিল। প্রতীক চাইল আমি যেন ওর সঙ্গে কথা বলি। মন ঠিক করার আগেই সারথি আগ বাড়িয়ে সময় ঠিক করে এল, 'ও দাদা, আপনার নাম শুনে রবীন মল্লিক বললেন, নিশ্চয়ই, ওঁর যেদিন সময় হবে সেদিন দেখা করব। অত বড় নামকরা হিরো আপনাকে খুব রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলল। তা আমি আজ সন্ধ্যের পরেই আপনাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

বললাম, 'যাওয়া উচিত কিঙ্কর আর প্রতীকের, তাই না ?'

সারথি হাসল, 'ওরা গেলে রবীন মল্লিক পাত্তা দিত বলে ভেবেছেন ?

রবীনবাবু আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন। চরিত্রটি শোনার পর আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশবাবু, এই ছবির পেছনে আপনার ইন্টারেস্ট কিছু আছে ?'

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই সারথি বলল, 'উনিই তো সব। যেমন বলছেন তেমন করছি।'

রবীন মল্লিক হাসলেন, 'ওঁর লেখা আমার ভালো লাগে। কবে শুটিং, একটু আগে জানিয়ে দেবেন। এখন তো মাঝে মাঝে ডাবল শিফ্‌টে কাজ করতে হচ্ছে।'

সারথি করিৎকর্মা মানুষ। রবীনবাবুর ডায়েরী দেখে ছাঁটকাট করে টানা পঁচিশ দিন নিয়ে নিল, 'দাদা বলেছেন পঁচিশ দিনেই শুটিং কমপ্লিট হয়ে যাবে। আপনাকেও

বারংবার যেতে হবে না নর্থ বেঙ্গলে। পুরো ছবি দাদা আউটডোরেই করতে চান।'

আমি কখনও সারথিকে এসব কথা বলিনি। তবে কিঙ্করের সঙ্গে আলোচনার সময় এমন ভাবনা ভাবা হয়েছিলো। সারথি এল এবার টাকা পয়সার কথায়। রবীনবাবু কিছুতেই কোন অঙ্ক বলবেন না। হেসে বললেন, 'উনি উদ্যোগ নিয়েছেন, যা বলবেন তাই নেব।'

হঠাৎ সারথি বলে বসল, 'বারো হাজারের বেশী দিতে পারব না মিস্টার মল্লিক। দাদা পুরো ছবির বাজেট করেছেন পাঁচ লক্ষ। বুঝতেই পারছেন।'

রবীনবাবু মাথা নেড়ে বলনে, 'আমি তো কোন কথাই বলিনি। যা দেবেন তাই নেব।'

কিঙ্কর অন্যান্য চরিত্র ঠিক করে ফেলল। বেশীর ভাগই চলচ্চিত্রের মানুষ, কেউ কেউ গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করছেন। ঠিক এই সময়ে সিনেমা শিল্পের তদারকি সংস্থা থেকে প্রতীককে জানানো হল, এই ছবির পূর্বতন পরিচালক তপেন্দু চট্টোপাধ্যায় যে ক্যামেরাম্যান নিয়োগ করেছিলেন, তিনি জানতে চান কেন তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানো হল এবং সেই কারণে ক্ষীতপূরণ দিতে হবে তাঁকে। ছবিটি করবেন বলে তিনি নাকি অনেক কাজের সুযোগ ছেড়ে দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যাপারটা ফয়সালা না করে ছবি শুরু করা যাবে না।

প্রায় বাজ পড়ল প্রতীকের ওপর। শুটিংয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। সমস্ত শিল্পীরা সময় দিয়েছেন। কিঙ্করের ক্যামেরাম্যান বেশ নাম করা। শুনলাম তাঁকেও শাসানো হচ্ছে। প্রতীক তপেন্দুর কাছে গেল। তপেন্দু তাঁর এই ক্যামেরাম্যানের ব্যবহারে বিরক্ত প্রকাশ করল। কোনোরকমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছাড়া শুধুমাত্র তপেন্দুর করা কনফারেন্সের ভিত্তিতে ওই অভিযোগ আনা হয়েছে। গিল্ডের নেতারা শেষ পর্যন্ত উপদেশ দিলেন এই ক্যামেরাম্যানকে একটা মোটা পারিশ্রমিক হিসেবে মিটিয়ে দিতে। কোন কাজ না করে কোনরকম মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রযোজকের পক্ষ থেকে না পেয়েও পরিচালক তাঁকে কথা দিয়েছিলেন এটুকু সম্বল করে একজন অভিযোগ আনল আর গিল্ড সেটা মেনে নিলেন। তপেন্দু নিজে উদারতা দেখিয়ে জানাল যদি কোন পরিচালক কাউকে কাজ দেবেন বলে কথা দেন তবে পরিচালক বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাও বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু যুক্তি তর্ক শোনার জন্যে গিল্ড যে তারিখটা দিল সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে প্রতীকের পক্ষে আর এ ছবির শুটিং কয়েক মাসের মধ্যে করা সম্ভব নয়। নায়ক রবীন মল্লিক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

এ ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় ছিল না। সিনেমা শিল্পের ভেতরের ব্যাপার সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারি না। খারাপ লাগছিল কম টাকায় একটা গোছানো ছবি করতে চেয়েছিলাম, তাতে বাধা পড়ল। প্রতীক কিন্তু মরীয়া। ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। সারথি মিত্র তাকে নিয়ে আমার কাছে এল,

'দাদা, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। আপনার এই উপন্যাসটির পটভূমি নিয়ে আর কোন লেখা লিখেছেন?'

'হ্যাঁ। অনেককাল আগে একটি ছোটগল্প লিখেছিলাম প্রসাদে।' সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সারথি, 'মার দিয়া। আর কে আটকায়!' দেখলাম প্রতীকও খুব খুশী। জানলাম, ওরা বর্তমান ছবিটি আর করছে না এই ভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুক্তি আর কার্যকরী হবে না। এবার আমার ওই ছোটগল্পের নামে নতুন করে রেজিস্ট্রি করে যেমন চলছিল তেমনি ভাবে শুটিং শুরু করবে। মাঝখান থেকে ছবির নাম পাল্টালো আর প্রতীকের বদলে প্রতীকের স্ত্রী প্রযোজিকা হল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই ছোটগল্প একই পটভূমিকায় বটে কিন্তু গল্প তো আলাদা। শুধু চা-বাগান কমন।'

ওরা জানাল, চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে গল্প বাড়াতে হয় এই যুক্তি দেখালেই হবে। আর যেহেতু উপন্যাসের সঙ্গে আমার গল্পও ব্যবহার করা হচ্ছে তাই দক্ষিণা দেবার সময় ওটাও খেয়াল রাখবে।

আমার গল্প ছবি হতে চলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনরকম টাকা পয়সার কথা ওরা বলেনি। যাওয়া-আসা নিত্য হওয়ায় এবং সব ব্যাপারে আমার মতামত চাওয়ায় আমি নিজের কথাই বলতে সংকোচ বোধ করছিলাম। আজ সুযোগ পাওয়াতে প্রসঙ্গটি তুললাম আমি। প্রতীক বলল, 'ছবি তো আপনারই। যা বলবেন তাই দেব।' সংকোচ আরও বাড়ল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ওঁরা আমাকে ছয় হাজার টাকা দেবেন। এই টাকা আমার বদান্যতায় আমি নিচ্ছি। আমার গল্প আরও অনেক বেশী টাকায় বিক্রী হয় কিন্তু যেহেতু ছবিটি কম টাকায় শেষ হোক আমি চাই, তাই.......। সারথি কথাগুলো আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। শুটিং শেষ হলেই ওরা আমাকে টাকা দিয়ে দেবে।

উত্তরবঙ্গে যাত্রার দিন এসে গেল। দুটি নারী চরিত্রাভিনেত্রী সুনির্বাচিতা। প্রমা চ্যাটার্জী ছবিতে বেশী অভিনয় করেনি কিন্তু পরিচালক কিঙ্কর বিশেষভাবে ওর কথা ভেবেছে। কারণ প্রমার মুখে চোখে এক ধরনের বিষণ্ণতা মাখানো। নায়িকার চরিত্র সেইরকমই। তার পরিচারিকা হিসেবে স্বাস্থ্যবতী অভিনেত্রী যাচ্ছেন যাঁর ভূমিকা ছবিতে অন্যরকম। বিনতা নাকি নাচেনও ভাল যদিও এই ছবিতে নাচের কোন সুযোগ নেই।

সারথি পুরো পরিকল্পনা করল। দলটা যাবে দু-ভাগে। সকালের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে চাটার্ড বাসে চেপে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরের চা-বাগানে পৌঁছাবে নায়ক রবীন মল্লিক সহ অধিকাংশ। যাদের পরে শুটিং আছে তারা দিন আটেক বাদে ট্রেনে যাবে।

দল যেদিন যাবে তার আগের সন্ধ্যায় আমরা এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে রওনা

হলাম। সারারাত জার্নি করে দুপুরের আগেই চা-বাগানে পৌঁছে যাব। দল যখন পৌঁছাবে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রাখবে সারথি। আমি আর কিঙ্কর শেষবার চিত্রনাট্য নিয়ে বসব। এতদিনে অনেক বলা সত্ত্বেও কিঙ্কর চিত্রনাট্য পড়ে ওঠার সময় পায় নি। আর অবাক কাণ্ড, এবারে সারথি কিঙ্করকে চিত্রনাট্য নিয়ে তাড়া দেয়নি যেটা তপেন্দুর বেলায় করেছিল। হয়তো এত রকমের ঝামেলা একসঙ্গে এসেছিল যে ও সময় পায়নি। আমি যাচ্ছি অথবা আমাকে যেতে হচ্ছে এই কারণে যে, আমারই এক বন্ধুর চা-বাগানে শুটিং হবে, তাঁর বাংলোতেই সবাই থাকবে। অতএব আমার উপস্থিতি ছাড়া সে অনুমতি দেবে না। কোন শুটিং পার্টির সঙ্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এর আগে আমার ছিল না। ফলে উৎসাহিত হলাম। যাওয়ার দিন সকাল থেকে প্রতীকের পাত্তা পাই নি। কয়েকটা প্রয়োজনে সে টেলিফোন করবে কথা ছিল, তাও করে নি। এসপ্ল্যানেডের বাসস্ট্যান্ডে আমরা ওর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাসে উঠলাম। সারথি জানাল প্রতীকের স্ত্রীর নাকি শরীর খারাপ ছিল।

আমাদের তিনটে সিট পাশাপাশি। ভাবলাম প্রতীক নিশ্চয়ই কালকের ট্রেনে দলের সঙ্গে আসবে। মাঝরাত্রে মালদায় বাস থামলে যখন চায়ের জন্যে হাঁটছি, তখন সারথি আমাকে একপাশে ডেকে বলল, 'দাদা, আপনাকে বলা দরকার, আমার কাছে মাত্র দু'-হাজার টাকা আছে। প্রতীক আজ টাকা জোগাড় করতে পারেনি।'

প্রথমে কথাটা বুঝতেই পারলাম না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সারথি বলল, 'মানে প্রতীক ক্যাশ হাতে পায়নি। সারাদিন ঘুরেছে। যে ভদ্রলোক ওকে টাকা দেবেন বলেছিলেন, তিনি গতকালই হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন। এখন আপনি ভরসা।'

'আমি ভরসা মানে?' হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'প্রতীক নিশ্চয়ই আজ রাত্রে কিছু ব্যবস্থা করবে। নাহলে দু-একদিনের মধ্যে টাকা নিয়ে স্পটে চলে আসবে। আপনি যদি একটু ম্যানেজ করে নেন।'

'আমি কিভাবে ম্যানেজ করব? আপনার তো সাহস কম নয়? চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের দল নিয়ে এতদূরে যাচ্ছেন আর পকেটে মাত্র দু-হাজার টাকা?'

'আপনি ঘাবড়াবেন না দাদা। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

কিন্তু চোখের সামনে সর্বনাশ দেখতে পেলাম আমি। পঞ্চাশজন লোক খুব কম করে খেলেও একদিন দু-হাজার টাকা খরচ। তার পরের দিন ওরা কি খাবে? শুটিংয়ের জন্যে ভাড়া গাড়ির তেলের দাম দিতে হবে। আর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যে বাস ওদের চা বাগানে নিয়ে যাবে তার ভাড়াই তো হাজার টাকা। কোন কথা না বলে ছুটলাম টেলিফোন করতে। এখন রাত দেড়টা। কলকাতার কাউকে টেলিফোন করে বলব কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় হাওড়া স্টেশনে গিয়ে শুটিংয়ের দলটাকে জানাতে যে রওনা হতে হবে না। শুটিং বাতিল।

কিন্তু জানাশোনা না থাকলে মালদার বাসস্ট্যান্ড থেকে টেলিফোন বিশেষ করে কলকাতার ফোন পাওয়া অত রাত্রে ঈশ্বর পাওয়ার সামিল। কোথাও সেই সুযোগ না পেয়ে ফিরে এসে দেখলাম, বাস ছাড়ব ছাড়ব করছে। মালদায় পড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই।

বাসে উঠে সারথিকে যা মুখে এল বলে গেলাম। সে চুপ করে রইল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে বাস এগিয়ে চলেছে শিলিগুড়ির দিকে। কিঙ্কর বসে আছে গম্ভীর মুখে। একটু বাদেই সারথির নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম। এই অবস্থাতেও লোকটা কিভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে? কিঙ্কর হঠাৎ বলল, 'খোঁজখবর না নিয়ে তুমি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে?'

'কি করে বুঝব? কেউ যদি বলে পাচ লাখ টাকা রেডি আছে, তাহলে তাকে কি বলতে পারি টাকাটা গুনে দেখান! এখন কি হবে বল তো! ওখানে তো কেউ তোমাদের চিনবে না। এতগুলো লোক না খেয়ে পড়ে আছে, জানলে আমারই বদনাম হবে। এদের যে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ফিরিয়ে দেব সেই গাড়িভাড়াও ওর কাছে নেই। মুস্কিল হল রবীন মল্লিকও আসছে কালকের ট্রেনে। সঙ্গে ওঁর স্ত্রীও আছেন।'

'সারথির বাহিনীরা অবশ্য এই বাসেই আছে।'

'বাহিনী মানে?'

'তুমি দ্যাখোনি, পেছনের সীটে ওর ছেলে, মহিলা সেক্রেটারী, চাকর যাচ্ছে। তারা নাকি বাজার হাট করতে সাহায্য করবে।' কিঙ্কর জানাল।

ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে খুন করি। এইরকম নিশ্চিন্ত সর্বনাশের মধ্যে কেউ তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যায় কি করে?

শিলিগুড়িতে বাস থেকে নেমে সারথির বাহিনীকে দেখলাম। ছেলেটির বয়স বছর বাইশেক। বেশ শান্তশিষ্ট মনে হল। মহিলা তিরিশের মধ্যে। সারথিকে বললেন, 'মার্কেটিং শিলিগুড়ি থেকেই করব না কাছাকাছি বাজার আছে?'

সারথি বলল, 'কাছেই বাজার আছে, কোন চিন্তা নেই।'

'রাত্রের ওষুধটা খেয়েছেন?'

সারথি মাথা নাড়ল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এঁরা আমাদের সঙ্গে আসছেন, তা তো বলেননি।'

সারথি বলল, 'না ভাবলাম, সঙ্গে এলে সবার সুবিধে হবে। বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। খুব ভাল মেয়ে। খুব তেজী। আর বিন্দু, ইনি হলেন দাদা।'

বিন্দু বললেন, 'আপনাকে আমি খুব বুড়ো বলে ভাবতাম।'

চল্লিশে পা দিলেও এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে বুড়ো বলেনি। অন্য সময় হলে রসিকতা করতাম এখন সেই মন ছিল না। বস্তুত আমরা কেন যাচ্ছি তাই বুঝতে পারছি না।

একটা জীপ ভাড়া করে আমরা চাঁদপুর টি-এস্টেটে পৌঁছালাম দুপুর নাগাদ। আমার বন্ধুর নির্দেশে মিস্টার মিত্র, বাগানের ম্যানেজার, সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। শুধু এই বাগানের বাংলোতে কুলোবে না বলে তিনি পাশের বাগানের বাংলোতেও ব্যবস্থা করেছেন। আমায় বললেন, 'সমরেশবাবু, একটা অনুরোধ, রবীন মল্লিক সস্ত্রীক যদি আমার বাংলোতে থাকেন তাহলে আমি ও আমার স্ত্রী খুব খুশী হব।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অন্তত রবীন মল্লিকের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি থাকবে না। মিত্র আরও জানালেন যে আজকের দিনটা বাগানের অতিথি আমরা। অতএব আজকে তিনিই আমাদের খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের বলতে এই ক'জনের দুপুরের খাওয়া নয়, রাত্রে যাঁরা ট্রেনে আসবেন তাঁদেরও। সারথি দেখলাম ইশারা করছে আমাকে রাজী হয়ে যেতে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে সোফায় বসে সারথি বলল, 'তুমি না থাকলে দাদা শুটিং হতো না।'

আবার আমি আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেলাম। চাটুকারিতার সময় তুমি বললে সম্পর্কটা বোধহয় কাছাকাছি করা যায়! কিঙ্করের মেজাজ খারাপ ছিল। এই বাংলোর ওপরে সাতখানা ঘর। তার সবচেয়ে সেরাটা সারথি এবং তার বাহিনী দখল করে নিয়েছে। আমি আর কিঙ্কর যে ঘরে জিনিসপত্র রেখেছি, খারাপ নয়, কিন্তু তার বক্তব্য সারথি একবার অফার করতে পারত। সারথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ না হয় হল। জীপের ভাড়া বাসের ভাড়া মিটিয়ে আপনার হাতে যা থাকবে, তাতে আগামীকালের দুপরের খাওয়াটা হলেও হয়ে যেতে পারে। তারপর ?'

পা দুলিয়ে সারথি বলল, 'আমার মনে হয় প্রতীক আজ সকালে টাকা নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ও এলে কোন চিন্তা নেই।'

যখন কোন বিকল্প ভাবনা ভাবা যায় না তখন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত আশাবাদী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ওদের চায়ের বাগানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা আগেই করা ছিল।

ঠিক ন'টা নাগাদ সমস্ত দলটা এসে গেল। অতটা রাস্তা গাড়ি দিয়ে এসেও এই জঙ্গলে ঘেরা চা-বাগানের রাতে ওরা বেশ রোমাঞ্চিত বলে মনে হচ্ছিল। রবীন মল্লিক সস্ত্রীক চলে গেলেন ম্যানেজারের বাংলোয়। প্রমা ও বিনতাকে একঘরে রেখে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু মানুষকে পাশের বাগানে পাঠিয়ে দেওয়া হল রাত্রিবাসের জন্যে। এবং তারপর আমি মুখোমুখি হলাম সারথি মিত্রের। বাসে প্রতীক আসেনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে স্টেশনেও এদের বিদায় জানাতে আসেনি।

সারথি তখন তার ঘরে পাশ ফিরে শুয়ে, বিন্দু সারথির হাঁটুতে হেলান দিয়ে হিসেব লিখছে এবং সারথির ছেলে একটা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ছে খানিকটা

দূরে। যখন অন্যান্য ঘরে সবাই ঠাসাঠাসি করে রয়েছে তখন এরা কাটাচ্ছে বেশ আরামেই। একটু আগে দেখেছি আমাদের ঘরেও ক্যামেরাম্যান ও এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর জিনিসপত্র রেখেছে। এটা এমন একটা জায়গা যার একশো কিলোমিটারের মধ্যেও কোন মাঝারি হোটেল নেই।

সারথি আমাকে দেখা মাত্র উঠে বসল, 'আরে এসো, এসো দাদা।'

'আপনি এখানে বসে, ওদের সব কিছু দেখিয়ে দিতে হবে না ?'

'ওসব তুমি চিন্তা করো না। বিন্দু সবাইকে বলে দিয়েছে কি করতে হবে।'

'সারথিবাবু, প্রতীক তো এলো না। এবার ?'

'সেইটেই তোমাকে বলব ভাবছিলাম। আমার কাছে যা আছে তাতে কাল দুপুরটা হয়ে যাবে। রাত্রেই হবে প্রব্লেম। তুমি দু'চারদিন চালিয়ে দিতে পারবে না ? আমি নিশ্চিত যে এর মধ্যে প্রতীক টাকা পেয়ে যাবে দাদা।'

আমি কিছু বলার আগে বিন্দু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'দিন না কদিন চালিয়ে। এটা তো আপনারই এরিয়া। এত লোক যদি না খেয়ে থাকে, কলকাতায় ফিরতে না পারে তাহলে আপনার ভাল লাগবে ? এত বড় লেখক আপনি, পাঁচজনের কাছে সম্মান নেই আপনার ?'

একটাও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে এলাম। আমার ব্যাগে মাত্র হাজার টাকা রয়েছে। কিঙ্কর বসেছিল কাগজপত্র নিয়ে। ওকে সব বললাম। শোনা মাত্র মুখ শুকিয়ে গেল ওর। তারপর বলল, 'আর কাউকে বলো না, সমরেশ। ইউনিটের মনোবল একদম ভেঙে যাবে। দাঁড়াও, সারথিকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

সারথি এল আমার ঘরে। কিঙ্কর তাকে দেখা মাত্র বলল, 'কি ব্যাপার, সারথিবাবু ? এটা আপনার কোন খেলা ?'

'কি যে বলেন। আমি মরে যাচ্ছি দাদার কাছে লজ্জায়। প্রতীকটা।'

'প্রতীকবাবু তো আপনারই লোক ?'

'হ্যাঁ। আসলে হয়েছিল কি, ওকে সম্মানিতা ইনভেস্টমেন্টের পারু চ্যাটার্জী কথা দিয়েছিল পাঁচ লাখ টাকা দেবে ছবি করার জন্যে। একেবারে ফাইনাল। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে পারুবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে প্রতীক টাকাটা পাচ্ছে না। সব ঠিক ছিল, জানেন!

'টাকা হাতে না নিয়ে রওনা হলেন কেন ?'

'কি করব ? সব বুক্‌ড হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া পারুবাবু প্রতীককে খবর দিয়েছিল, ও রওনা হবার আগে পুরো টাকা পৌঁছে দেবে। তবে এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। দাদা যদি দু'চারদিন চালিয়ে দেন তাহলে প্রতীক টাকা না পাঠালে গিয়ে টাকা নিয়ে আসব।' সারথি হাসল।

কিঙ্কর বলল, 'কথা দিচ্ছেন।'

চোখ বন্ধ করে গরুর মত মাথা নাড়ল সারথি। সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কর আমার হাতে

হাত রাখল, 'সমরেশ, এ যাত্রা বাঁচাও। একটা ভাল ছবির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে না হলে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর নিচে হৈ-চৈ শুরু হল। বাংলোর নীচের ঘরে সাধারণ কর্মীরা আছেন। চা-বাগানে দিশি মদের অভাব নেই। ইতিমধ্যেই তা সংগ্রহ ও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ডেকে কিঙ্কর ধমকালো। বলল, 'কাল সকালে শুটিং। এখন বসাইকে ঘুমিয়ে পড়তে বল।' রাত আরও নিশুতি হল। চিন্তায় আমার ঘুম আসছে না। চারদিন চালাতে বলছে এরা। অন্তত হাজার দশেক টাকা দরকার। যে দুটো গাড়ি শুটিং-এর জন্যে ভাড়া করা হয়েছে তেল ছাড়া তারাও অচল। এই টাকা আমি কোথায় পাব। স্কুল জীবনের পর জলপাইগুড়িতে আমার আসা-যাওয়া অনিয়মিত। তাও সেই শহর এখান থেকে আড়াই ঘণ্টার পথ। সেখানে গিয়ে আমি কার কাছে টাকা ধার চাইব? দু' তিনজন বাল্যবন্ধুর মুখ মনে পড়ল। টাকা চাইলে তারা কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা কে জানে? হঠাৎ কিঙ্করের গলা পেলাম, 'সমরেশ, ঘুমাওনি?'

'না।'

'ভালই হয়েছে।' বিছানা থেকে উঠে সে আলো জ্বালাল। তারপর কাগজপত্র নিয়ে আমার সামনে এসে বলল, 'কালকে যে শুটিং করব তার দৃশ্যটা আমার মাথায় আছে কিন্তু ডায়লগটা ঠিক.....তুমি লিখে দাওনা প্লিজ?'

চমকে উঠলাম। রাত পোয়ালে যে শুটিং হবে তার চিত্রনাট্য লেখা হয়নি, শর্ট ডিভিশন তো দূরের কথা। পাতা উল্টে উল্টে দেখলাম কিঙ্কর শুধু দৃশ্যের সারাংশ লিখে রেখেছে। কোথাও কোন সংলাপ নেই। মুখ তুলতেই সে বলল, 'না মানে, ভাবলাম, তুমি তো সঙ্গে থাকছ, তোমার সঙ্গে কনসাল্ট করে সংলাপ লিখব। প্লিজ লিখে দাও।'

তখন রাত দুটো।

বাইশ দিন পরে যখন ছবির শুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলাম তখন আমার ব্যক্তিগত ঋণ পঁচিশ হাজার। প্রতীক মাঝে মাঝে টাকা পাঠিয়েছিল। ম্যাড্রাজ থেকে প্রিণ্ট যখন এল তখন দেখা গেল অর্ধেক ছবি ঝাপসা। ছবি আর হয়নি, টাকাও ফেরত পাইনি। কিন্তু যার হাত দিয়ে টাকা, ওই টাকাও, খরচ হয়েছিল, সেই সারথি মিত্র আবার পরের ছবির জন্যে প্রোডিউসার পেয়ে কাজ শুরু করেছেন।

দুই

বাল্যকালে আমরা জানতাম মদ খেলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমাদের চেনাজানা চৌহদ্দিতে খুব কম মানুষ মদ্যপান করতেন। একবার, মনে আছে কোন একটা বিয়ে বাড়িতে রব রটেছিল বরযাত্রীদের মধ্যে দু'তিনজন নাকি মদ খেয়ে

এসেছে। শোনা মাত্র আমরা ছুটে গিয়েছিলাম তাদের দেখতে। বলা বাহুল্য, খুব হতাশ হয়েছিলাম সাধারণ মানুষ ও মদ্যপের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করতে পারিনি। আমার ছেলেবেলা কেটেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। সেখানে মদের দোকান কোন অঞ্চলে ছিল, তা জানি। তবে সেই দোকানদারের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল বলে মনে হয় না।

কলকাতায় যখন পড়তে এলাম তখনও কিন্তু মদ খাওয়ার ব্যাপারে একটা রাখা-ঢাকা ব্যাপার ছিল। বাংলা সিনেমার দৌলতে, সেই দেবদাসের আমল থেকে মদ্যপ মানে ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় উড়নি পাকানো, ঢুলুঢুলু চোখ, টলমলে পা— এরকম ছবি ভেসে উঠত। পরবর্তীকালে শার্টপ্যান্ট এল এবং সেই সঙ্গে জড়ানো কথা, দু'মিনিটের চেতনালুপ্তি। এই ছবির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল ছিল না। আমাদের হোস্টেলের পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক নিয়মিত মদ খেয়ে ফিরতেন।

আমরা জানতে পারতাম কারণ তিনি বাড়িতে ফিরলেই বউকে ধরে পেটাতেন। ভদ্রমহিলার কান্না কানে আসত সেই সঙ্গে আর্তনাদ। তখন রক্ত গরম। এক সকালে কয়েকজন ছাত্র গিয়ে লোকটাকে ধরলাম। বাজারে যাচ্ছিল ময়লা ব্যাগ হাতে নিয়ে। রোগা মধ্যবয়সের মানুষ।

হেসে বললেন, 'আমি আপনাদের পয়সায় মদ্যপান করি না।' কথাগুলো আমাদের জোরদার করল, 'কিন্তু আপনি এমন কিছু করতে পারেন না, যাতে পাড়ার শান্তি নষ্ট হয়। আপনার স্ত্রী কেন আর্তনাদ করেন ?'

কিছুক্ষণ তর্ক চলার পর ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ, এক কাজ করুন। আপনাদের দুজন রাত দশটার সময় এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমার পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকে দেখবেন কি হয়! আমি মুখে বললে তো বিশ্বাস করবেন না।'

সেদিন অনেক জল্পনা করেছিলাম। আর যাই হোক, আমাদের সামনে লোকটা নিশ্চয়ই বউকে মারবে না। তাহলে গিয়ে কি হবে! তবু গিয়েছিলাম। লোকটা এল সাড়ে দশটা নাগাদ। শার্টপ্যান্ট-পরা কেরানির চেহারা। হাতে টিফিন নিয়ে যাওয়া ব্যাগ। আমাদের দেখে ফিসফিস করে বললেন, 'একটু ব্যবধান রেখে ঢুকবেন।' বেশ ভুর ভুর করছে মদের গন্ধ। কিন্তু পা টলছে বলে মনে হল না। জিভ ঈষৎ জড়ানো। সরু গলিটায় ঢুকে কড়া ধরে নাড়লেন তিনি। আমরা দশ হাত দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটা ঝি গোছের মেয়ে দরজা খুলে চাপা গলায় বলল, 'বউদি, দাদাবাবু এসেছেন।' বলেই সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। ভদ্রলোক বাঁ হাতের ইশারায় আমাদের আসতে বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। পুরনো দিনের বাড়ি। অন্ধকার অন্ধকার। সিঁড়িতে আলোর ব্যবস্থা নেই। লোকটা দোতলায় ওঠা মাত্র সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম একটি নারীকণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল, 'ও মা গো, মরে গেলাম গো। মেরে ফেলল গো।' সেইসঙ্গে কান্না। আমরা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছি। পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালেন। চিৎকার ভেসে আসছে সামনের ঘর থেকে।

এত অবাক কখনও হইনি। মারপিট দূরের কথা তখনও ভদ্রমহিলার দর্শন পাননি তাঁর স্বামী। সমানে কান্না আর চিৎকার চলছে। ধীরে ধীরে আমরা ওপরে উঠে এলাম। যে ঘরে আলো জ্বলছে সেখানে উঁকি মেরে দেখলাম, এক মধ্যবয়সী মহিলা খাটে বসে ওই কাণ্ডটি করে চলেছেন।

হঠাৎ লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'রমা। অনেক হয়েছে, এবার থামো।'

রমা তাতে সাড়া না দিয়ে গলা বাড়াল। লোকটা বলল, 'রমা, এঁরা তোমার কাণ্ড দেখতে এসেছেন। পাশের হোস্টেলে সব থাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন রমা। এক মুহূর্ত আমাদের দেখলেন। তারপর নেমে এলেন খাট থেকে, 'ও! তাই বুঝি? আজ ঢাক নিয়ে আসা হয়েছে? আমার বদনাম দেবে? বেশ করি আমি কাঁদি, চিৎকার করি। তুমি রোজ মদ গেলো না?'

'গিলি। কিন্তু তোমার গায়ে কখনও হাত তুলেছি?'

'আমি চেঁচাই বলে তুলতে সাহস পাও না। না চেঁচালে মাতলামো করতে।'

আমরা আর দাঁড়াইনি। বলা বাহুল্য, পরের দিন থেকে চিৎকার কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হাতিবাগানের ফুটপাতে তখন মদ খেয়ে যারা পড়ে থাকতো, তাদের চেহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছিল না। ইংরেজি সিনেমায় নায়ক নায়িকা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারত। 'প্রসাদে'র পাঠক-পাঠিকারা মনে করতে পারবেন এমন একটা ইংরেজি ছবির কথা, যেখানে কোন চরিত্র মদ খেয়ে মাতলামি করে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে? এক-আধটা হাসির ছবি হয়তো হয়েছে কিন্তু ওরা কোন চরিত্রের এমন আচরণ ভাবতেই পারে না। আমাদের দেশে জমিদার নব্যবাবু এবং বিত্তহীন সম্প্রদায় মদ খাবে এবং মাতলামি করবে এমন ধারণা পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত চালু ছিল। অর্থাৎ যারা মদ খান, তারা খাওয়া শেষ করেন ততক্ষণে যখন আর পারছেন না, শরীর শিথিল হয়েছে, বাক্য বন্ধ এবং চোখ দৃষ্টিহীন। মধ্যবিত্ত মদ খাওয়া শুরু করলে উল্টো কাণ্ড হল। আগে মদ মদ্যপকে খেত। এখন মদ্যপ মদ খায়। মদ খাওয়া হবে অথচ পা টলবে না, গলা জড়াবে না, ভদ্রলোকের চেহারা ঠিক থাকবে, তবেই সে ঠিক মানুষ। দু'পেগ তিনপেগ খেয়ে একদম স্বাভাবিক অবস্থায় অনেকেই ঘোরাফেরা করেন। কেউ কেউ গর্ব করে বলেন, পাঁচ পেগ খেয়েও মশাই ওর পা টলে না, বউকে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছেন। কেউ যদি দু'পেগে বেচাল হয় রসিকেরা তাকে এড়িয়ে চলে, 'দূর, দুটোতেই শালা আউট হয়, পেঁচো মাতাল। ওর সঙ্গে বসা চলবে না।' অর্থাৎ মদ খেতে হবে অথচ মাতাল হওয়া চলবে না, পঁচিশ বছরে বাঙালী মধ্যবিত্ত এই ধারণায় পৌঁছাবে, কে জানত।

পঞ্চাশের দশকের ভাবনা আশিতে পাল্টে গেল। মদ মানুষকে নষ্ট করে, এই

রকম ধারণা আজকাল বোকা-বোকা শোনায়। কুড়ি থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বঙ্গ-সন্তানদের অন্তত শতকরা আশিভাগ কখনও-না-কখনও গ্লাসে চুমুক দিয়েছে। একটা পার্টি হবে আর মদ থাকবে না, ভাবা যায় না এখন। কোন বনভোজন এবং তা যদি পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে হয়, তাহলে আলাদা করে হলেও মদের ব্যবস্থা থাকবে। পার্ক স্ট্রীটের এক পানওয়ালা পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবসা করছে। সে বলেছিল 'বাবু, তিরিশ বছর আগে বাবুরা বারে মদ খেতে এসে দশজনের মধ্যে ন'জন আমার দোকানে মশলা দেওয়া পান চাইত গন্ধ মারার জন্যে। এখন দশজনের দুজন চায় কিনা সন্দেহ।'

অর্থাৎ এক সময় লুকোবার প্রয়োজন বোধ করত, এখন করে না তেমন ভাবে। আমার বাবা আমাদের নিয়ে বসে বন্ধুদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, এখন কল্পনা করতেই কষ্ট হয়। এখন সেটা জলের মতো সহজ। আজকের দশ-পনেরো বছরের ছেলেমেয়ে জানে মদ পরিমিত খেলে কেউ নষ্ট হয় না। পরিমিত শব্দটা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। পার্কস্ট্রীটে সেরা মাতাল রামানন্দ চৌধুরী আমাকে হিসেব বুঝিয়েছিলেন। একটা লোক দিনে ছ'পেগ মদ খেলে টইটম্বুর হয়ে যাবে। বোতল কিনলে তার দাম পঞ্চাশ। কোন অবস্থাতেই মাসে পনের শ টাকার বেশী মদ সে খেতে পারে না। যার আয় সাড়ে চার হাজার সে যদি পনেরো শ টাকা মদের পেছনে ব্যয় করে তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে না, সংসারও ভেসে যায় না। আজকালকার মদ্যপরা মাতাল নয়। তাই সংসার ভাসিয়ে তারা মদ খায় না। কারণ বেশীর ভাগই অন্যের ঘাড় ভেঙে খায়। রমানন্দদা বলেছিলেন, 'বুঝলে ব্রাদার, সিক্সটি থেকে পাবলিকের হাতে দু'লম্বর পয়সা আসতে লাগল। গয়নাগাঁটি থেকে আরম্ভ করে বাড়ি ঘরদোর তৈরীর সঙ্গে মদ খাওয়া শুরু হল।'

মেয়েরা আরম্ভ করলেন সত্তর দশক থেকে। প্রথমে কোন মেয়ে মদ খায় শুনলে বড় চোখে তাকাত। এখন শতকরা দশভাগ মহিলা ব্লাডিমেরি অথবা অরেঞ্জ মেশানো এক পাত্তর জিন নিয়ে বসে গল্প করতে পারেন। গ্যাসে ভাত বসিয়ে মাঝে মাঝে স্বামী এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক চুমুক দিতে পারেন স্বচ্ছন্দে। মদ খাওয়া পাপ, এ বোধ সম্ভবত চলে গেছে। আমার এক বন্ধুর মা বলেছিলেন, 'কি করবে বল, হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটুখানি না খেলে ও পারে না। খেয়েদেয়ে তো মাতলামি করে না।'

সময় তাহলে এই সহনশীলতা দিয়েছে। কিন্তু তবু কোথায় আটকে যাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবারের যে টুকরো এখনও টিকে আছে, সেইসব বাড়িতে চট করে বন্ধুদের নিয়ে মদ খেতে পারা যাচ্ছে না। বাবা মা বাড়িতে না থাকলেই বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন হয়। এখন মধ্যবিত্ত বাঙালী বারে বসে মদ খেতে চায় না। মদের জন্যে ঘরোয়া পরিবেশ আড্ডা দরকার হয়, সেটা বারে পাওয়া যাবে না। তখন খোঁজ পড়ে কোন বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। আমাদের এক বন্ধু অরিন্দম

সম্প্রতি খুব ক্ষেপে গিয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় যখন তার ফ্ল্যাটে বন্ধুরা আসে তখন খারাপ লাগে না। কিন্তু রাত এগারোটায় তারা চলে যাওয়ার পর ঘরটাকে নরক বলে মনে হয়। এ্যাস্ট্রের বাইরে ঘরময় ছাই, নোংরা-হয়ে-থাকা গ্লাস এবং প্লেট দেখতে তার মোটেই ভাল লাগে না। সেগুলো পরিষ্কার করার সময় বসে প্রতিজ্ঞা করে আর কাউকে মদ খেতে ফ্লাটে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু বড় মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় প্রতিজ্ঞা বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা।

এই লেখক যখন দ্বিতীয় বর্ষ স্কটিশের ছাত্র তখন থাকত গ্রে স্ট্রীটের হোস্টেলে। কলেজের নাটক প্রতিযোগিতার সে ছিল সম্পাদক। একটি সুন্দরী প্রি ইউনিভার্সিটির ছাত্রীকে অনুরোধ করেছিল নাটকে অংশ নিতে।

ছাত্রীটি খুব নার্ভাস হয়ে জানিয়েছিল পরের দিন বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে এসে জানাবে। সেই রাত্রে হোস্টেলের দারোয়ান ঘরে এসে খবর দিল এক ভদ্রমহিলা ট্যাক্সিতে এসে আমার খোঁজ করছেন। সেই বয়সে এ-খবরে রোমাঞ্চিত হবার কথা। কালটা ছিল শীতের। শার্ট পাজামার ওপরে আলোয়ান চাপিয়ে নিচে নেমে দেখলাম এক প্রৌঢ়া মহিলা একা বসে আছেন ট্যাক্সিতে। তাঁর হুকুমে এবং দাপটে বাধ্য হয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে হয়েছিল। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেলগাছিয়ার ইন্দ্রবিশ্বাস রোডের বাড়িতে। পুরোটা পথ শাসিয়ে ছিলেন, কেন আমি ওঁর ভাইঝিটিকে নাটক করার প্রস্তাব দিয়েছি। কারণ ভাইঝি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, কো-এডুকেশন কলেজে পড়াতেই অনেক ঝামেলা করতে হয়েছে। এরপর ছেলেদের সঙ্গে নাটক করলে ভাই দিদিকে দায়ী করবেন। তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন ভাইঝির কাছে ক্ষমা চাইয়ে বলাতে নাটকে তাকে কোন প্রয়োজন আমার নেই। এখন ভাবতে খুব হাসি পায়, কিন্তু সে সময়ে আমি সত্যি মফঃস্বলের ছেলে ছিলাম, নইলে গেলাম কেন ? আমার সৌভাগ্য যে, ভাইঝিকে তার মা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা যখন বাইরের ঘরে আমাকে বসিয়ে বিস্তর জ্ঞান দিচ্ছিলেন তখন এক প্রৌঢ় বাড়িতে এলেন। পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাক, রোগা, ফর্সা, হাতে ছড়ি ছিল কিনা আজ মনে নেই। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হু ইজ হি ?' গলায় স্বর জড়ানো। অর্থাৎ উনি মদ্যপান করে এসেছেন।

প্রৌঢ়া তাঁকে জানালেন আমিই সেই বালক যে তাঁর ভাইঝিকে নাটক করার প্রস্তাব দিয়েছি। মিনিট তিনেক যে ইংরেজি শব্দাবলী আমার ওপর বর্ষিত হল তা বোঝার ক্ষমতা তখন আমি অর্জন করিনি। পা টলছিল তাঁর, গলার স্বরও জড়ানো কিন্তু ইংরেজি বলছিলেন দাপটে। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, 'বাট হোয়াই হি হ্যাজ কাম ? তুমি বলতেই চলে এল ? তাহলে তো মতলববাজ নয়।' ভদ্রলোক আমার সামনে বসলেন, 'আমি ওই মেয়েটির পিসেমশাই। সিগারেট খাও ?' একটা বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। তখনও কোনো বয়স্ক মানুষের সামনে সিগারেটা খাওয়া শুরু করিনি। অক্ষমতা জানালে মাথা এগিয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ড্রিঙ্ক করবে?' চমকে উঠলাম, 'না না।' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, 'সেকি হে! ভূত দেখলে নাকি? মদ খেলে জাত যাবে? নাঃ, তোমাকে দিয়ে চলবে না।' ভদ্রলোক উঠে ভেতরে চলে গেলেন কাঁপা পায়ে।

পরে অনেক ভেবেছি ওই মানুষটিকে নিয়ে। জেনেছি তিনি খুব সামান্য মানুষ নন। ইংরেজি কাগজে নিয়মিত যে কলম লিখতেন তা আমি পিতামহের হুকুমে কৈশোর থেকেই পড়তাম। তিনি আমাকে মদ খেতে অনুরোধ করলেন। আমার বয়স তখন আঠারো আর উনি পঞ্চাশ হবেনই। এবং বলতে হবে, বাড়ি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি মধ্যবিত্ত। কিন্তু মানসিকতায় নিশ্চয়ই নন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন তখন প্রথম বিয়ার খেয়েছিলাম। চারবন্ধু মিলে এক বোতল বিয়ার ভাগ করে খেতে গিয়ে এত বিশ্রী লেগেছিল এবং মনে আছে এক ঘণ্টা ধরে ভেবেছিলাম নেশা হয়ে গিয়েছে। তারপর পান খেয়েও মনে হচ্ছিল গন্ধ যাচ্ছে না। এই ঘটনার ছ'বছর বাদে চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ। ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুন্দর মানুষটি আমাকে ভালোবাসতেন এবং প্রচুর মদ খেতেন। ওঁর সঙ্গে দিনরাত টটি লেন, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে রিপণ স্ট্রীটের আনাচে কানাচে ঘুরেছিলাম। দেখলাম অন্য এক জগৎ। যেখানে ভরদুপুরে মদ খাওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার, রাতে ঘুমানোর আগে মদ না খেয়ে শুয়েছে, এমন মানুষ হাতে গুণতি। রাত বারোটায় একবাড়িতে আড্ডা মারার পর যখন বাড়ি ফিরব বলে উঠছি তখন গৃহস্বামী বললেন, 'বেরুতে হবে আপনাদের সঙ্গে।' সেই আড্ডাটি ছিল মদবিহীন। ভদ্রলোক বললেন, 'ভাই দু-পেগ না খেলে আমার ঘুম আসে না। বাড়িতে স্টক নেই, বার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পেয়ে যাব।'

সময়টা ছেষট্টি সাল। কৌতূহল হল। গৃহস্বামীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লাইট হাউস সিনেমার সামনে চলে এলাম। সেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়ানো। ভদ্রলোক একটি সরবতের দোকানের পাশ থেকে একটি বোতল কিনে চলে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। সেই রাতে মদ না খেলে তার ঘুম হচ্ছিল না। মনে আছে হাতিবাগানের সব দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে একটি সিগারেট কেনার জন্যে আমাদের এক অধ্যাপক পাগলের মত অনেক ঘুরে না পেয়ে বিড়ি কিনে খেয়েছিলেন। আমার এক বন্ধুর মা পানের সঙ্গে জর্দা খেতেন। একদিন স্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় তার পেট ফুলে গিয়েছিল। রাত বারোটায় বন্ধু পানের দোকান খুলিয়ে জর্দা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে আমি কয়েকজন চিত্র-পরিচালককে জানি মদ খেয়ে যাঁরা নিজেদের নষ্ট করেছেন বলে প্রচার আছে। কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। ঋত্বিক ঘটক মদ না খেলে আরও ভালো ছবি করতে পারতেন বলে কেউ কেউ প্রচার করেন। ঋত্বিকবাবু যদি মদ খেয়ে থাকেন তাহলে সেটা তিনি জেনেশুনেই খেয়েছেন। এমনটা

কেউ ভাবেন না কেন যে তাঁর কাজ করতে ইচ্ছে করত না বলেই তিনি মদ খেতেন। মদ খেলে নিশ্চয়ই তার ভালো লাগত। সেই ভাল লাগাটা যেমন তাঁর কাছে সত্যি তেমনি সত্যি ছবি করাটাও। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সুস্থ অবস্থায় থেকে গেলে হয়তো থাকাটাই হত, ছবি করাটা নয়, এমনও তো হতে পারে। এরকম তো শুনি অমুক পরিচালককে ছবি করতে ডাকা যায় না। এত মদ খায় যে ছবি শেষ হবে না। কেউ ভাবে না লোকটার আর কিছু দেবার নেই বলেই মদ খায়। সুস্থ থাকলেও ছবি জলছবি হত। আমি বিশ্বাস করি যার ভেতরে সৃষ্টি করার বাসনা আছে কোনো নেশা তার প্রতিবন্ধতা হতে পারে না। হ্যাঁ, এটা ঠিক হতাশাবোধ থেকে অনেকের মদ খাওয়ার মাত্রা বাড়ে। এবং এদের আজকালকার মদ্যপরাও পছন্দ করে না। আমি এমন একজন মাতাল দেখিনি যারা মনে মনে মতলববাজ নন। আমার ধারণা হয়েছে তাঁরা যা করেন দেখে শুনেই করেন এবং পুরো ব্যাপারটাই ভড়ং। এক কবি মাতাল শুনেছি কারো বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে প্রস্রাব করতেন। তিনি নিজের বাড়িতে সেটা নিশ্চয়ই করতেন না। এক সিনেমা পরিচালক মাতালের অভ্যেস পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্সির মিটার তুলে কারো বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। সেই বাড়ির মানুষদের বাধ্য হয়ে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে হত। এসব মাতালদের মদ খেতে পয়সা জোগাড় করতে দেখেছি কোন অসুবিধে হয় না। ঠিক একটা ফন্দি বের করে নেয় এরা।

এক দুপুরে অজিত এল আমার অফিসে। শনিবার। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে। অজিত বলল, 'ভাই, খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে।' সে ভাল চাকরি করে। পুলিশে। বাড়িতে একটা সাবেকী আবহাওয়া আছে। আমি জানি অজিত রোজ রাত্রে ডিউটি না থাকলে, ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে যায়। এবং সেই সময় তার পা টলে না। অজিতকে ওর বাবার সঙ্গে রাতের খাবার খেতে হয়। এবং সেখানে বেচাল হওয়া চলবে না, এটা তার প্রতিজ্ঞা। বললাম, 'কোনো বারে গিয়ে খেয়ে নে।'

'দূর। এভাবে ভালোলাগে না। চল না আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?'

'এক বাড়িতে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে।'

'কার বাড়িতে ?'

'মিস্টার এন্ড মিসেস দে। চমৎকার জায়গা ! ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে আসব।'

'কিন্তু অজিত, আমি জন্ডিস থেকে উঠেছি। এখন মদ খাওয়া ঠিক নয়।'

'খেয়ো না। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ো। গল্প তো করতে পারবে।'

অজিত দেড়খানা বোতল কিনল। দুটো থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে এত কি করে খাবে জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, 'চল্ না, দেখবি।'

পাড়াটা খুবই নির্জন। বাড়িটা পুরনো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই কোলাপসিবল গেট। পাশেই কলিং বেলের বোতাম। অজিত সেটায় চাপ দিল। একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখা গেল দরজার ওপাশে।

অজিত তাকে বলল, 'মিসেস দে-কে বল অজিতবাবু এসেছে।'

মেয়েটি চলে গেল। খট্‌কা লাগল। অজিত মিস্টারের বদলে মিসেসকে খবর দিতে বলল কেন? একটু বাদেই একজন সুন্দরী মহিলা ফাঁপালো খোলা চুলে হাত বোলাতে বোলাতে হাসিমুখে দেখা দিলেন, 'ওমা আসুন, কি সৌভাগ্য।' তিনি যখন তালা খুলছিলেন তখন বয়স মাপতে চাইলাম কিন্তু শিবের যা অসাধ্য তা আমি পারব কি করে? মহিলার স্লিভলেস জামার বাইরে হাত শাঁকের মত সুন্দর।

আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি তালা লাগালেন আবার। মিসেস দে প্রথম ঘরটি ছেড়ে দ্বিতীয় ঘরটির পর্দা তুলে বললেন, 'ভাবলাম বুঝি ভুলেই গেলেন। আমি কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি!'

অজিত বলল, 'সরি। দশ মিনিট লেট। আসলে আমার এই লেখক বন্ধুর অফিসে গিয়ে—'

'ওমা, আপনি লেখেন নাকি?' মিসেস দে চোখ বড় করলেন, 'কি নাম?'

অজিত পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি ছুটলেন। বই-এর সেলফ থেকে আমার একটা বই নিয়ে এসে বললেন, 'দুটো লাইন লিখে দিন। আমার নাম শম্পা।' শুধু নাম সই করলাম। আলমারী থেকে দামী গ্লাস এবং ফ্রিজ থেকে জল বেরুল। আমি খাব না জেনে তিনি খুব বিষণ্ন হলেন। তবু তিনটে গ্লাসে মদ ঢালা হল। মিসেস দে বললেন, 'অনেক ভেবে ঘরটাকে সাজিয়েছি। এক এক রকমের আলো আছে, এক এক সময়ের জন্যে। মুড অনুযায়ী জ্বালাই। ঘরটাকে ভাল করে দেখুন।'

সেটা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি। দেওয়ালে নানান ধরনেব সানমাইকা তাদের আকৃতিও সমান নয়। মিসেস দে বললেন, 'এই ঘরটা মদ খাওয়ার জন্যে স্পেশাল বানানো। জানো অজিত, কাল ক্রিকেটার অবনীশ এসেছিল। তিনটে খেয়েই আউট। কোনমতে বের করে দিলাম। সমরেশবাবু, সত্যি খাবেন না?'

'কয়েক মাস নয়। কিন্তু তিনটে গ্লাস কেন?'

মিসেস দে তালি বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্চা মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়াল। আমরা তিনজন একফুট উঁচু সোফায় বসেছি। মিসেস দে তৃতীয় গ্লাসটি মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'যা।' সে চলে গেলে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই টুকুনি বাচ্চা মেয়ে মদ খাবে?'

হেসে গড়িয়ে পড়লেন মিসেস দে, 'ও খাবে কেন? তিনি খাবেন। পাশের ঘরে আছেন। আমার কর্তা। গিন্নি হয়ে কর্তাকে বাদ দিয়ে খাব ভাবছেন কেন?'

'উনি ওঘরে কেন? এখানে ডাকুন।'

'না। এঘরে ওর প্রবেশ নিষেধ।' হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলেন মহিলা।

একটা গ্লাস শেষ হতেই আবার গ্লাস ভরা হচ্ছে। মেয়েটি আসছে তালি বাজা মাত্র। মিস্টার দে'র জন্যে মদের গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ হলে আবার

সেটা ফিরিয়ে আনছে। স্টিরিওতে মেহেদি হাসানের গজল বাজছে মৃদু স্বরে। লক্ষ্য করলাম অজিত খুব ধীরে খাচ্ছে। ওর এক গ্লাস শেষ হবার আগেই মহিলার দ্বিতীয় গ্লাস খালি হচ্ছে। ইতিমধ্যে যে গল্প শুনেছি তা হল মিস্টার দে চাকরি করেন সরকারি অফিসে। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর বোম্বেতে থাকে। সবাই যেমন বলে ইনিও তেমনি বললেন, 'খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরেই মেয়ে।' কিন্তু হিসেবের অন্য অঙ্ক বলে দিচ্ছে ইনি চল্লিশ পেরিয়েছেন অনেকদিন। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ইনিও। সম্প্রতি পিতার সম্পত্তি পেয়েছেন। মদ খেতে খুব ভালোবাসেন। মদ খাওয়ার জন্যেই এই ঘর। কলকাতা শহরের নামকরা অনেক যুবক প্রৌঢ় এখানে আসে মদ খেতে। অবশ্য টেলিফোনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে এলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। পছন্দসই মানুষ ছাড়া তিনি মদ্যপান করেন না। বললেন, 'মদের জন্যে ভাল পরিবেশ দরকার। সেই সঙ্গে চমৎকার সঙ্গী যে কথা বলবে নতুন নতুন। গোমরামুখো লোক একদম পছন্দ হয় না আমার।' তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমাকে কি ভাবছেন বলুন তো ?'

'এখনও কিছু ভাবিনি।'

'আমি মদ খাই। সিগারেট না। আর আমার সঙ্গে খেতে এসে কেউ যদি শরীরের দিকে হাত বাড়ায় তাহলে তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিই। আমার একটা চাকর আছে। লোকটা বোবা। কিন্তু কালা না। আমি চিৎকার করলে ছুটে আসবে। আমার কোন ক্ষতি সহ্য করে না সে। এবার বুঝতে পেরেছেন ?'

'পারছি।'

'আমি মদ খাই। যে আমার সঙ্গে খাবে সে মদ নিয়ে আসবে। তার খরচে।'

'আপনার স্বামী এঘরে আসতে পারেন না কেন ?'

'আমি তাকে ঘেন্না করি সে আমাকে সহ্য করতে পারে না। তাই।'

'সেকি !'

'হুঁ। ফরসা মেয়ের সঙ্গ তার খারাপ লাগে। কালো বীভৎস চেহারার স্বাস্থ্যবতী মেয়ে না হলে তার মুড ভাল হয় না। ওর ঘরে আমি ঢুকি না। ছেড়ে দিন এসব কথা। আপনার কবিতা নেই, না! শুধু গল্প লেখেন। আমার কবিতা খুব ভাল লাগে। সেদিন কার কবিতা পড়ছিলাম, 'ঈশ্বর আছেন কিনা তিনিই জানেন, দেখা হলে আর একটা দিন চেয়ে নিতাম, জমকালো দিন।'

'কথাটা আমারও।'

দেখতে দেখতে দেড়খানা বোতল শেষ হল। মহিলার মুখে এখন রক্ত ফেটে পড়ছে। চোখ ফোলা। গলার স্বর ভাঙছে। উঠে যখন দাঁড়ালেন তখন পা টলছে, 'অজিত, খুব এনজয় করলাম। এখন আমি ঘুমাবো। সারা সন্ধ্যে, সারা রাত। আবার যদি আসতে ইচ্ছে করে টেলিফোন করো। আর সমরেশ বাবু, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

স্খলিত হাতে তালি বাজানো মাত্র বাচ্চা মেয়েটি ছুটে এল, 'এদের তালা খুলে দে। বাই।' মিসেস দে আবার বসে পড়লেন। সোফাতেই।

ঘরের বাইরে আসতেই কানে এল, 'কি হল, আর মদ নেই?' একটি মহিলা কণ্ঠ বাজল, 'থাক আর খেতে হবে না।' 'চোপ।' পুরুষ কণ্ঠ চাপা ধমক দিল। বাচ্চা মেয়েটি পাশের ঘরের পর্দা সরাল, 'মদ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাবুরা চলে যাচ্ছে।'

সেই ফাঁকে ভেতরটা দেখলাম। এক প্রৌঢ় খাটে বসে আছেন। তার গায়ে ঠেস দিয়ে রয়েছে কুৎসিৎ এক মহিলা। প্রৌঢ় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

তালা খুলে দিলে আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে।

অজিতের শরীর ঠিক আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিস্টার দে'র সঙ্গে সেই কুৎসিৎ মেয়েটি কে?'

অজিত হাসল, 'মিসেস দে'র সাপ্লাই। আফটার অল স্বামী দেবতা। ওইভাবেই পুজো করেন।'

তিন

একসময় তাসের নেশা ছিল খুব। প্রথম দিকে ব্রিজ শেষের দিকটায় রামি। কলকাতা শহরে অন্তত পাঁচটি খুব ভদ্র তাসের আড্ডা ছিল যেখানে প্রতিমাসেই ঘুরে ফিরে যেতাম। লক্ষ্য করেছি জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মত তাসের বেলাতেও জেতার সময় মানুষ কিছুটা উদার হয়ে যায়। যখন সে হারছে তখন যেন তার উদাসীন হওয়া মানায় না বরং একটা ঝোঁক চেপে যায় কি করে হারের টাকা উদ্ধার করা যায়! সে তখন আরও ঝুঁকি নেয় এবং শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী পরাজিতকে কৃপা করেন না। আর সেই সময় মানুষের মন ছোট হতে আরম্ভ করে। একজন পরলোকগত বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালককে রামি খেলায় হেরে যেতে যেতে বেশ কয়েকবার মিথ্যে কথা বলতে দেখেছি।

ধরা যাক, তিনি ফুল প্যাক মার খেলেন। আর হাতে আছে আশি পয়েন্ট। তিনি নিজেই গুণে ষাট বলে হাতের তাস প্যাকেটের তাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এর ফলে মাত্র দুই পয়েন্টের হিসেবে তাঁর কিছুটা টাকা বাঁচল। কিন্তু যে প্রতিভার বিনিময়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন সেইটে বিস্তৃত হলেন। একদিন বলে ফেলেছিলাম। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'এই জন্যে অঙ্কে চিরকাল কম পেতাম, বুঝলে!' কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট চুরি করলেন একথা স্বীকার করলেন না। বড় মানুষ চোরদের এইটেই সুবিধে যে তাদের বেশী জেরার সামনে যেতে হয় না। বন্ধুরাও পরামর্শ দিতেন অচেনা জায়গায় রামি খেলতে যেওনা।

প্রথম কথা এদেশে পয়সা দিয়ে তাস খেলা বে-আইনী। সে ব্রীজ কিংবা ব্রে হলেও। দ্বিতীয়ত, সহ খেলোয়াড় চুরি করছে বুঝতে পারলে গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক।

আমার এক পরিচিত মানুষকে আমরা আলাউদ্দিনের দৈত্য বলতাম। রাত দুপুরেও সে গণ্ডারের দুধ এনে দিতে পারত। পৃথিবীর কোনো প্রশ্নের উত্তরে না বলতে পারত না। এবং কাজটা শেষ পর্যন্ত মানানসই ভাবে করেও দিত। এই সীতাংশুরও ছিল তাসের নেশা। ওকে খুব একটা জিততে দেখিনি আমি। কিন্তু খেলায় কখন অসৎ হয়নি। সীতাংশুর আর একটা ব্যাপার ছিল। ওকে বেহালা থেকে বেলঘরিয়া যেখানেই ছেড়ে দেওয়া হোক সেখানেই একজন পরিচিত মানুষ চটপট খুঁজে বের করবে। কলকাতার বিভিন্ন স্তরের এত মানুষকে ও কিভাবে চেনে তা ভাবনার ব্যাপার।

সীতাংশু একদিন আমার সঙ্গে গাড়িতে আসতে আসতে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হাতে সময় আছে?'

মাথা নেড়ে জানালাম, 'আছে।'

সীতাংশু বলল, 'গাড়ি থামাও। তাস খেলব।'

'তাস? এখানে?' তখন সময় দুপুর। জায়গাটা ওয়েলেসলি স্ট্রীট।

'চমৎকার একটা জায়গা আছে। ঘণ্টা দুয়েক খেলে বেরিয়ে যাব।'

'এসব জায়গার শুনেছি খুব দুর্নাম আছে, সীতাংশু!'

'তুমি ছাড়ো তো! আমি যখন সঙ্গে আছি তখন তোমার কোনো ভয় নেই।'

সত্যি কথা বলতে কি আমারও কৌতূহল হচ্ছিল। গাড়ি পার্ক করে সীতাংশুর পেছনে মার্কুইস স্ট্রীটে ঢুকলাম। ডান হাতের একটা গলিতে ঢুকে খুব পুরোন ইঁট বের-করা বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখল সীতাংশু। দোতলায় উঠে এলাম আমরা। পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় বিশাল একটা কুকুর থাবা বাড়িয়ে বসে। বাড়িটা কেমন নিঝুম। আমরা তিনতলায় উঠে এলাম। লম্বা করিডোর পেরিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিতেই বন্ধ দরজাগুলোর শেষে একটি ঘরে খোলা দরজায় পর্দা ঝুলতে দেখা গেল। পর্দা সরিয়ে সীতাংশু হাঁক দিল, 'হাই ডিক।

ভেতর থেকে একটি হেঁড়ে গলা ভেসে এল, 'ও ইউ। কাম ইনসাইড!'

সীতাংশু তাকে জানাল, 'আই হ্যাভ এ ফ্রেণ্ড উইথ মি।'

'ব্রিংগ হিম। এতনা দিন কাঁহা থা তুম?'

সীতাংশুর ইশারায় আমি ভেতরে পা বাড়ালাম।

মাঝারি ঘর। বয়স্ক সোফাসেটের একটিতে প্রবীণ যে মানুষটি বসে আছে তার সাদা চামড়া প্রমাণ করছে বিদেশী রক্ত আছে শরীরে। লোকটির বয়স হয়েছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। ঘরের কোণে একটি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার। ওপাশে বিশাল আলমারি। এপাশের দেয়াল জুড়ে বছর কুড়ির সাদা মেয়ের বিকিনি-পরা ছবি। পেছনে সমুদ্র। সদ্য সেখানে ডুব দিয়ে এসেছে মেয়েটি। ছবিটির সাইজ অন্তত ছয় বাই চার হবে।

ডিক তার উল্কি-আঁকা হাত বাড়িয়ে দিল, 'ওয়েলকাম।'

'তোমার নাম কি বন্ধু ?'

নাম বললাম। সীতাংশু পরিচয়টা দিল।

ডিক বলল, 'আচ্ছা! তুমি লেখো। আমি এর আগে কোনো লেখককে দেখিনি। কি খাবে ? বিয়ার না হুইস্কি ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না, কিছু খাবো না।'

ডিক এবার সীতাংশুর দিকে তাকাল। সীতাংশু বলল, 'বিয়ার খেতে পারি।'

ডিক উঠে যখন আলমারির দিকে গেল তখন তার পা একবার টলে গেল। আলমারি খুলে বিয়ারের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল সে। দেখলাম ওপাশে একটি দরজা আছে। ডিক কি বিবাহিত! শুনেছি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা খুব পরিশ্রমী হয়। ডিকের স্ত্রী কি চাকরি করতে গিয়েছে।

টেবিলে ফিরে এসে ডিক বলল, 'আজ মন খারাপ বলে সকাল থেকে মদ খাচ্ছি।'

সীতাংশু জিজ্ঞাসা করল, 'মন খারাপ কেন ?'

'আর বলো না, শালা এই দিনটায় আমি জন্মেছিলাম। মনে করলেই মন খারাপ হয়ে যায়। হা, হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে এলে বল ?' গ্লাস ভর্তি বিয়ারে চুমুক দিল ডিক।

'তাস খেলার ইচ্ছে হল।' সীতাংশু জানাল। 'ও বাপ্স। আমি তাস খেলছি না আর। রোজ হার রোজ হার, কাঁহাতক সহ্য হয়। বাজনা বাজিয়ে যা পাই সব তাসে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর ওতে নেই।'

লোকটাকে আমার খুব ভাল লাগছিল। এইসময় ভেতরের ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে সীতাংশু বলল, 'আরে ক্যাথি, ডিক্ কি বলছে!'

ক্যাথি কাঁধ ঝাঁকালো, 'ওর কথা আমাকে বলতে এসো না।'

ক্যাথির চেহারা বিশাল। লম্বা ও চওড়ায় মাপসই মুখ দেখে বোঝা যায় সুন্দরী ছিল এককালে। কোমরে দুটো হাত রেখে ক্যাথি বলল, 'তোমার বন্ধুর পরিচয় ও-ঘরে শুনেছি। তুমি কফি খাবে ?'

আমি হেসে অসম্মতি জানালাম, 'তার চেয়ে এখানে এসে বসুন। গল্প করি।'

'গল্প করার জন্যে তো আসনি।' বলে আলমারির ওপর থেকে তিনটে তাসের প্যাকেট তুলে ক্যাথি চলে এল টেবিলে। ডিক পিট পিট করে ক্যাথিকে দেখছিল। সীতাংশু তাস পেয়ে খুশী। নিয়মকানুন আর একবাব ঝালিয়ে নিয়ে সে তাস বাঁটতে লাগল। ক্যাথি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লিখে টাকা পাওয়া যায় ?'

বললাম, 'অল্পস্বল্প।'

সেই দানটা সীতাংশু জিতল। ক্যাথি মাত্র দুই পয়েন্টের দাম মেটাতে আর্তনাদ করতে লাগল। খেলার থেকে এই দুটি চরিত্র আমাকে আকর্ষণ করছিল বেশী।

লক্ষ্য করছি, ওরা নিজেদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা চালাচ্ছে না। মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যে আমি বেশকিছু টাকা হেরেছি। ক্যাথির মুখে হাসি। সীতাংশু ব্যালেন্সে এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমি ক্যাথিকে বললাম, 'আজ আপনার স্বামীর জন্মদিন অথচ মন খারাপ করে আছেন, এটা ঠিক নয়।'

চোখ ছোট করে তাকাল ক্যাথি, 'তুমি একটা উজবুক। লেখো কি করে?'

অর্থ বুঝতে পারলাম না। সীতাংশু অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল। আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল যখন হাসি থামিয়ে সীতাংশু বলল, 'দাদা, ক্যাথি ডিকের বউ না, শাশুড়ি।'

ক্যাথি গম্ভীর গলায় বলল, 'এই ফ্ল্যাটটা ওই হতচ্ছাড়াটার সঙ্গে আমি শেয়ার করি। আমার দুই ছেলে এখন লণ্ডনে। বোন ল্যাঙ্কাশায়ারে বড় ব্যবসা চালায়। কতবার ওরা লিখেছে, চলে এসো আমাদের কাছে, কিন্তু কি করে যাই বল ছোট মেয়েটাকে ছেড়ে। সে আবার ইণ্ডিয়া থেকে যাবে না। এই ডিকটা যদি ওকে বিয়ে না করত তাহলে জীবন অন্যরকম হতো।'

সীতাংশু দেওয়ালের ছবিটাকে দেখাল, 'ওই হল জুলি। ডিকের বউ।'

আমি সুন্দরীকে আর একবার দেখলাম। কিন্তু আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ডিক আর ক্যাথি তো প্রায় সমবয়সী। ক্যাথির মেয়ে ডিকের হাঁটুর বয়সী হওয়া উচিত। জুলি কি এখন অফিসে গিয়েছে?

কলকাতার মাল্টিন্যাশনাল অফিসগুলোয় রিসেপশানিস্ট থেকে টেলিফোন অপারেটারের চাকরিতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দেখা যায়। জুলির যে ছবি দেখছি তাতে চাকরি পেতে তার অসুবিধে হবার কথা নয়। বিয়ার শেষ করে ডিক বলল, 'আমাকে তাস দাও।'

ক্যাথি ধমকে উঠল, 'না। তোমাকে তাস খেলতে জুলি নিষেধ করেছে।'

'কে জুলি? আমি কি তার ক্রীতদাস? তোমার মেয়েকে তুমি ভয় পেতে পার। আমি কেয়ার করি না।' 'আচ্ছা! জুলি টাকা না দিলে না খেয়ে মরে যেতে এতদিন।'

'ছোঃ। আমি পার্ক স্ট্রীটের বারে ব্যান্ড বাজাই। তোমার মেয়ের টাকা তোমার লাগে!'

ডিক নবাবী গলায় কথাগুলো বলতেই দরজায় একটি খসখসে গলায় কথা বলে উঠল, 'হোয়াটস দ্য প্রব্লেম। এত ঝগড়া কি করে কর তোমরা ভেবে পাই না।' চোখ তুলে এক মধ্যবয়স্কা সুন্দরীকে দেখতে পেলাম। কালো চুল, টকটকে ফরসা, দীর্ঘাঙ্গিনী, শরীরে সুখের মেদ এবং চমৎকার শাড়ি। ক্যাথি বলল, 'এই দেখ না, ডিক তাস খেলতে চাইছে।' ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে জুলি। ছবির চেহারার সঙ্গে কেবলমাত্র মুখেরই মিল। শরীর এখন বেশ ভারী। হাতের বড় চামড়ার ব্যাগ টেবিলে রেখে জুলি বলল, 'তুমি ওকে বড্ড শাসনে রেখেছ মা। আজ যখন জন্মদিন তখন এক হাত খেলতে দিলেই পারতে। দেখে মনে হচ্ছে সকাল থেকেই মদ

গিলছে। ফট করে মরে গেলে তোমারই অসুবিধে হবে। হাই সীতাংশু। অনেক দিন পরে দেখলাম। কে জিতছে?'

ক্যাথি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এই সবে খেলা শুরু হল। জুলি, ইনি হচ্ছেন লেখক। গল্প, উপন্যাস লেখেন? খুব নাম-করা লোক। সীতাংশুর ফ্রেণ্ড।'

জুলি ভুরু ধনুকের মত কপালে তুলল, 'ইজ ইট?'

আমি হাসলাম, 'আপনাকে দেখার আগে অবশ্য ছবিটা দেখেছি।'

কাঁধ নাচাল জুলি, 'শী ইজ ডেড। আপনি বাংলায় লেখেন?

মাথা নাড়লাম। জুলি বলল, 'বলতে পারি, পড়তে পারি না। ইংরেজিতে কোন লেখা ট্রান্সলেট হয়েছে আপনার?'

জানালাম, 'কয়েকটা হয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে জুলি সোফায় বসে বলল, 'ডিকের হয়ে আমি খেলছি। হাই ডিক, ভাল আছ?'

ডিক চুপ করে গিয়েছিল জুলিকে দেখামাত্র। বলল, 'চলে যাচ্ছে।'

'বাড়িতে ডেটল আছে। ডেটল ক্রিম?'

'হ্যাঁ। কেন?' কেটে গেছে নাকি? ক্যাথি উদ্বিগ্ন হল।

'হ্যাঁ। নতুন জুতোয়। ডিক একটু ডেটল ক্রীম পায়ে লাগিয়ে দাও তো।'

ডিক উঠল। অনিচ্ছায়। জুলির ঠোঁটের কোণে হাসি দেখলাম। আলমারি খুলে ডেটল ক্রিমের টিউব নিয়ে সে এগিয়ে আসতেই জুলি তার বাঁ পা সোফার ওপর তুলে ধরল। শাড়ির প্রান্ত একটু উঠে এল। ধবধবে সাদা পায়ের গোছ এখনও নিটোল। ডিক ঝুঁকে দেখল। যেন সে ক্ষত খুঁজেই পাচ্ছিল না। জুলি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'মদ খেয়ে চোখের বারোটা বাজিয়েছ।' আঙুলের ডগাটা দেখাল সে। দেখলাম সামান্য সুতোর মত কাটা দাগ এবং সেটা পুরনো। ডিক সেখানেই ক্রিম ঘষে দিল। জুলি বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

সুখের মেদ শরীরে থাকলে মেয়েদের আচরণে তৃপ্তি ফুটে ওঠে। রানীর ভঙ্গীতে বসে জুলি তাস খেলতে লাগল। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, সে জিততে লাগল। ডিকের মুখে খুশির চিহ্ন। মানুষটিকে এখন আমার সত্যি ক্রীতদাস বলে মনে হচ্ছে। ক্রমশ কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, জুলি এখানে থাকে না। সে আসে মাঝে মধ্যে এদের দেখতে। সে যেখানে থাকে সেখানে ডিকের যাওয়ার অনুমতি নেই। ক্যাথির খরচ জুলি চালায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে জেতার টাকা হেরে গিয়ে ক্যাথি উঠে গেল। ডিক [illegible] চুপচাপ। জুলি ক্যাথিকে বলল, 'ওকে ওঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুমাতে বলো ও। মাতালদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

ক্যাথি ডিককে ডাকল। 'কাম অন ডিক।'

ডিক মাথা নাড়াল, 'নো। আই উইল স্টে হিয়ার।'

ক্যাথি বলল, 'না। তোমাকে জুলি ঘুমাতে বলেছে।'

ডিক বলল, 'আমার ঘুম পায়নি। আজ আমার বার্থডে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে জুলিকে দেখব। জুলিকে আজ বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে, না?' ক্যাথি এবার ডিকের হাত ধরল, 'তুমি আবার এসব কথা বলছ। জানো না, তুমি বললে জুলি রেগে যায়। চলে এস। আঃ।'

মৃদু টানা-হেঁচড়া চলল। শেষ পর্যন্ত ক্যাথি ডিককে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে পারল। মিনিটখানেকের মধ্যে জুলি একটা বড় পয়েন্ট হারল। পেমেন্ট দিয়ে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জুলি বলল, 'তুমি তো খুব পাকা খেলোয়ার!'

'মোটেই নয়। তোমার সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা করছি।'

'পারবে না। ডিক পারেনি। আমার জীবনে যে ক'টা পুরুষ এসেছে, তাদের কেউ পারেনি।'

'তাসের টেবিলে দেখা যাক পারি কিনা।'

'ঠিক আছে নেক্সট হাত যদি তুমি জেতো তাহলে আমি আজ খেলা বন্ধ করব।'

অবাক হয়ে তাকালাম। একজন সুন্দরী অহঙ্কারী রমণীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হব যদি জিতে যাই! এরকম জেতা কেউ চায়? কিন্তু ইচ্ছে করে হারতে পারি যাদের কাছে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই জুলি পড়ে না। সেই সম্মান অর্জন করতে হয়। পরের দানটা আমি জিতলাম। তাস ফেলে দিয়ে জুলি পেমেন্ট দিল। তারপর ক্যাথিকে ডেকে সংসারের খবর নিল। আমাকে যেন সে লক্ষ্যই করছিল না। ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে টেবিলে রেখে বলল, 'রাত্রে ডিকের জন্যে চাইনিজ আনিয়ে দিও। সেই সঙ্গে একটা ছোট হুইস্কি। দেখ, ওকে না জানিয়ে পুরোটা নিজেই খেয়ে ফেলো না। আমি যাচ্ছি। তারপর গটগটিয়ে দরজায় পৌঁছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিস্টার মজুমদার। আপনারা কোন দিকে যাবেন? আমি লিফট দিতে পারি।'

বললাম, 'ধন্যবাদ। সঙ্গে গাড়ি আছে।' শোনামাত্র জুলি বেরিয়ে গেল। এই রহস্যময়ী মেয়েটির ব্যক্তিত্ব আমাকে কিছুটা নাড়িয়েছিল। সীতাংশুর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল আচমকা তাস খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাথিকে বলল, 'দূর, আর তোমাদের এখানে আসব না। তোমার মেয়ে এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

ক্যাথি তার বিরাট শরীর নিয়ে তড়বড়িয়ে এল, 'নো নো। ও তো রোজ আসে না। বসো তোমরা। প্লিজ। ডিক মদ খেলে আমার ওর সঙ্গে থাকতে ভয় করে।'

সীতাংশু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ন্যাকামি করো না। দিনের পর দিন জামাই-এর সঙ্গে থাকছ আর ও রোজ মিছরির জল খায়, না?'

একজন প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে সীতাংশু যে গলায় কথা বলছে, তা আমার ভাল লাগল না। ক্যাথির মুখে একটা করুণ ছায়া। সে বলল, 'দোষ কিন্তু আমার মেয়েরই। সে আমাকে সমস্ত খরচ দেয় বলে মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারি না। কিন্তু

সত্যি কথাটা হল, আগে ডিক এত মদ খেত না। ও খুব ভদ্র মানুষ ছিল। জুলির ব্যবহারে এত পাল্টে গেল লোকটা।'

আমি সীতাংশুকে বসতে বললাম। একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি যেন! তিনজনে মুখোমুখি বসলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জুলি এখন কোথায় থাকে, ক্যাথি?'

'থিয়েটার রোডে। সী ইজ এ মিলানিয়ার, রাইট নাউ। ওর দুটো গাড়ি, এয়ারকণ্ডিশন ফ্ল্যাট, নাচের স্কুল আর ফ্যাট রিডউস করার সেন্টার আছে। ওসব জুলি খুব ভাল চালাচ্ছে। তোমরা তো দেখলে ওকে খুব চটপটে।' ক্যাথি জানাল।

'জুলির ছেলেমেয়ে নেই?' জানতে চাইলাম।

'আছে। দেরাদুনে পড়ে ছেলে। হোস্টেলে থাকে।' 'তুমি তোমার জামাইকে নিয়ে এখানে আছো কেন?'

'না হলে ও কোথায় যাবে? বাজনা বাজিয়ে আজকাল বেশী টাকা পায় না ডিক, কারণ মাসের দশটা দিন এ্যাজমায় ভোগে। যা পায় তা মদ আর তাসে উড়িয়ে দেয়। আমি যদি না থাকতাম তাহলে এতদিন ও ভেসে যেত। অথচ ওর জন্মদিনে টাকা দিয়ে মেয়ে বলে গেল আমি সব খেয়ে নিই। হায় ভগবান।' দুহাতে মুখ ঢাকল ক্যাথি। মানুষ যখন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয় তখন অনেক সত্যি তার ভেতর থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে শুধু একটু খুঁচিয়ে দিলেই হল! ক্যাথিকে বললাম, 'কিন্তু জুলি তো এখানে তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারত?'

'মাথা খারাপ। এখানে ও আসে দয়া করে: এ-সি ছাড়া জুলি ঘুমাতে পারে না।'

'ডিককে সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন? স্বামীকে ছেড়ে আছে।'

'লুক মজুমদার। ডিককে ও স্বামী বলে মনে করে না। যদিও ওদেরই ছেলে হয়েছিল। আমি অনেকবার বলেছি ডিককে ডিভোর্স করতে কিন্তু তাতেও রাজী নয়। বলে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষদের চেনা হয়ে গেছে, ডিভোর্স যদ্দিন না করছে তদ্দিন কেউ বিয়ের জন্যে চাপ দেবে না। দ্বিতীয়বার সে বিয়ে করতে চায় না। আর এই বুড়োটা, এ তো জুলিকে দেখলে এমন কৃতার্থ হয় ডিভোর্স করবে কি! দেখলে না জুলি কেমন ওকে পায়ে হাত দিতে বাধ্য করল? তবু হুঁস হয় না, আমি কি করতে পারি!' ক্যাথি রুমালে মুখ মুছল।

'ক্যাথি, জুলির সঙ্গে ডিকের ছাড়াছাড়ি হল কেন?'

'টাকার জন্যে।'

'মানে?'

'মেয়েরা যখন ওপরে উঠতে চায় তখন কারো সঙ্গেই আর অল্পে সুখী হতে পারে না। ডিককে আমি সামান্যই চিনতাম। তখন আমরা থাকতাম রিপন স্ট্রীটে। জুলি নাচত আর ডিক বাজাত। প্রায় বাপের বয়সী তবু ওরা প্রেমে পড়ল। বিয়ে করল। ছ'মাসের মধ্যে দেখলাম জুলির মধ্যে ছাড়া-ছাড়া ভাব। ডিককে ছেড়ে আলাদা

প্রোগ্রাম করছে। সেই সময় এক মাড়োয়ারী ছেলে প্রায়ই ডিকের কাছে আসত। ডিক এসে আমার কাছে নালিশ করল জুলি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তা আমি বললাম, 'নিজের বউকে নিজেই শাসন কর। ডিক কিন্তু পারল না। ওরা তখন এই ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। এখানেই মেয়েরা নাচ প্রাক্‌টিস করত। এই সময় একদিন পুলিশ রেইড করল। নাচ প্রাক্‌টিস করা বে-আইনী কাজ নয়। যে অফিসার এসেছিল সে ভুল বুঝতে পারলেও জুলি ছাড়ল না। জুলির সঙ্গে তার মাখামাখি শুরু হল। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে তার বড় অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল জুলির। এখন সেই লোক খুব ক্ষমতাবান অফিসার। তিনি আর তার এক সিন্ধী বন্ধু মিলে জুলির সময় দখল করে রেখেছেন। জুলিও চায় তাই। গাড়ি, এ-সি ফ্ল্যাট, ব্যবসা গুছিয়ে নিয়েছে ওই দুজনকে ব্যবহার করে এর মধ্যেই। ওর মত বুদ্ধিমতী আমি কখনই ছিলাম না। জুলিকে ওরা এক্সপ্লয়েট করছে, না জুলি ওদের করছে—এই নিয়ে ভাবনায় ছিলাম কিছুদিন। সেই অফিসার মাস তিনেক পরে রিটায়ার করবেন। তখন তার হাতে কোন ক্ষমতা থাকবে না। সী ইজ ভেরি মাচ এ্যাম্বিশাস। আর এই সব করতে গেলে ডিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না। তারপর তো ও বিবেকের দিক থেকেও পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'কি করে ?'

'ডিক একা এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি রিপনস্ট্রীটের ঘর ছেড়ে চলে এলাম। জুলিই বলল আসতে, কারণ দু'জায়গায় খরচ ওর পক্ষে বেশী হচ্ছিল। অসুস্থ হওয়ায় ডিকেরও রোজগার ছিল না। তা একসঙ্গে থাকতে থাকতে, ওর সেবা করতে আমার মনে হল লোকটা খুব একা। আমার মেয়ে অকারণে দুঃখ দিয়েছে। ডিকেরও অবলম্বনের দরকার ছিল; জামাই শাশুড়ি এসব তো পাতানো সম্পর্ক। মানুষের প্রয়োজনে যে সম্পর্ক তৈরী হয়, তার জন্যে আগে থেকে কোন প্রস্তুতি থাকে না। জুলি যেই সেটা বুঝতে পারল সেই যেন চেহারা পাল্টে গেল। মাসে একবার আসতে লাগল। আর এমন ভাবে কথা বলে, যেন ও ডিকের মেয়ে আর আমরাই স্বামী স্ত্রী। হ্যাঁ, এটাও আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু ডিক সেটা মানতে পারে না এখনও। তোমরা তো দেখলে।'

'তুমি জুলির কাছে বেড়াতে যাও ?'

'আগে যেতাম। কিন্তু ও পছন্দ করে না বুঝতে পারার পর যাওয়া কমিয়েছি।'

'কোথায় মানে কত নম্বর থিয়েটার রোডে থাকে জুলি ?'

ক্যাথি আমাকে নম্বরটা বলল। বলেই তার খেয়াল হল, 'কিন্তু তুমি নম্বরটা জেনে কি করবে? এখানকার পরিচয় নিয়ে গেলি জুলি কিন্তু তোমাকে অপমান করতে পারে।'

ক্যাথি ঠিক কথাই বলছিল। তবু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল জুলির ফ্ল্যাটে যেতে। কিন্তু একটা বাহানা না নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আমি উঠলাম, 'ডিক কোথায় ?'

'বেডরুমে ঘুমাচ্ছে।' ক্যাথি জানাল।

'আমি একবার বেডরুমে যেতে পারি ?'

'টয়লেটটা এপাশে। প্যাসেজের দুপাশে ফোল্ডিং দরজা আছে, টেনে নাও।'

'আমার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' আমি হেঁকে বললাম, 'শুধু তোমাদের বেডরুম দেখার কৌতূহল হচ্ছে। অবশ্য আপত্তি থাকলে!'

ক্যাথি উঠল, 'একটা সাধারণ বেডরুম! আমাদের মত গরীব মানুষের যেমন হয়।' ওর পেছন পেছন পাশের ঘরে ঢুকে দেখলাম ডাবল বেডের একপাশে ডিক শুয়ে আছে কিন্তু তার চোখ খোলা। নেশাগ্রস্ত মানুষকে বিছানায় শুইয়ে দিলে এতক্ষণে তো অঘোরে ঘুমানো উচিত। আমরা ঢুকেছি দেখেও সে নড়ল না। মানুষ কি ঘোড়ার মত জেগে জেগেই ঘুমায়? ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো পোস্টার সাঁটা। বেশীর ভাগই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের। একদিকের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে শুধু এলভিস প্রেসলি। ঘরের মধ্যেই বেসিন, টুকিটাকি ফার্নিচার। ক্যাথি বলল, 'নাথিং। কিছুই দেখার নেই। এই বয়সে এর চেয়ে গুছিয়ে রাখতে আর পারি না।'

এবার ডিক ধীরে ধীরে উঠে বসল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'জুলি চলে গিয়েছে?'

ক্যাথি মাথা নাড়ল। ডিক উদাস গলায় বলল, 'আজ ও আমাকে কোন গিফ্‌ট দিল না!'

ক্যাথি চুপ করে রইল। আমি বললাম, 'জুলি তোমার জন্য হুইস্কি আর খাবার আনার জন্যে ক্যাথিকে টাকা দিয়ে গিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ডিক, 'কাম অন, গিভ মি দ্য মানি।'

'নো। টাকাটা তুমি এখনই উড়িয়ে দেবে।' ক্যাথি প্রতিবাদ করল।

'সেটা আমি বুঝব। আমার টাকায় তুমি মাতব্বরি করোনা।'

'আশ্চর্য। টাকাটা দিয়েছে আমার মেয়ে।'

'যেই দিক। টাকাটা দাও।'

'না। আমি দেব না।'

'ভাল হবে না বলছি। একটা হোরের টাকা আর একটা হোর ঝেড়ে দিতে চাইছে।'

'কি ? আমি হোর ?' ক্যাথি চিৎকার করে উঠল।

'অফকোর্স ইউ আর। মজুমদার না বললে আমি জানতেই পারতাম না যে জুলি আমার জন্যে টাকা দিয়ে গিয়েছে। গিভ মি।'

'নো। দেব না। তুমি যা ইচ্ছে কর। আমি জুলিকে বলব যে তুমি ওকে হোর বলেছ। লজ্জা করে না। এর আগের বার জুলি পুলিশকে দিয়ে অমন মার খাওয়ালো তবু শিক্ষা হয় না। আমি যদি সেদিন না থাকতাম।' ক্যাথি তীব্র স্বরে বলল।

ডিক আর কথা বাড়াল না। উঠে আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

বোঝা যাচ্ছিল, ও কোথাও বের হচ্ছে। ঝগড়ার সামান্য বিরতি ঘটতেই আমি ক্যাথিকে বললাম, 'এবার আমরা চলি।'

'তোমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে ?' ডিক জানতে চাইল।

তার নেশা ইতিমধ্যে অনেক কেটে গিয়েছে। মাথা নাড়লাম। ডিক জিজ্ঞাসা করল, 'দয়া করে আমাকে একটু লিফ্‌ট দেবে ?'

ক্যাথি চিৎকার করল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'টু সেলিব্রেট মাই বার্থডে।' ডিক আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

গাড়ির সামনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাবে ডিক ?'

'থিয়েটার রোড। আমার স্ত্রী ওখানে থাকে।' হঠাৎ ডিককে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। খানিকটা অবাক হয়েই উল্টোদিকে যেতে রাজী হলাম। গাড়িতে বসে মাঝে মাঝেই নিজের মনে বিড়বিড় করছিল ডিক।

থিয়েটার রোডে পৌঁছে ঠিকানা জানতে চাইলাম না। ক্যাথির বলা নম্বরের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালাম। সঙ্গে সঙ্গে দুটো সাইন-বোর্ড দেখতে পেলাম। জুলির নাচের স্কুলের পাশেই মেদ কমানোর স্কুলের নির্দেশ। একটা নেপালি দারোয়ান ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। দেখলেই বোঝা যায়, ও দুটোই খুব ভাল চলছে। নইলে এতটা ডেকোরেটিভ রাখা সম্ভব হতো না। সীতাংশুকে অপেক্ষা করতে বলে ডিককে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। দরজায় ঢুকতেই নেপালি দারোয়ান বাধা দিল, 'মৎ যাইয়ে। আজ সব বন্ধ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বন্ধ কেন ?'

'আজ মেমসাহাব ছুটি দে দিয়া। উনকি পতিকা জন্মদিন হ্যায়।'

আমরা হতভম্ব। ডিকের দিকে তাকালাম, বোঝাই যাচ্ছে দারোয়ানটা ওকে চেনে না। ডিক সেটা বুঝে বলল, 'অনেকদিন পর এলাম তো। নতুন রিক্রুট হয়েছে। তবে দেখ, জুলি আমার কথা এখনও বলে। আমার জন্মদিনে দু'টো স্কুল বন্ধ, ভাবা যায় ?'

এই সময় আর একটা বড় ভ্যান এল। ভ্যান থেকে ফুল, খাবার, বিলিতি মদ নিয়ে লোকগুলো নামতেই দারোয়ান তাদের ওপরে যেতে নির্দেশ করল। ডিক জিজ্ঞাসা করল, 'এ'লো এল কেন ব্রাদার ?' দারোয়ান পিটপিটিয়ে হাসল, 'জন্মদিন পালন হোগা। ইহাঁসে আপলোক যাইয়ে। ফালুতো ভিড় দেখনেসে মেমসাহাব বহুৎ নারাজ হো যাইয়ে।' ডিক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম। একটা কনটেনার গাড়ি এসে থামল। পেছনের দরজা থেকে সুদর্শন এক অবাঙালী মেয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলো। দারোয়ানটা যে তাঁকে সেলাম করল তাও নজর করলো না। ডিক জিজ্ঞাসা করল, 'কৌন হ্যায় ?'

দারোয়ান বিরক্ত হল, 'বহুৎ ভারী কোম্পানিকো মালিক। মেমসাহাব কি দোস্ত। আপলোগ যাইয়ে ইহাঁসে। আভি পুলিশকো বড়া সাহেব উৎরায়েগা।'

ডিককে টেনে নিয়ে এলাম। এরই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে সে।

আত্মবিশ্বাস উধাও। বিড়বিড় করল সে, 'ওরা আমার জন্মদিনে ফূর্তি করছে।'

'তুমি কোথায় যাবে ডিক ?'

'জানি না।'

'চল তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।'

ওয়েলসলি স্ট্রীটে পৌঁছে ওর বাড়ির সামনে থামতেই আমরা ক্যাথিকে দেখতে পেলাম। একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ক্লান্ত পায়ে সে সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ডিককে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় চললে ক্যাথি ?'

ক্যাথি বলল, 'ডিকের জন্যে ড্রিঙ্কস আর চাইনিজ কিনতে। যাবে নাকি ডিক ?'

ডিক মাথা নাড়ল, 'সিওর। বাই মজুমদার।'

বললাম, 'গুডবাই। বাট বিফোর দ্যাট লেট মি সে, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।'

ডিক হঠাৎ যেন লজ্জা পেল, 'থ্যাঙ্কস। তবে এই জন্মদিনটায় বুঝতে পারলাম, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। তবু, জন্মদিন বলে কথা। চল ক্যাথি। আই অ্যাম থার্স্টি।'

চার

এককালে মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজের মেয়েকে সিনেমায় অভিনয় করতে পাঠাতো না। আমি সেই কালের কথা বলছি না যে কালে নাটক সিনেমায় ভদ্রঘরের মেয়ে পাওয়া অসম্ভব ছিল। যাঁরা সেদিন এসে শিল্পটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন তাদের সামাজিক মানুষেরা বাঁকা চোখে দেখত। আমি সাম্প্রতিক এককালের কথা বলছি, সে সময়েও মধ্যবিত্ত মনে করত সিনেমায় নামা মানে নষ্ট হয়ে যাওয়া। এখন অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ধারণাটা সবার মন থেকে দূর হয়ে যায়নি। ভাল মেয়েকে নাকি এই লাইনে খারাপ করে দেবেই। হয়তো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিনেত্রীদের যেসব ছবি ছাপা হয়, তাই এই ধরনের ভাবনা ভাবতে সাহায্য করেছে। এর ওপর আছে তাদের নিয়ে গুঞ্জন। কোন অভিনেত্রী বম্বের কোন অভিনেতার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, কোন পরিচালক কোন অভিনেত্রী ছাড়া চোখে অন্ধকার দ্যাখেন, এসব গল্প তো আছেই। মানুষ ভাবে যে কোন শিক্ষয়িত্রী যেমন সকালে স্কুলে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসেন তেমন যদি অভিনেত্রীরা তাদের সংসারমুখী জীবন-যাপন করত, তাহলেও চলত। কিন্তু আজ এই নায়ক কাল ওই ভিলেনের সঙ্গে যে রসের এবং আতঙ্কের সংলাপ বলে তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ না করে এরা পারেন না। দোষ দেওয়া অনুচিত হচ্ছে। মানুষ সবাইকে নিজের পরিধি দিয়েই বিচার করে। অভিনেত্রীর জীবন আর সাধারণ কখনই এক হতে পারে না। অতএব কেউ যদি নিজের মেয়েকে অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে না পাঠাতে চান, তাতে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

এই অবধি ঠিক ছিল। অভিনেত্রীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে তাঁদের অভিনীত ছবি না হয় আগ্রহে দ্যাখেন সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের ব্যক্তি-জীবনের গল্প শোনার জন্যে এদের লালা ঝরে কেন? সিনেমা পত্রিকায় কেন এত কেচ্ছা পড়ার শখ? কোন অভিনেত্রীর সম্পর্কে যদি গুঞ্জন না ওঠে, কারো সঙ্গে তাকে না জড়ানো যায় তাহলে কোন মধ্যবিত্তর মনে সন্দেহ ফণা তোলে? লাইনটা যদি খারাপ তাহলে তারা মুখ ঘুরিয়ে থাকলেই তো পারেন। ঠিক কথা। কিন্তু এরা তা থাকবেন না। রাস্তায় অভিনেত্রীকে দেখলে হাঘরের মত করবেন, অটোগ্রাফের খাতা বাড়াবেন, একটু স্পর্শ চাইবেন, সেই অভিনেত্রী যদি তার বাড়িতে যেতে চান তাহলে গর্বে বুক ফেটে যাবে। এও ঠিক। কিন্তু নিজের মেয়েকে কখনই সিনেমায় নামাতে চাইবেন না। হয়তো তাদের পক্ষে অন্য যুক্তি কাজ করে। সিনেমার অভিনেত্রীরা নাকি ব্যক্তি জীবনে সুখী হয় না। এ ধারণা তাঁরা পেয়েছেন সিনেমার পত্রিকার সাহায্যে। আবার এদের দুটো শ্রেণী আছে। রাম-শ্যাম যদি ছবির জন্যে কারো কাছে মেয়েকে চান তাহলে মুখের ওপর না করে দেবেন।

তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, মৃণাল সেন চাইলে দোনমনা করবেন। সত্যজিত রায় চাইলে লাফিয়ে উঠবেন। আবার ব্যতিক্রম আছে। এমন পরিবার এই বাংলায় আছেন যারা কিন্তু সত্যজিতের নামেও সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না। সিনেমা লাইন খারাপ এ ভাবনা তাদের রক্তে মিশে রয়েছে।

দূরদর্শনে ধারাবাহিক ছবি শুরু হবার পর থেকে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। বাংলায় প্রথম দূরদর্শন ধারাবাহিক শুরু করেছিলেন গৌতম ঘোষ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' নামে। শেষ পর্বে আমি একটি ভি.ডি. ও. নির্মাণ সংস্থার মাধ্যমে ওই ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। তখন গৌতম আর কাজটি করছেন না। কিন্তু এটি ছিল কয়েকটি ছোট গল্পের পরিবেশন।

যতদূর মনে পড়ছে গৌতম সেগুলো চলচ্চিত্রের ধারায় তৈরী করেছিলেন। টানা গল্প এবং সঠিক অর্থে ধারাবাহিক গল্প প্রথম এল 'তেরো পার্বণে।' এই ধারাবাহিকটি থেকে শুরু করে 'মুক্তবন্ধ' 'কলকাতা' হয়ে সাম্প্রতিকতম 'কালপুরুষে' পৌঁছে আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা পাল্টে গেল।

বাঙালী মধ্যবিত্ত, অবাঙালী পরিবারগুলোরও দূরদর্শন ধারাবাহিকে নিজের মেয়ে স্ত্রী অথবা মাকে অভিনয় করতে দিতে আপত্তি করছেন না। বরং এখন তাঁদের আগ্রহের প্রাবল্যে আমরা বিব্রত। প্রতিটি দিন কোন-না-কোনো বাবা ফোন করছেন তার মেয়ের জন্যে যদি একটা ভূমিকা পাওয়া যায়। দুটি কিশোরী এল তাদের মায়ের সঙ্গে পাইকপাড়া থেকে আমাদের পূর্ণদাস রোডের অফিসে। মেয়ে দুটি ধারাবাহিকে অভিনয় করতে চায়। মায়ের তো আগ্রহ আছেই, বাবার আপত্তি নেই। গৃহবধূ এসে বলছেন, দুপুরে তার কোন কাজ থাকে না, খুব অলস হয়ে পড়েছেন, তাই অভিনয় করতে চান। সুদূর কালিম্পং থেকে এক বড় মাপের অফিসার তাঁর সুন্দরী

স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। মনে রাখবেন, দূরদর্শন ধারাবাহিক সিনেমা নয়। লাভের ব্যাপারটা প্রথম থেকে সীমিত। তাই শিল্পীদের দক্ষিণা সিনেমার তুলনায় কিছুই নয়। হয়তো ওই কালিম্পং-এর মহিলাকে নির্বাচিত করা হলে দুবার তাকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে। ধরে নিচ্ছি এই বাবদ তার খরচ হবে হাজার টাকা। তিনি যদি তিনদিন শুটিং করেন তাহলে নবাগতা হিসেবে পাঁচশো টাকার বেশী পাবেন না। তবু তিনি আসতে চান। অভিজ্ঞতা অনেক হচ্ছে— এ বাবদ। আমি জানতামই না এখন কলকাতা শহরে স্বামীকে ছেড়ে চলে-আসা অথবা স্বামী-পরিত্যক্তা শিক্ষিতা যুবতীর পরিমাণ কত! আমি ভাবতেই পারিনি, বাইশ-তেইশ বছরের সুন্দরী এম.এ. পাশ মেয়ে প্রেম করে সংসার পেতেও মতান্তরের কারণে সেই সংসার ভেঙে দিয়ে একা বাস করছে এই শহরে এবং তাদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। এরা আসছে দূরদর্শন ধারাবাহিকে অভিনয় করার জন্যে। কেন? সিনেমায় যখন কেউ যেতে চায় না বা যেতে দিতে চায় না, তখন ধারাবাহিকে এত আগ্রহ কেন?

কারণটি আবিষ্কার করতে অসুবিধে হয়নি। ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলো এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের নিয়মনীতির জন্যে সেগুলোতে অশ্লীলতা বা বীভৎস ব্যাপার-স্যাপার সিনেমার মত আসেনি। এখনই বাংলা ধারাবাহিকে রোমান্টিক নায়ক গাছের ডাল ধরে গান গাইছে না অথবা খলনায়িকা শরীর দেখাচ্ছে না। যাই মনে হোক ধারাবাহিকের বেশীর ভাগ কাহিনী হল ভাল সাহিত্য থেকে নেওয়া। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত যারা ধারাবাহিক প্রযোজনা করছেন তাঁরা সিনেমা লাইনের ছাপমারা লোক নয়। জ্যোছন দস্তিদার, অরিজিৎ গুহ, রমাপ্রসাদ বণিকের পরিচিতি নাটকের জন্যে। এদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা আলাদা ধারণা রয়েছে।

তৃতীয়ত, বেশীর ভাগ ধারাবাহিকের শুটিং স্টুডিও পাড়ায় হয় না। এর বাড়ি ওর বাড়ি, রাস্তাঘাটেই কাজ বেশী হয়। আর পরিবেশটা থাকে খুব খোলামেলা। কলেজের কোন অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে বাড়ির বউ স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এখন পর্যন্ত কোনো সিরিয়াল-নির্মাতা মতলব প্রকাশ করে দুর্নাম করেননি।

চতুর্থত, দূরদর্শনে দেখানো হয়ে গেলেই ব্যাপারটা চুকে গেল। সিনেমার মত দিনের পর দিন পাবলিক দেখতে যায় না। এই যে তাৎক্ষণিক ব্যাপার, এটাও সম্ভবত অভিভাবকদের স্বস্তি দেয়। একবারের জন্যে তো—এরকম মন্তব্য কানে এসেছে।

পঞ্চমত, রেডিওতে গান গাইলে এককালে এদেশে মেয়ের বিয়ের পাত্র পাওয়া যেত। দূরদর্শনে মুখ দেখালেও সেটা ভাল ফল দিত। কিন্তু দূরদর্শনে অডিশন দিয়ে সুযোগ পেতে যে সময় এবং ভাগ্য লাগে, তাতে অনেকেই আর আস্থা রাখছেন না। তার চেয়ে সিরিয়াল কোম্পানিতে কয়েকবার ঘোরাফেরা করে যদি মেয়েকে একটা সুযোগ পাইয়ে দেওয়া যায় এবং সেটা অনেক সহজ মনে হওয়ায় অভিভাবকরা ধারাবাহিক সম্পর্কে এমন উদারনীতি নিয়েছেন। লক্ষ্য করবেন, ইদানীং ট্রামে বাসে

অফিসে বা বাড়ির আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে গতকালের দেখা ধারাবাহিকের উল্লেখ হয়ই। মীর্জা গালি কত সুন্দর, দেনা-পাওনায় সৌমিত্র অমায়িক অভিনয় করছে, তেরো পার্বণের গোরাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন অথবা কলকাতায় নিবারণ ঢোল দারুণ করেছিল, এ সবই ঘুরে ফিরে আসে। বাংলা সিনেমা নিয়ে আলোচনা প্রায় উঠেই গেছে বলা যেতে পারে।

কিছুদিন আগে এক প্রৌঢ়া মহিলা তার নাতিকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। বছর পঞ্চান্ন বয়স। এককালে সুন্দরী ছিলেন। কোনোদিন চাকরি-বাকরি করেননি। স্কুল ফাইনাল পাশের পর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছেলে ভাল চাকরি করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামী মারা গিয়েছেন বছর দুয়েক। বললেন, 'একদম সময় কাটতে চায়না। এরা তো সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। স্কুলে অভিনয় করেছি। তাই আপনারা যদি সিরিয়ালে সুযোগ দেন, তাহলে খুশী হব।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার ছেলের আপত্তি নেই?'

'না না। সে তো খুব উৎসাহ দিচ্ছে। শুধু নায়িকা তো নয়, আপনাদের তো মা মাসীও দরকার হয়। দেখবেন ঠিক পারব।'

বললাম 'দেখুন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় বলে আমাদের শুটিং এর কোনো মাথামুন্ডু নেই। ভোর সাতটায় এলেন, ছাড়া পেলেন ধরুন রাত আটটায়। টানা কাজ করতে হয় না। অনেক সময় বসেই থাকতে হয়। পারবেন?'

'তা কেন পারব না। বসেই থাকব।'

বললাম, 'বেশ। আপনার এখনকার একটা ছবি দিয়ে যান।'

'ছবি? ছবি তো তোলা নেই।'

'কিন্তু ছবি লাগবে। কারণ যখন আমরা কাস্টিং করব তখন আপনার মুখ আমার মনে থাকবে না। অ্যালবামে দেখলে সুবিধে হবে।'

দিন-পাঁচেক পর ছবি এল। গ্রুপ ছবি। ভদ্রমহিলা মাঝখানে বসে আছেন। তাঁর ছেলে, ছেলের বউ, নাতি এবং কন্যা চারপাশে। ছবির পেছনে প্রত্যেকের নাম এবং বয়স লেখা। এরা সবাই সিরিয়ালে অভিনয় করতে চান। আলাদা করে ছবি না পাঠিয়ে গ্রুপ ফটো পাঠালেন। যদি একটি পরিবারের গল্পে এঁদের সবাইকে সুযোগ দিলে খুব ভাল হয়— এমন কথা চিঠিতে জানিয়েছেন। ভাল লাগল ব্যাপারটা। তার মানে আজকের বাঙালী মধ্যবিত্ত সপরিবারে অভিনয় করতে চায়।

এইভাবেই ছবি দেখে একটি মেয়েকে আমরা নির্বাচন করলাম। মেয়েটির চোখে অদ্ভুত মুখরতা ছিল। প্রোডাকশন ম্যানেজার জানাল কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক এসে ছবিটি এবং বায়োডাটা দিয়ে গিয়েছেন। সালোয়ার-কুর্তা পরা মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশের মধ্যেই মনে হয়। অফিসকে বললাম ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ঠিকানা ছিল ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্যি লেনের। মেয়েটির উপাধিও ভট্টাচার্য। সেখান থেকে নিত্য কলকাতায় শুটিং করতে আসতে পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। দিন-চারেক

বাদে এক ভদ্রলোক এলেন। মধ্যবয়সী, রোগা, কেমন ক্ষয়াটে ভাব আছে। এসে বললেন, উনি সীমা ভট্টাচার্যের স্বামী। গানশেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন।

মেয়েটির ছবি দেখে মোটেই মনে হয়নি যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। চরিত্রটি ছিল সদ্য-বিবাহিতা তরুণীর। লক্ষ্য করেছি, নতুন মেয়েদের মধ্যে যারা অবিবাহিতা তারা এধরনের ভূমিকা খুব ভাল পারে। ভদ্রলোকের নাম রমেন। জানতে চাইলেন, 'শুটিং কবে বলুন ? রোলটা কেমন সেটাও তো ওকে বলতে হবে।'

প্রোডাকশন ম্যানেজার আঁতকে উঠলেন, 'বলতে হবে মানে ? আপনিতো সবাসরি ওঁকে শুটিং-এ হাজির করবেন, ওঁকে আমাদের দেখতে হবে।'

'দেখতে হবে মানে ?' ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ছবিতে তো দেখেছেন।'

'ছবিতে একরকম দেখায়, সামনাসামনি অন্যরকম। এরকম ফেস আমরা অনেক দেখেছি। তাছাড়া ওঁর গলার স্বর শুনতে হবে। পোশাক বলে দিতে হবে যদি সিলেকটেড হন। আপনি সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন ?' প্রোডাকশন ম্যানেজার জানতে চাইল।

'ওর শরীর একটু খারাপ।'

'শরীর খারাপ ? প্রায়ই ভোগেন নাকি ?'

'না, না। সামান্য।'

'তাহলে নিয়ে আসুন ওকে। আচ্ছা কত বয়স বলুন তো ? ছবিটা কবেকার ?'

'এখানকার। মাস-তিনেক আগে বাপের বাড়িতে তুলেছিল। ও, আমাকে দেখে ভাবছেন তো ! না, না। আসলে আমাদের বয়সের পার্থক্যটা অনেক।'

শুটিং-এর দিন পাঁচেক আগে রমেন সীমাকে নিয়ে এল। সীমাকে দেখেই আমাদের ভাল লাগল। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, খুব হাসিখুশী মেয়ে। রমেন গম্ভীর হয়ে একপাশে বসে রইল। রমেনের সামনেই চমৎকার রিহার্সাল দিল সীমা। পরিচালক খুব খুশী। শুধু আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'ওকে শাড়ি পরাতে হবেই সমরেশদা। কুর্তাতে ওর আপার পোর্শন খারাপ দেখাবে।'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'যা ভাল বোঝ কর।'

মিনিট তিনেক বাদেই সীমা এল আমার ঘরে,'সমরেশদা, আমি কি রোলটা পেয়েছি ?' আমি মাথা নাড়তে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। আমার যা বয়স তাতে এরকম প্রণাম নেওয়ার অভ্যেস তৈরী হয়নি। সামনে চেয়ারে বসে আব্দার গলায় সীমা বলল, 'আমি শাড়ি পরব না, সমরেশদা।'

'ওটা পরিচালকের ব্যাপার। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

'না, না। শাড়ি পরলেই আমাকে বুড়ী দেখায়।'

'ওই চরিত্রের যা পরা উচিত তাই পরবে।'

'কিন্তু শাড়ি পরলেই আমাকে চিনে ফেলবে যে।' প্রায় নাকি নাকি কথা বলল সে।

'কে চিনে ফেলবে।' আমি অবাক।

'আমার শ্বশুর শাশুড়ি।'

'কি আশ্চর্য ? তুমি টি.ভি.তে অভিনয় করছ আর তাঁরা জানবেন না ?'

রমেনকে ডাকিয়ে আনলাম। দেখলাম, কথাটা সে-ও সমর্থন করল। ভাটপাড়ার গোঁড়া ভট্টাচার্য ওরা।

বাবা এখনও পূজাপাঠ জ্যোতিষী নিয়ে আছেন। মা খুব গোঁড়া। সামান্য রোজগার করে বলে রমেনের কোনো দাপট নেই বাড়িতে। এই সময় সীমা ফুট কাটল, 'রোজগার-টোজগার নয়, আসলে মায়ের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে।'

মাসে তিন-চারদিনের জন্যে সীমা বাপের বাড়িতে আসে। সেটা ঢাকুরিয়ায়। তখন স্বাধীন। যা ইচ্ছে তাই করে। ওরা জেনেছে টি.ভি. সিরিয়ালে ফিল্মের মত অনেকদিন ধরে টানা শুটিং হয় না। তিন-চারদিন বাপের বাড়িতে থাকার সময় সে শুটিং করতে পারে। এদিকে রমেনের সমস্যা, সীমা বাপের বাড়িতে যখন থাকে তখন সে তার সঙ্গে থাকতে পারে না। মায়ের আপত্তি। ফলে সীমার শুটিং-এর সময় মাঝে মাঝে আসতে পারে তবে পাহারা দিতে পারবে না। সিনেমায় নামা তাই অসম্ভব কিন্তু এখানকার ব্যাপারে সীমা নাকি আমার নাম করে বলেছে, 'উনি যেখানে আছেন সেখানে তুমি যাবে পাহারা দিতে ? ছিঃ।'

বললাম, 'খুব বিপদে ফেললেন। যদি শুটিং চলাকালীন ভাটপাড়ায় আটকে যান তাহলে আমরা জলে পড়ব।'

'সেটা আমাদের চিন্তা। প্রোডাকশন ম্যানেজার বললেন, 'স্বামীর অনুমতিপত্র থাকলেই আপনারা চান্স দেন। এখন কি শাশুড়ির অনুমতিপত্র চাইবেন ?'

গিলতে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুখ তো বদলাবো না, শাড়ি সালোয়ারের পার্থক্য এমনকি যে ওঁরা আপনাকে চিনতে পারবেন না।'

সীমা রমেনের দিকে তাকাল। রমেন বলল, 'আমার এক শালি আছে ঠিক ওর মত দেখতে। সে শাড়ি পরে না বলে মা তাকে পছন্দ করে না। দুই বোনের এত মিল যে সীমা ওর নামে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারে কিছুদিন।'

'তারপর ?'

সীমা জবাব দিল, 'নাম হয়ে গেলে কে তখন কেয়ার করে!'

'কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনার ?'

'সে আর বলবেন না। ওর মায়ের তো এদিকে নেই তো ওদিকে আছে। আঠাশ বছরের ছেলের জন্যে পনের বছরের বউ দরকার, আমাকে নিয়ে গেলেন পছন্দ করে। বিয়ের মাসখানেক পর থেকেই রোজ রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় বকবক করতেন, 'তোমাকে নিয়ে এলাম যাতে বাড়িতে বাচ্চকাচ্চা ঘুরে বেড়ায়। এইটে মনে রেখ।' ইনি সেই মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলেন। সাড়ে ষোলয় ছেলে এল। এখন তার বয়স ছয়। স্কুলে যাচ্ছে। ঠাকুমা তার সব। ছেলের যখন একবছর তখন

ঠাকুমা নাতনি চেয়েছিলেন। আমি মুখের ওপর বলে দিয়েছিলাম, পারব না। সেই থেকে তাঁর রাগ আমার ওপর। দেখুন, এত অল্প বয়সে মা হয়েছি, সাধ আহ্লাদ সব চুলোয় গিয়েছিল। এখন আমার মত বয়সে কোনো মেয়ে বিয়ের কথাই ভাবে না। তাহলে আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করব না কেন ? বলুন ?

শুটিং-এ সীমা সবার মন জয় করে নিল। বলা যেতে পারে আমাদের কোম্পানিতে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া থাকে, যেটা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে তুলনীয়। ডিরেক্টার বলল, কোনো ক্যামেরা শাইনেস নেই, ভাল অভিনয় করেছে। প্রোডাকশন কণ্ট্রোলার জানাল, সীমা নিজে থেকে আমাদের অনেক কাজে সাহায্য করেছে। সবাইকে 'তুমি' বলছে, কেউ 'আপনি' বললে রেগে যাচ্ছে। খুব ভাল মেয়ে। শুটিং-এর পরদিন সে এল আমার ঘরে হলুদ সালোয়ার-কুর্তা পরে। 'কাল থেকে আবার জেলে যাচ্ছি, সমরেশদা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

হোঁচট খেলাম। এ মেয়ে যে আমাকেও 'তুমি' বলছে। বললাম, 'জেলে কেন বলছেন। হাজার হোক ওটাই আপনার নিজের বাড়ি।'

'কলা ! আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখলে একথা বলতেন না। একটা মেরুদণ্ডহীন লোককে আমি বিয়ে করেছি, বুঝলে। এই ক'দিন কি সুন্দর কাটল। হাসতে পারলে আমার মন ভরে যায়। অথচ, ও-বাড়িতে আমার হাসা বারণ। জানো ?' কপাল থেকে চুল সরালো সে। মুখে অন্ধকার নামল।

'পেমেন্ট পেয়েছেন ?'

হঠাৎই মেঘ উড়ে গেল। সশব্দে হেসে উঠল সীমা, 'ও-মা, তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন ? কি বোকা লাগে !'

এরকম মেয়েকে স্নেহ না করে উপায় নেই। যাওয়ার আগে জানিয়ে গেল, দিন সাতেকের নোটিশেই সে কাজে আসতে পারবে। এভাবেই চলছিল কিছু দিন। চিঠি লিখে জানালেই সীমা আসে। সবাই খুশী ওর কাজে। এর মাঝে সে জানাল ভাটপাড়ার বাড়িতে চিঠি না দিয়ে রমেনের ফ্যাক্টরিতে ফোন করতে। ফ্যাক্টরির ঠিকানাও দিল সে। বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়ায় সে এড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না।

এর মধ্যে প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে জানাল সীমাকে নাকি এডিকম কোম্পানির নতুন টি.ভি. সিরিয়াল আকাশ-মাটিতে শুটিং করতে দেখা গিয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। কোনো মেয়ে যদি ওপরে উঠতে চায় তাহলে শুধু একটা কোম্পানিতেই আটকে থাকলে চলবে না। বেশ কয়েকটি সিরিয়ালে অভিনয় করলে সে দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, রমেন-সীমা এটা ম্যানেজ করছে কিভাবে ? প্রথমে সে মাসে দিন তিনচারেকের জন্যে ভাটপাড়া থেকে ঢাকুরিয়ায় আসত। আমাদের কাজেই সেটা তাকে দ্বিগুণ করতে হয়েছিল। এখন যদি তিন-চারটে সিরিয়ালে সে কাজ করে তাহলে কি আর ভাটপাড়ায় ফিরে যাচ্ছে না ?

এই সময় একদিন সীমা এল। ওর চেহারা আরও ভাল হয়েছে। চামড়ার জৌলুস বেড়েছে। লম্বা চুলে ইস্ত্রি করিয়েছে সে। বললাম, 'তোমার শ্বশুর বাড়ির খবর কি?'

'ভালো আছে। শাশুড়ি আমার সঙ্গে কথা বলেন না। এত ঘন ঘন বাপের বাড়িতে আসা পছন্দ করছেন না। ছেলেকে খুব চাপ দিচ্ছেন। টাকার গন্ধ পেয়ে ছেলে মুখ খুলছে না।'

বললাম, 'সীমা, তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। একটা কথা বলি, জীবনে শান্তির চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। অভিনয় করতে আসার আগে তোমার অশান্তি ছিল না, কয়েকটি অতৃপ্তি ছিল। তৃপ্তি পেতে শান্তি খুইয়ো না।'

সীমা আমার মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

লক্ষ্য করলাম দু'পাশের চুল একটু ছেঁটে নিয়েছে সে। বেশ নায়িকা নায়িকা ভাব এসেছে ভঙ্গীতে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় সে আবহাওয়া পাল্টে দিয়ে চলে গেল।

ক'দিন বাদে প্রোডাকশন ম্যানেজার খবর দিল, 'শুধু তুমি', নামের একটা সিরিয়ালে বাড়ির বউয়ের ভূমিকায় সীমা নাকি খুব খারাপ অভিনয় করেছে। তার উচ্চারণেও গোলমাল লেগেছে। সেই সিরিয়ালের ডিরেক্টর নাকি খুব বিরক্ত হয়েছেন। একটু অবাক হলাম। সীমার নামে এইরকম রিপোর্ট পাইনি আগে। দূরদর্শন সিরিয়ালের বড় বড় কোম্পানির সব খবর রাতারাতিই জানাজানি হয়ে যায়। অতএব খবরটা সত্যি হবেই। একটু ভেবে দেখলাম, আধুনিক অথবা অল্পবয়সী চপলা মেয়ের ভূমিকায় সীমা যত ভাল করছে, তত ঘরোয়া চরিত্রে পারছে না। এই সময় চরম খবরটা পেলাম। সীমা নাকি এক তরুণ প্রযোজকের সঙ্গে দীঘায় গিয়েছে লোকেশন দেখার জন্যে। সেই প্রযোজকের এর মধ্যেই বাজারে এ-ব্যাপারে খ্যাতি বেড়েছে। তার সঙ্গে সীমাকে দীঘায় যেতে ছাড়ল কেন রমেন? মনে হয় আমি অনর্থক ভাবছি। যাদের ব্যাপার তারা বুঝুক। আমাদের সিরিয়ালে সীমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে যখন তখন তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাবো না।

টেলিকাস্ট শুরু হবার আগে আমার পরিচালক চাইলেন একটি দৃশ্যের সংলাপ ডাবিং করতে। বাইরের যে শব্দ ওটা শ্যুট করবার সময় নেই বলে মনে হচ্ছিল এখন তার কানে সেটা ধরা পড়ল। ওই দৃশ্যে সীমাও ছিল।

অতএব তাকে খবর পাঠানো হল।

এদিন সীমা এল রমেনকে নিয়ে। মেয়েটাকে আজ গম্ভীর দেখাচ্ছে। মুখের সেই চাকচিক্য কমেছে। বুঝতে পারলাম দীঘায় ব্যাপারটা নিয়ে খুব ঝামেলার মধ্যে আছে সে। ও-বিষয়ের উল্লেখ না করে পরদিন ডাবিং করতে আসতে বললাম। রমেন জিজ্ঞাসা করল, 'কালকের বদলে পরশু হয় না? খুব সুবিধে হত।'

বললাম, 'সময় একদম নেই। তাছাড়া অন্য শিল্পীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সীমার মাথার দু'পাশের কায়দা করে ছাঁটা চুলগুলো বড় হয়ে গেছে। মেয়েদের চুল কত তাড়াতাড়ি বড় হয় এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

পরদিন আমি নিজেই ডাবিং-এ গেলাম। সীমা চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই শুটিং-এর সময় বলা সংলাপের কাছাকাছি বলতে পারছিল না। বারংবার তাকে আগের বলা সংলাপ বাজিয়ে শোনানো হচ্ছিল কিন্তু উন্নতি হচ্ছিল না। রমেন আমাকে বলল, 'দাদা, আর একটা দিন সময় দিন। ও খুব নার্ভাস হয়ে আছে। কাল ঠিক করবেই।'

রাজী হলাম। অন্য সবাইয়ের সংলাপ ডাব করে শুধু সীমারটা রেখে দেওয়া হল পরের দিনের জন্যে। এটা আমি কখনও চাই না কিন্তু উপায় কি!

পরদিন সীমা এল। আমি আজ ডাবিং সেন্টারে যাইনি। টেলিফোনে খবব পেলাম আজ সীমা চমৎকার সংলাপ বলেছে। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে বোধহয়।

অভিনন্দন জানানোর জন্যে নিজেই চলে গেলাম। সীমা জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, খুশী তো?'

কিন্তু ততক্ষণে লক্ষ্য পড়েছে তার চামড়ার চাকচিক্য ফিরে এসেছে। চুল তেমনি ছাঁটা। গলায় হাসি। আর রমেন আসেন নি। গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা ওকে নিয়ে আমার অফিসে চলে এলাম। মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কে?'

থতমত হয়ে গেল সে। বলল, 'আমি সীমা।'

'ভাটপাড়ায় তোমার যে বোন থাকে তার নাম কি?'

কিছুক্ষণ সে চেয়ে রইল তারপর জবাব দিল, 'উমা।

'এই লুকোচুরির মানে কি?'

মাথা নিচু করে বসে রইল খানিক। তারপর বলল, 'উমা আর রমেনের খুব সখ সিরিয়ালে অভিনয় করবে। ওদের বাড়ি খুব গোঁড়া। মাসে তিনদিনের বেশী বাপের বাড়িতে আসতে পারে না। তাই আমি ওর প্রক্সি দিই। বোন তো হাজার হোক। আমার নামে চিঠি ঘনঘন যাচ্ছে দেখে ওর শাশুড়ি সন্দেহ করেছিল।'

'প্রথম দিন ও আমার কাছে এসেছিল। তারপর থেকে তুমি?'

'হ্যাঁ। সীমা মাথা নাড়ল, 'অন্য জায়গায় ও অভিনয় করতে গিয়ে বদনাম করে ফেলল। আমি আর কত দিক সামলাবো?'

'তুমি নিজে প্রকাশ্যে অভিনয় করছ না কেন?'

'এতে যা টাকা আপনারা দেন তার অনেকগুণ বেশী আমি রোজগার করি দাদা। দীঘায় যেতে আমার অসুবিধে হয় না। ভদ্রলোকের মেয়ের জন্যে টি.ভি. লাইন, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে ছিলাম, এখন উঁচু তলায় শরীর বিক্রী করি অভিনয় করে। আপনাদের ছোট পর্দায় আমায় ধরবে না। রমেন আমাকে ভাঙাচ্ছে। ভাঙাক। হাজার হোক ভগ্নিপতি। তবে আর নয়। কথা দিচ্ছি। আমারও বড় লোকসান হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার।'

পাঁচ

প্রবাল চ্যাটার্জী আমাদের পাড়ায় থাকতেন। থাকতেন বলার কারণ আজ ভোর চারটের সময় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে খবরটা পেলাম। পেয়ে মন খারাপ হল। বেড়াতে ভাল লাগল না। খবরটা পেয়েছিলাম গবুদার কাছে। গবুদার বয়স সত্তর, এখনও তাজা আছেন। শ্যামবাজারের মোড়ে মাঝারি দোকান আছে। প্রবাল চ্যাটার্জীকে তিনি তানু বলে ডাকতেন। সেই বাল্যকাল থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছেন ওঁরা।

গবুদা বললেন, 'সমরেশ, চল, ওই পার্কটায় বসি।'

'ঘণ্টা তিনেকের আগে তানুকে শ্মশানে নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ দোকান খুলবেন না ?'

'মাথা খারাপ। তানু চলে গেল আর আমি ব্যবসা করব আজ।'

আমরা পার্কে বসলাম। গবুদা সিগারেট খান না, কোন নেশা নেই। বিয়ে-থা করেননি। ভাইপো ভাগ্নেদের মানুষ করেছেন। চেহারা মিষ্টি, এই বয়সেও। কিন্তু আজ মনে হচ্ছিল খুব ভেঙে পড়েছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এ যুগের মানুষ, তানুর কোন ছবি দেখেছ ?'

'দেখেছি। আমার ছোট পিসীমা ওঁর খুব ভক্ত ছিল! তখন মেয়েদের একা সিনেমা দেখার রেওয়ার ছিল না।'

আমি বললাম, 'পরে ওর গান শুনেছি। চমৎকার।'

'সায়গল আর রবীন মজুমদারের কথা বাদ দিলে আর কেউ প্রবালের মত গাইতে আর অভিনয় করতে পারত না হে। প্রবালের অভিনেতা হবার ইচ্ছে ছিল ছেলেবেলা থেকেই। হয়েও ছিল। রোমান্টিক হিরো তো ওই প্রথম।' গবুদা চোখ বন্ধ করে বললেন।

'প্রবালবাবু কিভাবে ফিল্মে এলেন ?'

ওঃ, সে মজার গল্প। তানু তো দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ভাল গানের গলা। কানা কেষ্টর গান মিষ্টি করে গাইত। ডি.এল.রায় চমৎকার তুলেছিল। ওর ছিল নাটক করার শখ। শ্যাম বাজারের থিয়েটারগুলোর সামনে ঘুর ঘুর করত। তা আমি ওকে বললাম, 'তুই সুলালদার কাছে চলে যা। সুলালদার নাম শুনেছ? জহর গাঙ্গুলি হে।'

'ও, ওঁর ডাক নাম বুঝি সুলাল!'

'হ্যাঁ। তানু সাহস করে চলে গেল বাগবাজারে।'

সুলালবাবু বাড়িতে ছিলেন না। মন খারাপ করে চলে আসছিল। এই সময়

এক পরিচালক এলেন সুলালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তানুকে তার ভাল লেগে গেল। স্ক্রিন টেস্টে ডাকলেন ওকে।' গবুদা যেন চোখের ওপর সেই দিনটাকে দেখতে পেলেন, 'আমাকে নিয়ে তানু গেল নিউ থিয়েটার্সে। টেস্ট হল। পাশ করল। গান যা গাইল তাতেই মাথা ঘুরে গেল সবার। তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাসিক মাইনেতে এক বছরের জন্যে চুক্তি হল। পঞ্চাশ টাকা এ্যাডভান্সও পেল। দুপুরে আমরা চৌরঙ্গীতে সিনেমা দেখলাম। খেলাম। রাত্রে বাড়ি ফিরে কেলেঙ্কারি কাণ্ড।'

'কি রকম।'

'মেসোমশাই, মানে তানুর বাবা ছিলেন খুব রাশভারি মানুষ। ওঁকে লুকিয়ে তানু এসব করে বেড়াত। তিনি জানতেন, ছেলে কলেজে পড়ছে। চাকরির কথাটা তো তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু বলবেটা কে ? মাসীমা ছিলেন মাটির মানুষ। তানু আমাকে পাকড়াও করল। যেমন করেই হোক কথাটা মেশোমশাইয়ের কানে তুলে অনুমতি আদায় করতেই হবে। মেশোমশাই সন্ধ্যে থেকে বসতেন বাইরের ঘরে। আমরা খিড়কি দিয়ে ঢুকলাম। মাসীমা তো আমাদের দেখে অবাক, 'হ্যাঁরে, তোরা কোথায় ছিলি সারাদিন ?'

তানু জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'এক ভদ্রলোক একটু আগে তোকে খুঁজতে এসেছিলেন। সিনেমা লাইনের লোক। তোর বাবার সঙ্গে কি সব কথা বলে গেলেন। তারপর খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন তোর বাবা।'

তানু চাপা গলায় বলল, 'সর্বনাশ!'

'আপনি ঠিক শুনেছেন সিনেমা লাইনের লোক ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ বাবা।'

তানু বলল, 'হয়ে গেল। এবার মেরে হাড় ভেঙে দেবে।'

মাসীমা ব্যস্ত হলেন, 'তোর সঙ্গে সিনেমা লাইনের লোকের কি সম্পর্ক ?'

তানু অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকাল। অগত্যা আমি এগোলাম, 'মাসীমা, আপনি তো দুর্গাদাসের ভক্ত। দুর্গাদাস, পাহাড়ি সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, এঁদের আপনার খুব খারাপ লাগে, বলুন ?'

'ও মা, খারাপ লাগবে কেন ?'

'তাহলে ? তানু যদি ওদের মত একজন হয়ে যায় তবে আপনি রাগ করবেন ?'

মাসীমা কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন, 'আমি জানি না বাবা। ওর বাবা যা বলবেন তাই হবে। তোমরা ওঁর সঙ্গে কথা বল।'

গবুদা মাথা নাড়লেন, 'বুঝলে সমরেশ, সেই রাত্রে যেন একটা প্রলয় হয়ে গেল। মেশোমশাই ত্যাজ্যপুত্র করবেনই। ছেলেকে ফিল্মে নামতে কিছুতেই দেবেন না। স্পষ্ট বলে দিলেন, ওটা চরিত্রহীন মাতাল লম্পটদের আড্ডা। অনেক চেষ্টার পর ওঁকে রাজী করানো হল তিনটে শর্তে। এক, তানু যে সময়ে এখন বাড়িতে

ফেরে সেই সময়ে ফিরতে হবে। দুই, কোন নেশাটেশা করা চলবে না। তিন, চরিত্র নিয়ে কোন দুর্নাম যেন কানে না আসে। উল্টোটা হলে তিনি ছেলের মুখ আর দর্শন করবেন না।'

'তারপর ?'

'শুটিং থেকে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে রকের আড্ডায় আসত তানু। ওর কাছে গল্প শুনতাম। কাননদেবী, চন্দ্রাবতী, যমুনা দেবীদের গল্প। টপ টপ নায়িকা তখন ওঁরা। ওই ছবিতে তানু প্রথম যে গান গাইল তার কথা ছিল এইরকম, 'নবীন পথিক তোমার দুয়ারে, চক্ষু মেলিয়া দেখো।' ছবি রিলিজ হল। রোমান্টিক নায়ক কিন্তু বেশী বড় রোল নয়। কিন্তু একটি টাটকা মুখ, সুন্দর গলা আর ওই গান, বাজার মাৎ করে দিল। শুনেছ গানটা ?'

বললাম, 'পিসীমার মুখে শুনেছি।'

'হুঁ। তখনও রকের আড্ডায় আসত তানু। হাতে আরও দুটো ছবি। চুক্তি ফুরোলে অন্য কোম্পানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে।'

ক'মাসের মধ্যে তানু রকে এসে বসলে রাস্তায় ভিড় জমে যেত। মেশোমশাই স্থির করলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। ছেলে ফিল্মের নায়ক হলে যে মেয়ের বাবা ছুটে আসবেন তখন কেউ ভাবত না, বরং উল্টোটাই হত। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে একটা সম্বন্ধ এল। তবু বিয়েটা হল না। তানু অবশ্য তখনই বিয়ে করতে চাইছিল না। বলছিল, সবে ক্যারিয়ার শুরু করেছি এখন বিয়ে করা বোকামি। তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল।'

'বিয়ে হল না কেন ?'

'তানুর বাবা হার্টফেল-ই করলেন। এরকম ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে বিয়ে হবারও কথা নয়। ওদিকে মাথা ন্যাড়া করলে ছবি নষ্ট হয়ে যাবে। তানুর সঙ্গে আত্মীয়দের ঝগড়া লাগল। পুরুতকে পয়সা ধরিয়ে দিয়ে চুল বাঁচালো তানু। পরের ছবি সুপারহিট। মায়ের হাসি। ওই ছবিতে তানুর নায়িকা হয়ে এলেন সুখলতা।'

'আচ্ছা। উনি দারুণ সুন্দরী ছিলেন ?'

'তা ছিলেন। চোখে বিদ্যুৎ ঝলসাতো। প্রবাল চ্যাটার্জী আর সুখলতা, কলকাতার সর্বত্র সিনেমার পোস্টার। ওই ছবিতে তানুর গান হিট, 'নেভা দীপ জ্বলতে পারে তোমার ছোঁয়া পেলে।' তদ্দিনে হাতে ছবির সংখ্যা বেড়েছে। আর কারো পাকা কণ্ট্রাক্টের সই করছে না ও। কিন্তু বাড়ি ফিরতে রাত-বিরেত হচ্ছে। মাসীমা কাঁদছেন, তোর বাপের কাছে দেওয়া কথার খেলাপ করছিস তানু। এক সকালে সে এল আমার বাড়ি। আমি তখন পোর্টকমিশনার্সে চাকরি পেয়েছি। আশি টাকা মাইনে। তানু তখনই এক একটা বছরে পঁচিশ তিরিশ হাজার পাচ্ছে। তানু বলল, 'মাকে বোঝাও। আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করি। শুটিং শেষ হতেই রাত হয়ে যাচ্ছে।

'তুমি বলছ না কেন ?'

'বললে কে শুনছে ?' আবার কেউ কানে ঢেলেছে আমি সুখলতার প্রেমে পড়েছি।'

'আমিও শুনেছি।'

'দূর গবু। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, একটু-আধটু ফস্টিনষ্টি করলে সময় ভাল কাটে, তাই করা। আমি সুখলতার বাড়িতে যেতে পারি ? কোথায় থাকে জানো ?'

'কোথায় ?'

'সোনাগাছিতে।'

মিথ্যে কথা বলেছিল তানু। জীবনে সে একবারই প্রেমে পড়ল, ওই সুখলতার। যাকে বলে বুক নিংড়ানো ভালবাসা। প্রযোজকদের বলতে লাগল তাকে নিতে হলে সুখলতাকে নিতে হবে। চটক ছিল সুখলতার কিন্তু অভিনয়টা একটু মাটো। প্রেম যখন গভীর তখন সুখলতা বলল তাকে বিয়ে করতে হবে। আমার কাছে এল আবার। বলল, 'কোন মানুষের পরিচয় তার জন্ম দিয়ে নয় তার কাজ তার ব্যবহারই আসল পরিচয়। সুখলতা যখন আমার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে তখন তাকে স্ত্রীর সম্মান আমি দেব। তুমি শুধু মাকে রাজী করাও।'

'তুমি বলেছিলে ?'

'মাথা খারাপ। আমি সাহস পাইনি। তাছাড়া তিনি এখনও বাবার পছন্দ-করা সেই কৃষ্ণনগরের মেয়েটিকে ঘরের বউ করবেন বলে জেদ ধরে বসে আছেন।'

বললাম, 'অসম্ভব। তাছাড়া তানু তুমি মেশোমশাইকে যে তিনটে কথা দিয়েছ তার একটা আগেই ভেঙেছ, দ্বিতীয়টা ভাঙতে যাচ্ছ। তোমার বদনাম হচ্ছে।'

'দূর। ফিল্মের হিরোর গায়ে বদনাম লাগে না। তাছাড়া বদনাম যাতে পাকা না হয় তাই আমি সুখকে বিয়ে করতে চাইছি। তুমি বুঝতে পারছ না, বেশীদিন ঝুলিয়ে রাখলে ও হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কেন ? এত প্রেম—।'

'প্রেমের তো একটা সীমা আছে।' তানু বলল, 'ঠিক আছে, বল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। বুঝতে পারবে, ও কি মেয়ে।'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'স্টুডিওতে আসতে পারো। ওর বাড়িতেও যাওয়া যেতে পারে।'

'তার মানে তুমি সোনাগাছিতে যাচ্ছ।'

'আঃ। উজবুকের মত কথা বল না। সোনাগাছিতে আমি যাই না, আমি যাই ওর বাড়িতে। একজন ভদ্রলোকের মত।'

'কৌতূহল ছিল। তাই তানুর সঙ্গে স্টুডিওতে গেলাম। আরে ব্বাস, পরিবর্তন। দারোয়ান থেকে সবাই তাকে দেখে নমস্কার করছে। ফ্লোরে যেতে প্রযোজক পর্যন্ত দৌড়ে এসে খাতির করতে লাগল। একটু বাদেই সুখলতা এল। যাকে বলে রূপবহ্নি। এসেই সবার সামনে তানুর বুকের কাছে লেপ্টে বলল, 'এই আজ আমাকে একটু ছুটি দেবে ?'

তানু, আমার জন্যেই বোধ হয়, একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ?'

'আজ আমার কাকাবাবু আসবেন। খুব জরুরী ব্যাপার।'

দেখলাম, মুখ কালো হয়ে গেল তানুর। তবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সে। সুখলতা বলল, 'আপনার কথা সব শুনেছি ওর কাছে। খুব বন্ধু আপনারা।' সারাদিন শুটিং দেখলাম। মনে হচ্ছিল, মেয়েটা তানুকে সত্যি খুব ভালবাসে। ফাঁক পেলেই সোহাগ জানাতে ছুটে আসছে। আগে কাজ শেষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তানুর হাত ধরে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর তানুর কাজে কেবলই খুব ভুল হতে আরম্ভ করল। সংলাপ মনে রাখতে পারছেন না, গলা খুলছে না। পরিচালক বললেন, 'আজ শুটিং প্যাক আপ। প্রবালবাবুর মুড নেই।' প্যাক-আপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভাল লাগেনি তানুর। একটু আড়ালে এসে পরিচালককে বলল সে কথা। পরিচালক বৃদ্ধ। অনেক অভিজ্ঞতা। হেসে বললেন, 'প্রবাল, এখন তোমার জোয়ারের সময়। খাতে বইবে। সাধ করে চরার দিকে ধেয়ে যাওয়া কি ঠিক! ভেবে দ্যাখো!'

যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ। গুম হয়ে গেল তানু। বলল, 'চল পার্ক স্ট্রীটে, খিদে পেয়েছে। একটা পুরানো গাড়ি কিনেছিল সে। তাতে চেপে এলাম পার্ক স্ট্রীটে। খাবারের আগে দুটো হুইস্কি চলল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব খাচ্ছিস কবে থেকে ?'

'পিসীমার মত কথা বলিস না। খুব খাটাখাটুনির পর এগুলো একটু-আধটু দরকার হয়।'

'সুখলতা খায় ?'

'অল্প। ওই বলেছে।'

'তাহলে মেশোমশাইকে দেওয়া তিনটে কথাই ভাঙলি ?'

'যুদ্ধে এবং ভালবাসায় মিথ্যাচারণ পাপ নয়।'

চার পেগ খাওয়ার পর বিল মিটিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরছিলাম। বিডন স্ট্রীট পার হতেই গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরাল সে। আঁতকে উঠলাম, 'কোথায় যাচ্ছিস ?' সে জবাব দিল না।

বললাম, 'তানু এটা খারাপ পাড়া। কেউ দেখলে বদনাম হয়ে যাবে।'

'দেখবে যে সেও এখানে এসেছে।' একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, 'ইচ্ছে হলে তুই বসে থাক, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসব।'

দেখলাম আশেপাশের বাড়ির দরজায় রঙ মাখা মেয়েরা দাঁড়িয়ে। তানু যে বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে সেখানে কেউ নেই। এই রাস্তায় গাড়িতে বসে থাকার চাইতে বাড়িতে ঢোকা বেশী নিরাপদ। অতএব ওকে অনুসরণ করলাম। রাত দশটা বাজে। আশে-পাশের বাড়িতে গান বাজনা হচ্ছে। চাকরটা দরজা খুলতে চাইছিল না। তানুকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে খুলে দিল শেষ পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমাদের কানে এল তানুরই রেকর্ড বাজছে, নবীন পথিক তোমার দুয়ারে, চক্ষু মেলিয়া দ্যাখো!

তানু হাসল, 'দিস ইজ কলড্ লাভ।'

ওপরে ওঠা মাত্র এক বৃদ্ধা সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'ও তুমি! কিন্তু বাবা, ওর তো শরীর খারাপ। ঘুমোচ্ছে, কাল এসো বরং।

'কি হয়েছে ওর ?' তানু চিন্তিত হল।

'এই গা-গুলোন ভাব, বমিও হল। ডাক্তার কথা কইতে মানা করেছে।'

'কিন্তু রেকর্ড শুনছে কে ?'

'আমি।' বৃদ্ধা হাসলেন, 'তবে তোমার যদি তেমন ইচ্ছে হয়, সঙ্গে বন্ধু নিয়ে এসেছ বলেই বলছি, সুখলতার মাসতুতো বোন এসেছে আজ, তার ঘরে বসতে পার। খুব ভাল মেয়ে।'

'দূর! আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো ? ফূর্তির বাবু ?'

হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে নারী কণ্ঠের হাসি ভেসে এল, 'আর না। না।' পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'না বললে শুনবো না উর্বশী। তুমি বালুকা বেলা, আমি সমুদ্র।' তানু চমকে উঠল, 'কে ও ?'

বৃদ্ধা বলল, 'ওই তো মাসতুতো বোন।'

তানু বৃদ্ধাকে সরিয়ে ছুটল। আমি সঙ্গী হলাম। ঘরের দরজায় গিয়ে পর্দা সরাল সে। একটি প্রৌঢ় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রয়েছে মদের গ্লাস হাতে আর তার কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরেছে সুখলতা প্রায় জন্ম দিনের পোশাকে। তানু চিৎকার করে উঠল, 'সুখ!' পেছনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা গলা চড়াল, 'একি ব্যবহার। বললাম ও হল সুখলতার মাসতুতো বোন তবু বিশ্বাস হল না? একই রকম দেখতে বলে ভুল হচ্ছে তোমার। চলে এস। ওদের আনন্দ করতে দাও।' সুখলতা কিন্তু একবারও এদিকে তাকাল না। শুধু প্রৌঢ় গালাগালি দিতে লাগল ওই অবস্থায় বসে।

তানুকে টেনে নিচে নামাতে খুব কষ্ট হয়েছিল আমার। বৃদ্ধা যাই বলুক, মেয়েটি যে সুখলতাই, তাতে কোন ভুল নেই। বাজে পোড়া গাছের মত হয়ে গেল তানু তারপর থেকে।'

গবুদা বললেন, 'কতক্ষণ গেল ? তানুকে আবার এই ফাঁকে শ্মশানে না নিয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'না, দেরি আছে। গেলে তো এই পথ দিয়ে যেতে হবে। তারপর ?

'তারপর তো সবাই জানে! অভিনয় করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মদ্যপানও চলছিল। ওর মা জোর করে কৃষ্ণনগরের সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিলেন। বড় ভাল মেয়ে, শান্ত স্বভাব। তার সাধ্য কি তানুকে বশ করে। সুখলতা তদ্দিন ফিল্ম ছেড়ে দিয়েছে। সন্ধ্যের পর তানুর বাড়িতেই মদের আড্ডা বসত। কে না আসত সেই আড্ডায়। বাংলা ফিল্মের তাবড় তাবড় সব অভিনেতা থেকে চুনোপুটি। পাড়ার ছেলেরা তো চটে লাল। পাড়ার মধ্যে মাল খাওয়া চলবে না। কিন্তু কেউ কিছু বলতেও পারছে না। তানু এ পাড়ার গর্ব। সবাই বুক ফুলিয়ে বলে প্রবাল চ্যাটার্জী আমাদের পাড়ার

লোক। তার ওপর যারা খেতে আসেন তাদের চোখে দেখতে পাবে এমন কেউ কখনও ভাবেনি। তানুর বাড়ির সামনে একটা সিগারেটের দোকান ছিল। সেই দোকান থেকে শিল্পীরা বাড়ি ফেরার পথে দামী সিগারেট নিয়ে যেত তিন-চার প্যাকেট করে তানুর এ্যাকাউন্টে। মাস গেলে বিশাল টাকা মেটাতে হত তানুকে। সে এক অরাজক অবস্থা। বিনি পয়সায় মদ খেতে কে না চায়। মদের সঙ্গে মুফতে সিগারেট। কিন্তু ওই নেশাই কাল হল। কাজে উৎসাহ চলে গেল তানুর। শুটিং-এ ঠিক সময় যেত না। গানের গলাটাও নষ্ট হচ্ছিল। আমি নিজে চোখে দেখেছি হে, তোমাদের উত্তমকুমার তখন উত্তরকুমার হয়নি, সবে নেমেছে, তানুর বাড়িতে সাতসকালে একটু কথা বলবে বলে বসে আছে। সেই তানুকে প্রযোজকরা এসময় নড়াতে লাগল। ঠিক সময়ে না এলে, অভিনয় খারাপ করলে চেহারায় অত্যাচারের ছাপ থাকলে কোন পরিচালক তাকে নিয়ে কাজ করতে চাইবে? এক সময় তানু বেকার হয়ে গেল। অত বিখ্যাত লোক, ফিল্মে অত গ্লামার যার ছিল, সে নেশায় চুর হয়ে পড়ে রইল। তাতেও হল না, মদে নাকি ভাল নেশা হচ্ছে না, কোত্থেকে এক চীনেকে জোগাড় করল তানু। সে ব্যাটা ছোট ছোট পুঁচকে সাপ নিয়ে আসত বাড়িতে আর তার ছোবল খেত তানু। দু'দিন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকত। সাপের ছোবলে নাকি জব্বর নেশা হয়। চেহারা শুকিয়ে কাঠ, শরীর কালি, অসুস্থ লোকটাকে দেখলে কে বলবে এই ক'দিন আগের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নায়ক প্রবাল চ্যাটার্জী।'

গবুদা চুপ করলেন। জিজ্ঞাসা করতেই হয়, 'তারপর?'

'মার খেত। যদি কচিদা না থাকতেন। কচিদা মানে হেমেন সেন, বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক, ওকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। কারোর সঙ্গে দেখা করতে দিলেন না। দিনের পর দিন চিকিৎসা করে নেশামুক্ত করলেন। কিন্তু তদ্দিন তার দিন গিয়েছে। নায়ক তো দূরের কথা গাইয়ে হিসেবেও সে অচল হয়ে গিয়েছিল।'

বললাম, 'হ্যাঁ, এই সময়কার প্রবাল বাবুকে আমি দেখেছি। দেখে কষ্ট হত।'

গবুদা বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি কখনও তানু। একটা সময় এল যখন সংসার চালানোর অর্থ নেই। বউঠান কোনমতে সামলে চলেছেন সেই সময়। তিনি বলেই বোধহয় সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। চল, এবার যাওয়া যাক। চোখের ওপর তানুর উত্থান এবং পতন দেখলাম হে।'

প্রবাল চ্যাটার্জীর বাড়ির সামনে পাড়ার কিছু মানুষ, দু-একজন সংবাদপত্রের লোক। কিছু কিছু ফুল এসেছে। থিয়েটার থেকে, যেখানে প্রবাল চ্যাটার্জী শেষ দিনগুলোতে অভিনয় করতে যেতেন, ফুলের মালা এসেছে। দেখলাম ফিল্মের কোনো পরিচিত মুখ আসেননি যে মানুষটাকে প্রমথেশ বড়ুয়া দুর্গাদাসের পর উজ্জ্বল রোমান্টিক বলা হত তার মৃত্যুসংবাদে তাঁরা আলোড়িত হননি। হলে নিশ্চয়ই আসতেন।

দরজার মুখে গলিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠোঁট কামড়ে গুম হয়ে আছেন। গবুদা ভেতরে ঢুকে গেলেন। বৃদ্ধকে দেখে আমার কৌতূহল হল।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তাকালেন, 'ওরা কেন অপেক্ষা করছে?'

'যদি কেউ আসে।' বললাম।

'আর আসবে। অতবড় একজন অভিনেতা গায়ক, না হয় নিজেকে নষ্ট করে ফেলেছিল, কিন্তু সুস্থ হল যখন তখন কেউ ডাকল না? মামা, কাকা, ক্যারেক্টার এ্যাক্টিং পারত না? এই তো দেশের অবস্থা! শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে গিয়ে যা একটু শান্তি পেলেন।'

'থিয়েটারে গেলেন কিভাবে?'

'চেহারা দেখেছিলেন? হাড়জিড়জিড়ে, খাঁচা ছাড়া কিছু নেই। গাল ভাঙা চোখ বসা। সেইরকম একটা চরিত্রের দরকার ছিল। কোনো চালু অভিনেতা তো অমন চেহারা করবে না। হঠাৎ আমার মনে পড়ল প্রবালবাবুর কথা। মালিককে বললাম। তিনি সিনেমার লোক নন। তবু নিজে এসে খাতির করে ডেকে নিয়ে গেলেন। ষোল'শ টাকা মাইনে দিতেন। কিন্তু উনি যখন থিয়েটারে যেতেন তখন কোনোদিন দেখেছেন? রাজা, রাজার মত। ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবীতে সুন্দর গিলে করে ধুতি কুচিয়ে রিক্সায় উঠতেন। হাঁটাপথ পাঁচ মিনিটের কিন্তু রিক্সা ছাড়া কখনই থিয়েটারে যাননি। সব চলে গিয়েছে কিন্তু মেজাজটা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। কখনও কাউকে বলেননি অভাবে আছেন কষ্টে আছেন। মাথা নিচু করেননি। আজ মরার পর কে এল কে এল না তা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি কিন্তু উনি কেয়ার করতেন না।'

'আপনার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল, না?'

'একটু-আধটু।'

'উনি কেন এমন আত্মহননের রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন? কোন মহিলার কাছ থেকে আঘাত খেয়ে?' গবুদার কাছ থেকে শোনা গল্পের সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'কে বলেছে এসব কথা? মিথ্যে। গুজব। প্রথম বয়সে একজন অভিনেত্রীর প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মেয়েটি তো খারাপ মেয়ে, এটা উনিও জানতেন।'

'তাহলে?'

'সাকসেস। সবচেয়ে খারাপ অসুখ। আপনি ব্যর্থ হলে চেষ্টা করে যাবেন বারংবার। কিন্তু সাকসেসের চূড়ায় উঠে গেলে আপনার ব্যালান্স হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। খুব কম মানুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন। উনি পারেননি। এই টুকুই।'

এইসময় মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা বেরুলো হরিধ্বনি দিতে দিতে। খাটের ওপর গিলে-করা পাঞ্জাবী পরে ফুলের নিচে শুয়ে আছেন প্রবাল চ্যাটার্জী। রাজার মত। পেছনে যারা রইল তারা কে কি বলল তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন বা সুযোগও তাঁর নেই।

ছয়

চলচ্চিত্র এমন একটা ব্যবসা যার চেহারা গত তিরিশ বছরে একটুও পাল্টায়নি। মানুষের জীবনযাত্রার অনেক অদলবদল হয়েছে, অভিনেতা-পরিচালকরা এসেছেন চলে গিয়েছেন কিন্তু এই ব্যবসার ধরন একই রয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এটি রেস খেলার চেয়ে কঠিন। রেসে কোন্ ঘোড়া জিতবে বুকে হাত দিয়ে পরের পর কেউ বলে যেতে পারেন না। কিন্তু কোন্ ঘোড়া প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ের মধ্যে থাকবে তা বলার লোকের অভাব নেই। দশ টাকায় এক হাজার টাকা নয় বারো পনেরো হলেই চলবে এমন যাঁদের ভাবনা তাঁরা কিন্তু কখনও রেসে হারেন না। কুড়ি লাখ টাকা খরচ করে ছবি করলাম কিন্তু পঁচিশ লাখ পেলেই আমি কৃতার্থ হব এমন নিশ্চয়তা কে আমাকে দেবে ?

ফিল্মে ? কেউ না। তাই পৃথিবীর সেরা জুয়োর নাম ফিল্ম করা। কেউ কেউ অবশ্য এক-আধজন পরিচালকের নাম করতে পারেন যাঁদের ছবি পরের পর হিট হচ্ছে। এক-আধজন প্রযোজককেও খুঁজে পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই তাঁদের কৃতিত্ব আছে। তাঁরা যা পারেন অন্যেরা পারেন না। ফলে সেই সুসময়ে তাঁদের কৃপা পেতে মানুষেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। যাকে কেউ এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলত না উনআশি সালে, উননব্বইতে শুনেছি গল্প চিত্রনাট্যের জন্যে তিনি এক লাখ নেন। নেবার হক্ একশোবার তাঁর আছে। কারণ তাঁর ছোঁয়া থাকলেই ছবি সুপারহিট। কিন্তু এই সুসময় বেশীদিন ধরে রাখা খুব মুস্কিল। তরুণ মজুমদার, সুখেন দাস এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

ব্যবসাটা সুরু হচ্ছে, একজন প্রযোজক যিনি টাকা ঢালবেন তাঁকে নিয়ে। আগে, কিছুদিন আগে পাঁচ ছয় লাখে বাংলা ছবি হয়ে যেত। দশ-পনেরো করে বাড়তে বাড়তে শুনছি চল্লিশ লাখে গিয়ে পৌঁছেছে এখন। এত টাকায় যাঁরা ছবি করেন তারা দর্শক মজাবার জন্যে তৈরী হয়েই নামেন। 'আর্ট ফিল্ম' নামক ব্যানার যাদের ওপরে তারা দশের বেশী এগিয়ে যাওয়ার সুযোগই পান না, যদি না গৌরী সেন ওরফে এন. এফ. ডি. সি, টাকা না দেয়। এরকম একটি ছবির বাজেট শুনছি সবরকম রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে। মোটামুটি বিশ পঁচিশ লাখকে ছবির বাজেট ধরা যাক। তা সেই মানুষটি যিনি ছবি শুরু করছেন, যাঁর নাম প্রযোজক, খাতায় কলমে যিনি ছবির নাম, গল্পের নাম এবং নিজের নাম লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন তাঁর অত টাকা নেই।

লাখ পাঁচ-ছয় নিয়ে তিনি নামলেন। প্রথমে একজন পরিচালককে ডেকে পাঠালেন। টালিগঞ্জে এখন অভিনেতার চেয়ে পরিচালক বেশী। দু'তিনটে ছবিতে যে থার্ড এ্যাসিস্টেন্ট করেছে, সেও পরিচালক হতে চায়! অতএব ঝাড়াই বাছাই চলল। ওর লাস্ট ছবি ফ্লপ করেছে, ও টেকনিক্যাল ব্যাপারটা ভাল জানে না,

ওর পরিচালক খুব কাজ জানে কিন্তু মদ খেয়ে অর্ধেকদিন কাজে আসবে না. এ একরকম বাজেট প্রথমে বলবে আর শেষ করবে দ্বিগুণে গিয়ে। এছাড়া প্রথমে খুব বিনয় দেখাবে কিন্তু পরে কথা না শুনলে চোখ রাঙাবে এমন লোককে নেওয়া চলবে না। আবার এই শ্রেণীর পরিচালকের অহঙ্কারই বেশী কিন্তু পুঁজিতে হিট ছবি নেই। সাধারণত যাঁরা প্যানোরামায় ছবি পাঠিয়েছেন কোনকালে তাদের নিলে কি ওই যন্ত্রণায় ভুগতে হয়। চলচ্চিত্র-জগৎ ঘেঁটে একটি শান্তশিষ্ট কাজ-জানা বিশ্বস্ত পরিচালক পেতে চেষ্টা করেন প্রযোজক। ধরা যাক, তিনি ক-বাবুকে পেলেন। দ্বিতীয় স্তর শেষ হল। এবার গল্প খোঁজার পালা। ক-বাবুর পারিশ্রমিক ঠিক হল পঞ্চাশ হাজার টাকা। পাঁচ হাজার এ্যাডভান্স নিয়ে তিনি রোজ গল্প পড়েন আর প্রযোজককে শোনান।

বাংলা সাহিত্য শেষ হয়ে গেল। বঙ্কিম আজ অচল। বিষবৃক্ষ ফ্লপ করেছে। শরৎচন্দ্রের তো বাকি কিছু নেই। চরিত্রহীনটা বড্ড বেশী বাজেট। জাহাজ-টাহাজ লাগবে। রবীন্দ্রনাথ, পাবলিক এঞ্জয় করবে না। ওই ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলিওয়ালা, অতিথি তো বার বার হয় না। সে সব দিনও চলে গিয়েছে। মাণিক, বিভূতি, তারাশংকর গল্প ঘোরালে কাগজগুলি চেঁচাবে। আর আশুতোষ মুখার্জী বা প্রফুল্ল রায় ছাড়া আজকের গল্পকারদের গল্পে আর যাই থাক, গল্প থাকে না। ওঁদের কোন গল্প মনের মত হলে বাঁচা গেল। নইলে যাকে বলে রিসার্চ তাই চলবে কিছুদিন।

টালিগঞ্জের হাওয়ায় কিছু গল্প ভেসে বেড়ায়। একজন সহকারি পরিচালক হয়তো কোন আইডিয়া কাউকে বলেছিল, তার মুখ থেকে আর একজন, আইডিয়া মুখে মুখে গল্প হয়ে যায়। সেরকম একটা কিছু পেয়ে গেলে কথাই নেই। নইলে হরিমাধবকে ডেকে আনা হয়। বাংলা ফিল্মের হয়ে তামাম বাংলা সাহিত্য পড়েছেন হরিমাধব। একটা পাবলিসিটি ফার্মে কাজ করেন। গল্প শুনে বলে দিতে পারেন কোন্ ছবি হিট করবে। হরিমাধব প্রথমেই সুপারিশ করবেন সেই বাবুর কথা, যাঁর কাহিনী-সংলাপ-চিত্রনাট্য আজকাল বাজার মাৎ করেছে। প্রযোজক আপত্তি করবেন, 'না মশাই, লাখ টাকা খরচ করতে পারব না ওই এ্যাকাউন্টে। তাছাড়া ওঁর গল্প নিলে এই অভিনেতাকে নেওয়া যাবে না, ওই মিউজিক ডিরেক্টরকে বাদ দিতে হবে আর এই কজনকে নিতেই হবে, এমন চুক্তিতে যেতে পারব না।'

হরিমাধব তাঁর বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক যিনি ঘষা পয়সার চেয়ে অচল পয়সায় নাম করলেন। শারদীয়াতে লেখা একটা ছোট গল্প বাড়িয়ে নিলে ভাল ছবি হবে। পড়া হল সেই গল্প। এমন কিছু মনে ধরল না। হরিমাধব তখন ইঙ্গিতগুলো বাড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গল্পটা দাঁড়িয়ে গেল এইরকম।

রাজা থাকে একটি গ্রামে। বছর বাইশের সুন্দর চেহারার যুবক মা ছাড়া তার কেউ নেই। মাকে প্রচণ্ড ভালবাসে সে। তার জীবিকা চ্যানাচুর বিক্রী করা। গ্রামের ছোট্ট স্টেশনে সে চ্যানাচুর বিক্রী করে গান গেয়ে। তার গানে ফুল চাঁদ তারা

নেই। মানুষের সুখ দুঃখের কথা খুব সহজ ভাষায় বলে সে। মা যে চ্যানাচুর তৈরী করেন তাই বিক্রী করেন সে। তার গানে মায়ের প্রতি ভালবাসা উথলে ওঠে। সে গান গেয়ে শাশুড়ি বউয়ের কলহ মেটায়। যুবতী বিধবার সঙ্গে অকৃতদার ভাসুরের সংঘর্ষ গানের মাধ্যমে কমিয়ে দেয়। মা স্বপ্ন দেখে তার ছেলে একদিন গায়ক হবে। এই সময় ট্রেন থেকে নেমে কলকাতার এক বাবু তার গান শুনে অবাক হয়ে গিয়ে আমন্ত্রণ জানায় সেখানে রেকর্ড করতে যেতে। মাকে ছেড়ে কলকাতায় যাবে কি না— দ্বন্দ্বে পড়ে রাজা। চোখের জল মুছিয়ে মা তাকে উৎসাহিত করে কলকাতায় যেতে।

কলকাতায় রাজা পৌঁছানোর পর গল্প কিছুটা রাজ কাপুরের শ্রী চারশো বিশ, কিছুটা একদিন রাত্রে, কিছুটা রোমান হলিডে থেকে খামচা মেরে তুলে নিয়ে চোখের জলে ভাল করে চটকে আবেগ কান্না মুখের ফোলা-ফোলা রাধাবল্লভী তৈরী করতে খুব দেরী হল না। সেই সঙ্গে একটু এ্যাকশন থাকছে রাধাবল্লভীর সঙ্গে ছোলার ডালের মত। ব্যাপারটা যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন বারোখানা সুপারহিট গান বম্বের মহম্মদ রফি এবং কিশোরকুমারের উত্তরাধিকারীরা গেয়ে ফেললেন। সেখানে গিয়ে রেকর্ড করে আনা হল। লেখকের পাঁচশো এ্যাডভান্স দিয়ে বলা হল বাকিটা রিলিজের আগে দেওয়া হবে। দেয় অঙ্ক হল পাঁচ হাজার। আর হরিমাধব নিলেন দু'হাজার। এতেই তিনি সন্তুষ্ট। গল্প নিয়ে পরিচালক টালিগঞ্জের পেশাদার চিত্র-নাট্যকারদের কাছে ছুটলেন। তার আগে ইস্পাতে আইনসঙ্গত করিয়ে নেওয়া হল।

ব্যবসার তৃতীয় ধাপ শেষ হল। এখন পর্যন্ত পরিচালক প্রযোজকের সম্পর্ক খুব ভাল। এন. টি. ওয়ানে একটা ঘর নেওয়া হয়েছে। সেখানে চা-কফি-টোস্ট উড়ছে। প্রযোজক রোজ বিকেলে গিয়ে খবর নিচ্ছেন। চিত্রনাট্য শেষ। তিনবার পড়া হল। ইতিমধ্যে গল্প সম্পর্কে বড় বোদ্ধা হয়ে গেছেন প্রযোজক। এই করুন, ওই করুন, না না, নায়ককে দিয়ে এটা করাতেই হবে, এসব উপদেশ অবিরাম দিতে লাগলেন। পরিচালক, যাঁর নাম ক-বাবু, ঢোক গিলতে লাগলেন। মানতে পারছেন না কিন্তু এতদিন লুকিয়ে আছেন যেন এখন অবাধ্য হলে কাজটা চলে যেতে পারে। মনে মনে ঠিক করলেন শুটিং করবেন তিনি, ফ্লোরে দেখা যাবে। ভাল ক্যামেরাম্যান, এডিটার ইত্যাদি নির্বাচিত হয়ে গেলেন। এবার শিল্পী, নায়ক বলতে তো তাপস পাল আর প্রসেনজিৎ। একটু বড়সড় চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক। এদের ডেট পাওয়াই মুস্কিল। কেউ কেউ তিন শিফ্‌টে কাজ করেন। পরিচালক প্রস্তাব দিলেন নতুন মুখের। খেকিয়ে উঠলেন প্রযোজক, 'জলছবি করতে আসিনি মশাই। ওই যারা আর্ট-ফিল্ম বানিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরাই বাজায়, আমাকে কি তাদের দলে ভেড়াতে চান।' অতএব দুজনের একজনকে কোন মতে পাওয়া গেল। এবার নায়িকা। টালিগঞ্জে সাড়ে তিনজনের বেশী নায়িকা নেই। প্রযোজক বললেন, 'বম্বে থেকে নিয়ে আসুন। ওখানকার থার্ড হিরোইনকে এখানকার পাবলিক

লুফে নেবে।' কিছুদিন বম্বেতে থাকা হল। তাদের রেট জানার পর মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। শেষে ওই সাড়ে তিনজনের একজনকে নেওয়া হল। সঙ্গে টালিগঞ্জের যত শিল্পী আছেন সবাইকে এক থেকে তিরিশ মিনিটের রোলে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। অতগুলো গান বাপী লাহিড়ীর মিউজিকে ইতিমধ্যে হইচই ফেলে দিয়েছে। ধুমধাম করে মহরৎ করে ফেলা হল। তার ছবি বের হল প্রসাদ আর আনন্দলোকে।

আজকাল দৈনিক পত্রিকার সিনেমার পাতাগুলো আর গুরুগম্ভীর নয়। সেখানেও ছবি আর সেই সঙ্গে ফিচলেমি ছাপা হয়ে গেল।

শুটিং শুরু হল। মারবার কাটকাট ব্যাপার। প্রযোজকের লাখ পাঁচ-ছয় উড়ে যেতে সময় লাগল না বেশী। যত পকেট খালি হয়ে যাচ্ছিল ভদ্রলোকের গলার স্বর তত মিনমিনে হচ্ছিল। ছবির কাজ অর্ধেক হবার আগেই তিনি ঘুরতে লাগলেন ধর্মতলা পাড়ায়। এখানে ছবির ব্যবসার পরবর্তী পর্যায় নিয়ন্ত্রিত হয়।

টালিগঞ্জে যাঁরা ছবি করতে আসেন তাদের খুব কম মানুষের পকেটেই হলে প্রিণ্ট নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত খরচের টাকা থাকে। প্রযোজক এবং হলের মাঝখানে তাই বসে আছেন ডিস্ট্রিবিউটার। এঁদের কাজ ছবি বিভিন্ন হলে দেখিয়ে কমিশন নিয়ে প্রযোজককে টাকা ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ এঁদের মাধ্যমেই প্রযোজকের ঘরে টাকা আসে। এঁরা কর্মচারী রাখেন। তারা হলে হলে প্রিণ্ট নিয়ে যায়। বিক্রীর হিসাব নিয়ে আসে। হলের মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখার দায়িত্ব এদের। ছবির শুরুতে চট করে হল পাওয়া যায় না। কালো টাকার খেলাও খেলতে হয়। এতসব ঝামেলা যিনি সহ্য করেন সেই ডিস্ট্রিবিউটার আর একটু এগোন। তিনি ছবি বুঝে প্রযোজককে টাকা দেন আগাম। তাই দিয়ে ছবি শেষ করা হয়। ছবির বিক্রী থেকে সেই টাকা সুদ সমতে আগে তুলে নেন ডিস্ট্রিবিউটার। এসব ক্ষেত্রে তাঁর কমিশনের টাকাও বাড়ে। আমাদের প্রযোজক এ দরজা সে দরজায় যত ঘুরছেন তত তাঁর গলার আওয়াজ নামছে। এক নম্বর ডিস্ট্রিবিউটার বললেন, 'আপনি ক-বাবুকে দিয়ে পরিচালনা করাচ্ছেন? ও ছবির কিছু বোঝে? চলবে না মশাই এই ছবি।' দুই নম্বর মাথা নাড়লেন, 'ওকে হিরোইন নিয়েছেন? কি আছে ওর। মুখে ব্রনের দাগ। বোম্বে থেকে ফারহা দীপিকা পুনমকে আনতে পারেননি? তৃতীয়জন বললেন, 'সব ঠিক আছে কিন্তু গল্প বদলাতে হবে।'

'গল্প?' প্রযোজক হতভম্ব।

'হ্যাঁ মশাই। গল্পটা কার?'

প্রযোজক নাম বললেন। ডিস্ট্রিবিউটার মাথা নাড়লেন, 'ও কিছু মনে করবে না। তাছাড়া কে কি মনে করল তা ভাবলে ব্যবসা করা যায় না। নায়ক যখন শহরে এসে ভ্যাম্প গার্লের খপ্পরে পড়ল, তখন নায়িকার ওপর অত্যাচার বাড়াতে হবে। আর নায়কের মা খবর না পেয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। পথে পথে আকুলি বিকুলি করবেন। এই সময় নায়িকার সঙ্গে তার দেখা হবে। কেউ কাউকে

চেনে না। সেই রাত্রে ভিলেন ঢুকবে নায়িকার ঘরে। তাকে রেপ করতে চাইবে। একটু এ্যাডাল্ট সিন রাখুন। নায়কের বিধবা মা নায়িকাকে বাঁচাবেন। কিন্তু নিজে আহত হবেন ভিলেনের হাতে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। নায়ক খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখবে নায়িকা তাঁকে রক্ত দিচ্ছে। মায়ের খুনের বদলা খুন দিয়ে নোব এমন জ্বালাময়ী সংলাপ বলে নায়ক ছুটবে ভিলেনকে মারতে। বম্বে থেকে ফাইট মাস্টার আনুন। হেভি ফাইট। ভিলেনকে মেরে নায়ক আসবে হাসপাতালে। এসে গান গাইবে, 'মা তোমার ঋণ আমি বুক ভরে নিলাম, তোমার পেটে জন্মে আমি তোমার জীবন দিলাম।' এই গানের সঙ্গে ডাক্তার মাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। ঝড় বৃষ্টি দেখান এই সঙ্গে। শেষে মা বেঁচে গিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দেবেন। এই সময় গোটা তিনেক বাম্পার ডায়লগ থাকবে। ছবি সুপার-সুপার হিট হয়ে যাবে।'

প্রোডিউসার মিন মিন করে বললেন, 'ছবির শেষের কয়েকটি সিন তোলা হয়ে গিয়েছে।'

'ফেলে দিন। কয়েকটা সিনে কি এক্সট্রা খরচ হবে। শুনুন মশাই, আপনি ক -বাবুকে নিয়ে কালই আমার কাছে চলে আসুন। রপ্তানি ছবির ব্যবসায় নামলে আমি তাকে সাহায্য করে থাকি। তবে হ্যাঁ, আমার কথা শুনে চলতে হবে এখন থেকে।'

অতএব পরদিন পরিচালক ক-বাবুকে নিয়ে প্রযোজক এলেন ধর্মতলা পাড়ায় ডিস্টিবিউটারের ঘরে। হিসেব-পত্তর করা হল। এখনও ফার্স্টপ্রিন্ট বের করতে বারো লাখ টাকা লাগবে। এর মধ্যে অনেক খরচ হয়েছে এ্যাকাউন্টে। সেই ধার মেটাতে হবে। ডিস্ট্রিবিউটার বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না। আসুন, চুক্তিপত্রে সই করি।'

প্রযোজক চুক্তিপত্র পড়লেন। তার টাকে ঘাম বের হল। লেখা হয়েছে যেহেতু পুরো ছবির বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ ডিস্ট্রিবিউটার দিচ্ছেন তাই ছবির বিক্রী থেকে তার অংশের টাকা এবং সুদ তিনি আগে তুলে নেবেন। এইসময় প্রযোজক কিছু পাবেন না। তারপর শতকরা তিরিশ হারে কমিশন কেটে নিয়ে তিনি প্রযোজককে টাকা ফেরত দিবেন। ডিস্ট্রিবিউটারের টাকা বলতে এখন যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে দশ-বারোটি প্রিন্টের খরচ, বিজ্ঞাপন, হল ডেকোরেশন থেকে আরম্ভ করে ছবি চালাতে যা যা দরকার হবে, সমস্ত খরচ ধরা হবে। এছাড়া যেহেতু ছবির তৈরীর সময় ডিস্ট্রিবিউটারের অনেক টাকা লগ্নী হচ্ছে, তাই ছবির গঠনের সময়ে তিনি মতামত দিলে তা প্রযোজক মানতে বাধ্য হবেন।

সই-সাবুদ হয়ে গেল। ডিস্ট্রিবিউটারই সর্বেসর্বা। তিনি তাঁর মন রেখে চলার চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে গালাগাল খান। স্টুডিওর ঘরেই সেটা চলে। ক-বাবু বলেন, 'মানে সময়টা তো রাত, তাই রেপ করার সময় ভিলেনের চোখে গগল্স রাখা কি উচিত হবে?' 'উচিত? আপনি আমাকে উচিত অনুচিত জ্ঞান দিচ্ছেন?

এইজন্যে আপনার কিছু হল না, মশাই। হিট ছবি তো দ্যাখেন না। আপনাকে পরিচালক রাখাই ভুল হয়ে গেছে।'

ক-বাবু অপমানিত বোধ করলেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন। এভাবে কথা বললে আমি ছবি শেষ করব না।'

'শেষ না করলে ছেড়ে দিয়ে যান।'

'তাও যাবো না। আমি ইম্পার কাছে অভিযোগ করব। দেখি, আমাকে বাদ দিয়ে আপনি কিভাবে ছবি শেষ করেন।' ক-বাবু ফুঁসতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটারের ব্যবহার পাল্টে গেল, 'আরে, আপনি দেখছি প্রেসারের রুগী। অল্পেই ক্ষেপে যান। শুনুন, রেপ হচ্ছে ঘরে। সময় রাত। আর বাংলা ছবিতে ঘরের মধ্যে রাতদিন কি আলাদা চেনা যায়? সবই তো এক লাইট। অন্ধকারে রেপ করালে পাবলিক দেখতে পাবে না। আলো আপনাকে জ্বালাতেই হবে। ঠিক কিনা?'

'তাতে কি হয়েছে?' ক-বাবু জানতে চাইলেন রাগত ভঙ্গীতে।

'ওই আলোটাই তো সব। আলো থাকলে গগল্‌স থাকবে। আপনি রঙিন চশমার কাচে নায়িকার শরীর-টরির দেখালে সেন্সর কাঁচি চালাতে পারবে না। এই সময় যখন নায়কের মা নায়িকাকে বাঁচাতে আসবে তখন টানাহেঁচড়ায় গগলস পড়ে যাবে মাটিতে। নায়কের মাকে আহত করে ভিলেন পালাবে। তারপর যখন নায়ক ঘটনাস্থলে আসবে, তখন দেখতে পাবে গগল্‌সটাকে। ওটাই হয়ে যাবে ক্লু। ওইটে নিয়ে যখন সে ভিলেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন ডায়লগ যে দেব, তাতে হল হাততালিতে ফেটে পড়বে, মশাই। বুঝেছেন?'

ক-বাবু কান চুলকালেন, 'আইডিয়াটা অবশ্য ভাল। তবে ডায়ালগ দেবেন মানে?'

ডিস্ট্রিবিউটার এমন ভঙ্গীতে পাথর হয়ে বসে-থাকা প্রযোজকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, যাতে মনে হতেই পারে, নাবালকের প্রশ্ন শুনলেন। তিনি বললেন, 'আরে, চল্লিশ বছর ছবি করছি। ছবির পরিবারে জন্ম।'

'প্রমথেশ বড়ুয়াকে কাজ করতে দেখেছি। যাক্‌গে, মাথার ভেতর সেইসব সংলাপ বসে গেছে, যা উগরে দিলে পাবলিক গিলবে।'

প্রযোজক এতক্ষণে কথা বললেন, 'এই পরিস্থিতিতে, মানে গগল্‌স হাতে নায়ক ভিলেনের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলতে পারে?'

ডিস্ট্রিবিউটার চোখ বন্ধ করলেন বিশ সেকেন্ড। তারপর সেই অবস্থায় বললেন, 'লিখে নিন। দুবার বলতে পারব না।'

পরিচালক কাগজ-কলম নিয়ে তৈরী হলেন। ডিস্ট্রিবিউটার চোখ খুললেন। সেই চোখ একটু একটু ছোট হয়ে এল। শুধু সংলাপ নয়, নায়কের এক্সপ্রেশন পর্যন্ত তিনি দিতে আরম্ভ করলেন, 'আরে, এ কমিনোকে বাচ্চে। এটা কার গগল্‌স?'

ভিলেন ঘাবড়ে তাকাল, 'আমার না।'

'ঝুট! মিথ্যে কথা। এই গগল্‌সের রঙিন কাচে যে জিন্দেগী দ্যাখে, তার কাছে

রঙিন মনে হয়, কিন্তু দুনিয়ার সাদা চোখের মানুষের কাছে সেটা সাদাই।' এই অবধি বলে নায়ক গগল্‌স ছুঁড়ে দেবে ভিলেনের দিকে।

টেবিলে পড়ে তার কাচ ভাঙবে। ভাঙা গগল্‌সের ক্লোজআপ। ওই ডায়ালগে পাবলিক যে হাততালি দেবে, সেই সময়টা এইখানে খেয়ে যাবে।

ভিলেন উঠে দাঁড়াবে, 'বিশ্বাস কর আমি কিছু করিনি।'

এক লাফে নায়ক টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দুটো পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। ক্যামেরা তার পেছন থেকে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ভিলেনের মুখ চার্জ করবে। কম্পোজিশনটা ভাবুন। নায়ক বলবে, 'করিসনি ? যে মায়ের বুকের দুধ এই শরীরকে বড় করেছে সেই মায়ের গায়ে হাত তুলেছিস তুই।' বাদাম করে ভিলেনের মুখে একটা ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট ডায়ালগ, 'যে মেয়ে আমার আত্মার আত্মীয়, যে আমাদের বংশের কুলবধূর সম্মান পেতে যাচ্ছে, তার শরীর অপবিত্র করতে গিয়েছিলি তুই।' টিসুম করে দ্বিতীয় ঘুষি পড়বে। আর তারপর চিৎকার করে উঠবে, 'ঝুট ঝুট। বিলকুল ঝুট।'

'এ দুনিয়া থেকে তোর মত ঝুট মানুষকে ওই গল্‌লসের মত ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে না দিলে আমার মায়ের বদলা নেওয়া হবে না।' লিখেছেন ?

ঘরে তখন সুচ পড়লেও শোনা যাবে। শেষ করা মাত্র দরজায় দাঁড়ানো মানুষেরা হাততালি দিয়ে উঠবে। প্রযোজক খুশীতে মাথা নাড়লেন, 'দারুণ! আপনি যে কেন ছবির সংলাপ লেখেন না। উঃ, কি ভাল।' ডিস্ট্রিবিউটার বললেন, 'এ্যাই হল পাবলিক বধ-করা সংলাপ।'

ক-বাবু লেখা শেষ করে বললেন, 'একটা প্রব্লেম হবে।'

প্রযোজক জানতে চাইলেন, 'আবার কি হবে ?'

'ডায়ালগে প্রচুর হিন্দী শব্দ এসে গিয়েছে।'

ডিস্ট্রিবিউটার মাথা নাড়লেন, 'ওটা ইচ্ছে করেই দিয়েছি। ওতে ফোর্স বাড়ে।'

'কিন্তু এটা তো বাংলা ছবি।'

'তাতে কি ? আপানার পাবলিক হিন্দী ছবি দ্যাখে। বাংলা ছবির প্যানপ্যানানি তাদের অনেকের পছন্দ হয় না। এদের তো হলে টানতে হবে। তাছাড়া আজকাল আমরা কথায় হিন্দী বলি না! ছেলেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'শোলে'র ডায়ালগ আওড়াতো না ? ওসব ভুলে যান। এ্যাকশন মানেই হিন্দীতে কথাবার্তা।'

'কিন্তু এর আগে নায়ক কখনও হিন্দী শব্দ বলেনি।'

'তখন তো এ্যাকশন করেননি। আর দু-একটা শব্দ ডাবিং-এর সব ঢুকিয়ে দিন। মোটমাট ব্যাপারটা দাঁড়াল কেমন ?'

'ওয়াভার ফুল।' ক-বাবু হাসলেন।

'এই দেখুন। আপনি সাগর-পারের শব্দ বাঙালী হয়ে বলে ফেললেন আর হিন্দী তো দিশি ভাষা। সেটা তো নায়ক বলতেই পারে। এই যে প্রোডিউসার সাহেব, টাইটেলে একটা কার্ড দেবেন, এফেক্ট ডায়ালগ, আমার নাম।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' মাথা দোলালেন প্রযোজক।

অতএব ছবি দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে গেল। প্রযোজক ইদানীং কম আসেন স্টুডিওতে। ডিস্ট্রিবিউটার নিয়মিত। রেপ আছে, তা নায়িকা জানতেন না। প্রথম চুক্তির সময় রেপ ছিল না, তাই তাঁকে বলাও হয়নি। শোনামাত্র তিনি মাথা নাড়লেন, 'অসম্ভব। কি ভেবেছেন আমাকে? আমার ইমেজ আছে বাঙালীর নিজস্ব ঘরোয়া মেয়ে হিসেবে পাবলিকের কাছে। রেপ আছে জানলে ছবি নিতামই না।'

ক-বাবু বললেন, 'খুব সাবধানে নেব, ম্যাডাম। কোন অশ্লীলতা থাকবে না। এখন এই রেপটা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

'ইম্পসিবল। আমার দ্বারা সম্ভব নয়'—নায়িকা মাথা নড়লেন।

'কি বলছেন? এখন কি পিছিয়ে যাওয়া যায়! ওই দেখুন, রাতের রানী ছবির নায়িকাও রেপড হয়েছে।'

'রাতের রানী? ও তো শরীর দেখাবার জন্যে ফিল্মে এসেছে। টি.ভি. সিরিয়ালেও সেটা করতে বাদ দিচ্ছে না। আপনি ওর সঙ্গে আমার তুলনা করছেন? ও অভিনেত্রী?'

ক-বাবু যখন দিশেহারা, ঠিক তখন ডিস্ট্রিবিউটার হাল ধরলেন। একদিন কথা বলে তিনি নায়িকাকে রাজী করিয়ে ফেললেন। রেপের সময় যখন মুখ দেখানো হবে তখন তিনি থাকবেন। শরীর দেখানোর সময় অন্য কোন এক্সট্রা গার্লকে ব্যবহার করা হবে যার ফিগার ভাল। কিন্তু ভিলেন যখন তাকে ধরবে, তখন নায়িকা চিৎকার করবে, একটা সংলাপ বলে, 'পুরুষের লালসার আগুনে আমরা বাঙালী মেয়েরা আর পুড়ে মরব না। আপনি আমার মৃতদেহ স্পর্শ করবেন, আমাকে না।' ছবি শেষ হল। এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটল। একজন সহকারী পরিচালক খুব অন্যায় করেছিলেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন থেকে আপত্তি উঠল। বরখাস্ত করলে ছবির কাজ করতে দেওয়া হবে না। মিটিং হল। অনেক হইচই। শেষ পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটারের কথায় প্রযোজক সন্ধি করলেন। পুরো টাকা দিয়ে সহকারী পরিচালককে বিদায় করা হল। তার নাম টাইটেল কার্ডে থাকবে।

এবার এডিটিং, রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি চলল। ছবি শেষ। এখন ডিস্ট্রিবিউটারের কাজ। ক-মাস ধরে সব কটা সিনেমার কাগজে ছবির পাবলিসিটি চলল। কলকাতার তিনটে হলে ডেট পেতে কিছু খরচ হয়ে গেল। চুক্তি হল, হল-মালিকদের সঙ্গে। যদি কোন সপ্তাহে হল ভাড়ার নীচে বিক্রী হয় তাহলে ছবি তুলে নিতে হবে। মফঃস্বলের কাছাকাছি হলেও ছবি রিলিজ করা হল। ডিস্ট্রিবিউটারের ইচ্ছে ছিল না প্রেসকে বলতে।

সমালোচকরা যা লিখবেন, তা তো জানাই আছে। কিন্তু নিয়ম মানতেই হল। প্রথম দু'দিনের টিকিট ডিস্ট্রিবিউটার কিনে নিলেন। পরিচিত জনের মধ্যে সেগুলো বিলিয়ে দিয়ে হাউসফুল বোর্ড ঝোলালেন। পাবলিক ফিরে গেল। তৃতীয় দিন থেকে ব্ল্যাকাররা ভিড় করল। এক সপ্তাহের মধ্যে বোঝা গেল ছবি সুপারহিট। ছবির গান আর সংলাপ পাবলিকের মুখে ঘুরছে।

এই ব্যবসার শেষাংশ আরও চমকপ্রদ। কু-লোকে বলে ছবি ব্যবসা করেছে আশি লক্ষ টাকার। প্রযোজক ফেরত পেয়েছে বারো লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তিনি যে টাকা লগ্নী করেছেন তার দ্বিগুণ পেলেন তিন বছর বাদে। ডিস্ট্রিবিউটার হিসেব দিলেন পঞ্চাশ লাখের বেশী ব্যবসা হয়নি। তাঁর নিজস্ব টাকা, কমিশন এবং খরচ বাদ দিয়ে প্রযোজক বারো লাখের বেশী পেতে পারেন না।

প্রযোজক ব্যাপারটা ততদিনে বুঝে গিয়েছেন। ছয়ের বদলে তিনি বারো পেয়েছেন এটা তাঁর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। নব্বই ভাগ প্রযোজক ছয়ের বদলে একও পান না।

সিলভার জুবিলি থেকে স্বর্ণ জয়ন্তীতে ছবি যখন পড়ল তখন তিনি একটি উৎসব করলেন। সবাইকে ঘড়ি দেওয়া হবে। এমন কি ডিস্ট্রিবিউটারকেও। উৎসবের সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক বার বার প্রযোজক এবং পরিচালককে অনুরোধ করছিলেন, বাকী টাকা মিটিয়ে দিতে। তিনি মাত্র পাঁচশো টাকা পেয়েছেন ছবির শুরুর সময়। প্রযোজক বললেন, 'বড্ড জ্বালাচ্ছেন। ছবির গল্প সংলাপ সব লিখেছি আমরা। শুধু নামের জন্য পাঁচশো দিয়েছি তবু আপনার মন ভরছে না। একটু বাদে পুরস্কার হিসেবে সবাই যখন হাতঘড়ি পাবে, তখন নিজেরটা নিয়ে চুপচাপ চলে যান।'

পাঠকের সঙ্গে মানুষটির আলাপ করিয়ে দিই। ইনি এই ছবির মূল কাহিনীকার, বাংলা ভাষার একজন লেখক।

সাত

আমাদের পাড়ার শিবু ঘোষ এখন ফিল্ম লাইনে ভাল টাকা করেছে। প্রথমে ট্রাম বাস তারপর ট্যাক্সি শেষে পুরনো মডেলের এ্যাম্বাসাডার চাপতে শুরু করেছিল। এখন একটা মারুতি ডিল্যাক্সে ওকে দেখি। এসব বদল হলেও শিবুর কথাবার্তা চালচলন বড় একটা পাল্টায়নি। ওর বাবার একটা কারখানা ছিল ভাল জায়গায়। কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় সেটি বন্ধ করে দিয়েছিলো ভদ্রলোক। অনেক চেষ্টা করেও শান্তি না আসায় একদিন হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়েছিল তাঁর। শিবু তখন কারখানা বিক্রী করে দিয়ে মোটা টাকা পেল। তার পড়াশুনা বেশী দূর নয়। কিন্তু কলকাতার জল পেটে থাকলে নিরক্ষর ছেলেও এসে পাশের ভঙ্গী করতে পারে। এই শিবু, বোধহয় লিখি বলেই, আমায় খানিক সমীহ করত। বাড়িতে আসত। একদিন তেমনি এসে বলল, 'দাদা ব্যবসা শুরু করছি।'

'কিসের ?' ভাবলাম আর-একটা কারখানা বোধহয় খুলতে যাচ্ছে।

'ফিল্মের। ঝটপট পয়সা আসবে। বাবার মত ঠুকুর ঠুকুর ব্যবসা করে আমার পোষাবে না। আমি নগদা-নগদি হাত গরমে বিশ্বাসী।'

বললাম, 'কিন্তু শিবু, ফিল্মের ব্যবসায় খুব ঝুঁকি আছে। অনেকে শেষ হয়ে গেছে।'

'না দাদা, আমি শেষ হবার জন্যে জন্মাইনি।'

এরপর বছর খানেক তার দেখা পাইনি। শুনেছিলাম ধর্মতলাস্ট্রীটে শেয়ারে টেবিল ভাড়া করে বসেছে শিবু। যেসব ছবি প্রোডিউসারের টাকায় কোন মতে শেষ হয়, ডিস্ট্রিবিউটার কোন আকর্ষণ বোধ করে না, প্রিণ্ট পাবলিসিটির অভাবে রিলিজ বন্ধ থাকে, সেইসব ছবিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছে সে। নিজের পয়সায় প্রিণ্ট পাবলিসিটি করিয়ে হলে ছবি রিলিজ করে। এই হলের ডেট পেতে যে ধরাধরির খেলা চলে, সেটা সে-ই খেলে। ছবির বিক্রী থেকে প্রথমে নিজের টাকা তুলে নিয়ে পরে প্রযোজককে টাকা ফেরত দেয় কমিশন কেটে রেখে। এক বছরে তিনটে ছবি রিলিজ করিয়েছে শিবু, কোনটাই তিন সপ্তাহের বেশী চলেনি। তার মধ্যে একটা অবশ্য ইন্ডিয়ান প্যানোরমায় নির্বাচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি হিসেবে। অবশ্য দর্শক দেখেনি। শিবুর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। বোধহয় পথে বসল ছেলেটা।

এই সময় শিবু ট্যাক্সিতে চলাফেরা করত। একদিন রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখি শিবু ট্যাক্সি থেকে ডাকছে। সে যাচ্ছে শ্যামবাজারে, সুবিধেই হল। কিছু বলার আগে শিবু বলল, 'এখন দাদা আমার নাম এ লাইনে শিবু বুকার। ডিস্ট্রিবিউটার হবার ক্ষমতা নেই তো। ডিস্ট্রিবিউটার হতে গেলে ছবির তৈরীর সময় প্রোডিউসারকে টাকা দিতে হয়। হিট হলে লাল হয়ে যায় ডিস্ট্রিবিউটার। আমি মরা ছবি নিয়ে ব্যবসা করছি, জ্যান্ত ছবি কে দেবে আমাকে?

'খুব লস হল তোমার?'

'না দাদা, আপনার আশীর্ব্বাদে এখনও বেঁচে আছি!'

'সেকি! তোমার ছবিগুলো তো চলেনি।'

'ঠিক কথা। প্রোডিউসার মরেছে কিন্তু আমি বেঁচে গেছি।'

শিবু আমাকে হিসেবটা বোঝাল। কালকাতার তিনটে হল আর দমদম গড়িয়ার দুটো হলে ছবি রিলিজ করিয়েছিল। ধরা যাক, তিনটে হলের সাপ্তাহিক ভাড়া ন'টাকা। তিন সাতে একুশটি শো হাউসফুল গেলে ট্যাক্স বাদ দিয়ে হল ভাড়া বাদ দিয়ে থাকবে আরও ন'টাকা। তা ওর ছবি হাউসফুল দূরের কথা প্রথম সপ্তাহ বারো টাকার ব্যবসা করেছিল, দ্বিতীয় সপ্তাহে দশ টাকার, তৃতীয়তে সাড়ে আট টাকার। ডেফিসিট কেটে হলের মালিক টাকা দেওয়ামাত্র সে ছবি তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাড়তি যে টাকা পাওয়া গেল, তা প্রিণ্ট পাবলিসিটির খরচ হিসেবে সে কেটে রেখেছে। এর ফলে প্রোডিউসার এক পয়সাও পায়নি। সে বলল, 'দাদা এই প্রোডিউসার কোন মতে ছবি শেষ করেই জানত পয়সা পাবে না। তাই ওদের নিয়ে দুঃখ নেই।'

'আর্ট ফিল্ম বানালে পয়সা আসে? আর যে দুটো কমার্শিয়াল ফিল্ম তার গল্প যেমন ডাইরেকশন, এ্যাক্টিংও তেমন। কলকাতার হল থেকে আমি কুড়ি ভাগ খরচ পাইনি, কিন্তু জেলার হলগুলোতে আন্ডার রেটে ছবি পাঠাচ্ছি। যা পাচ্ছি তাই ঘরে তুলছি।'

'প্রযোজক তার হিসেব রাখেন না?'

'পাবালা! বেলাকোবা কোথায় জানেন?'

'না।'

'তবে? সেখানে এক সপ্তাহ ছবি চললে তার হিসেব আপনি পাবেন?'

'তোমারই তো হিসেব দেবার কথা।'

'নিশ্চয়ই। দেব। দু'লাখ প্রিন্ট পাবলিসিটিতে গিয়েছে সেটা আগে তুলি, অফিস খরচ আছে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যে সুদ পেতাম তা উঠুক, তারপর যা আসবে তার ওপর কমিশন কেটে প্রোডিউসারকে ফেরত দেব।'

'শেষ পর্যন্ত প্রোডিউসার কত পাবে বলে তোমার মনে হয়?'

'বিশ পঁচিশ হাজার পেলে চৌদ্দ পুরুষের পুণ্য।'

'লোকটা তো মরে যাবে হে!'

'দাদা, যারা এদের টুপি পরিয়ে ফিল্ম প্রোডিউস করতে নামায়, দোষটা তাদের। আর জেনে-শুনে সেই টুপি যারা পরে তাদের জন্যে কোন মায়া-মমতা নেই।'

আমি আর কিছু বলিনি। সত্যি কথা, যার ব্যবসা সে ভাল বুঝবে। শিবু যদি আগে নিজের টাকা তুলে নিতে চায়, তাহলে তাকে দোষ দিতে পারি না।

শিবুর সঙ্গে আমার দেখা মাস ছয়েক বাদে। এক প্যাকেট সন্দেশ নিয়ে এল সে। হেসে বলল, 'দাদা, একটা ছবি পেতে যাচ্ছি।'

'কিভাবে?'

'এক বোম্বাইয়ের প্রোডিউসার বাংলা ছবিতে টাকা ঢালতে চায়। আমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে। বাজেট বেশী নয়, কিন্তু খারাপও না। ডিস্ট্রিবিউটার চায় না। বলেছে, 'শিবু, বুকার তুম হামারা বিজনেস দেখভাল করো।'

'এ তো খুব ভাল কথা।'

'কিন্তু আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে সঞ্জিতদার আলাপ আছে। বলে-টলে ডেট পাইয়ে দিন না। এখন তো ওঁকে ছাড়া ছবি চলে না।'

সঞ্জিত বাংলা ছবির একজন সফল নায়ক। প্রথম দিকে খুব পাত্তা পায়নি এখন অবস্থা বদলেছে। খুব ভদ্র ছেলে। আমার সঙ্গে যথেষ্ট সখ্যতা আছে। কিন্তু তবু আমি ইতস্তত করছিলাম। শিবু ঘোষ সেটা বুঝেই বলে ফেলল, 'আমাকে ওই বাজেটের মধ্যে ছবিটা করিয়ে নিতে হবে। না পারলে ছবি হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি গেলে সঞ্জিতবাবু হেভি টাকা চাইবে, ডেটও দেবে না। বাঙালী যুবক ব্যবসায় নেমেছি, আপনি আমাকে বাঁচাবেন, দাদা?'

অগত্যা সঞ্জিতকে ফোন করলাম। শুনলাম, সে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুটিং করছে। শিবুকে বললাম সে কথা। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যদি

আমার সঙ্গে একবার ওখানে যান তাহলে কি ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে?'

বললাম, 'না শিবু, আমার যাওয়া ঠিক হবে না।'

কিন্তু এমনই কপাল সঞ্জিতকে টেলিফোনে ধরাই যাচ্ছিল না। এদিকে বাড়িতে রোজ মিষ্টির প্যাকেট আসছে। নিষেধ রাগারাগিতেও কোন কাজ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত প্রায় বাধ্য হয়েই শিবুর সঙ্গে স্টুডিওতে গেলাম। এর আগেও লক্ষ্য করেছি স্টুডিওর ফ্লোরে যখন নানান ছবির শুটিং হয়, তখন একটা চাপা রাখো-ঢাকো ভাব থাকে পরস্পরের সঙ্গে। ফ্লোরে ঢোকার সময় কাকে চাই, কেন চাই ইত্যাদির প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। শিবু সেসব সামলে ভেতরে নিয়ে গেল। তখন শট নেওয়া হবে। পরিচালক সাইলেন্স বলে ধমকে উঠলেন। আলো জ্বলছে। সঞ্জিত দুই আঙুলে চিবুক তুলে বলল, 'তুমি কেন আমাকে বারংবার ভুল বোঝ? পৃথিবী রসাতলে গেলেও এই আমি তোমার।' সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা ঠোঁট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?' পরিচালক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কাট। লাইটস অফ।'

যেন রাজ্য জয় করা হয়ে গেছে, এমন ভঙ্গীতে শুটিং জোন থেকে বেরিয়ে আসছিল সঞ্জিত, পেছনে ব্যস্ত পরিচালক। সঞ্জিত বলছিল, 'না, না, আপনার সঙ্গে কথা ছিল হাফ শিফ্‌ট কাজ করব। ওদিকে এক নম্বরে 'প্রাণ চায়' ছবির সবাই আমার জন্যে বসে আছে। আর আমাকে বলবেন না।'

অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে সঞ্জিত বেরিয়ে আসছিল সদর্পে। এই সময় সে আমাকে দেখতে পেল, 'আরে আপনি?'

'তোমার খোঁজে আসতে হল।'

'আসুন আসুন।' সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তার মেকআপ রুমে। সেখানে বসে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এখন কেমন ব্যস্ত?'

'খুব। দিনে তিন শিফট করে কাজ করছি।'

'ও।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার ভাই-এর মত এই ছেলেটি। ছবি করছে। তুমি যদি ওকে একটু সাহায্য কর তাহলে ওর উপকার হয়।'

সঞ্জিত শিবু ঘোষকে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, 'আপনি ভাই কাল সকালে সাড়ে সাতটায় আমার বাড়িতে আসুন। দাদার গল্প?'

শিবু কিছু বলার আগেই আমি মাথা নাড়লাম, 'নাহে। এখন চলি, তুমি তো আবার একটা কাজে বেরুবে।'

শিবু খুব বিগলিত। এর তিন দিন বাদে সঞ্জিত নিজেই আমাকে টেলিফোনে জানাল, সে তারিখ দিয়েছে।

ছেলেটির কথাবার্তাই তার ভাল লেগেছে। আমার কথা মনে রেখে সে এখন যা নেয় তার অর্ধেকে কাজ করে দেবে। শিবুকে আমি আর দেখতে পাইনি অনেকদিন।

হঠাৎ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম অমুক রাম আগরওয়াল প্রযোজিত অমুক ছবি মুক্তি পাচ্ছে, বুকিং শিবু ঘোষ। রিলিজের আগের দিন শিবু এল বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে, 'দাদা, আশীর্দাদ করুন যেন পার হয়ে যাই।'

'ছবি কেমন হল ?'

'আপনার ভাল লাগবে না তবে পাবলিক খাবে।'

'কিশোরের চারখানা গান আছে, ফাইট আছে, মায়ের কান্না আর প্রেমিকার আত্মত্যাগ এসবই আছে। দেখা যাক। আপনি আসুন প্রেস শোয়ে।'

যেতে পারিনি কাজ থাকায়। তবে তার পরের সোমবার হলের সামনে হাউসফুল বোর্ড ঝুলতে দেখলাম, ম্যাটিনি ইভনিং নাইট। পরের সপ্তাহে কাগজে সমালোচনা বের হল খুব বাজে ছবি বলে। কিন্তু আমার বাড়ির কাজের মেয়েটি এর মধ্যে দুবার দেখে এসেছে ছবিটা। শিবু একদিন এ্যাম্বাসাডার চড়ে আমার কাছে এল। এসে বলল, 'দাদা, মনে হয় উতরে গেছি। প্রথম দিন এ্যাডভান্স খুলে দেখি মাছি তাড়াচ্ছে। ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল। পাঁচটার বদলে ন'টা প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছে প্রোডিউসার, পাবলিসিটির খরচ বেড়েছে। শেষে নিজেই তিনটে হলের ম্যাটিনি ইভনিং টিকিট এ্যাডভ্যান্স কেটে নিয়ে হাউসফুল বোর্ড ঝুলিয়ে দিলাম।'

'সেকি ? নিজের পয়সায় টিকিট কিনলে, হল ফাঁকা গেল ?'

না না। সব টিকিট আত্মীয়স্বজন সেলসট্যাক্স ইনকামট্যাক্সের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। কিছু পাবলিক শো-এর আগে গিয়ে টিকিট না পেয়ে পরের দিনেরটা এ্যাডভান্স কেটে ফিরে গেল। এখন দাদা ছবি লেগে গিয়েছে।'

'তোমার কেমন থাকবে ?'

'এইভাবে যদি চলে তাহলে কলকাতা থেকেই প্রিন্ট পাবলিসিটি উঠে যাবে। লাখ পঞ্চাশের বিজনেস যদি করে তাহলে আমি পাব সাড়ে সাত লক্ষ।'

'পাবে মানে ? হেভি প্রফিট করবে। সব টাকা দেবে ওকে ?'

'না দিয়ে উপায় নেই। ওর লোক রোজ বসে থাকে আমার অফিসে।'

ভাবলাম, একটা বাঙালী ছেলে নিজের জোরে পায়ের তলায় মাটি পেল। এ লাইনের সব নিয়মকানুন শিখে ফেলেছে সে। কিন্তু বিস্ময় আরও অবশিষ্ট ছিল আমার জন্যে।

মাস ছয়েক বাদে শিবু এল এ্যাম্বাসাডার চেপেই মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে। বললাম, 'তুমি মিষ্টি আনো কেন বল তো ? ওটা আমি একদম খাই না।'

'কাউকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনার বাড়িতে এটা হাতে নিয়ে এলে আমার খুব কাজ হয়। লাকি ব্যাপার বলতে পারেন।'

'তাহলে ফিল্ম করে এখন তুমি বড়লোক।'

'না-না। এ তো সামান্য। দাদা, এবার ভাবছি নিজেই ছবি করব।'

'মানে ?'

'প্রোডাকশন-ডিস্ট্রিবিউশন আমার। অজিত গুহকে সাইন করিয়েছি।'

'সে আবার কে?'

'ওঃ, আপনি কোন খবর রাখেন না। টপ হিট ডিরেক্টার। আমার খুব ইচ্ছে আপনার গল্প নিয়ে ছবি করার। তবে এখনই না। দুটো ছবির পর।'

হেসে বললাম, 'কেন?'

'না, দুটো হিট হবার পর একটা ফ্লাপ করানো উচিত।'

'আমার গল্প নিলে ফ্লপ হবে ভাবছ কেন?'

'দাদা, রাগ করবেন না। আপনি সাহিত্য লেখেন। ফিল্মের জন্য তো গল্প লেখেন না। এটা আলাদা, ওটা আলাদা।'

'তোমার এই গল্পের লেখক কে?'

লজ্জায় মুখ নামাল শিবু, 'আজ্ঞে, আমিই।'

'তুমি গল্প লেখ নাকি?'

'না দাদা, কক্ষনো না। সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। ধরুন, একটা সুখের পরিবার। তিন দাদা, দুই বউদি, মা, বোন আর অবিবাহিত ভাই। বউতে বউতেও খুব ভাব। হঠাৎ বড় ভাই লটারির প্রাইজ পেল। পাঁচ লাখ। মানুষটা ভাল। সংসারের জন্যে টাকাটা খরচ করতে চায়। কিন্তু স্ত্রী রাজী নয়। এই নিয়ে দুই বউতে মন কষাকষি। ছোট ভাইকে সবাই যে যার দলে টানতে চাইছে। মা নির্দল। ছোট বোন প্রেম করছে একটা লাফাঙ্গার সঙ্গে। ছোট ভাই গান গায়। তার সঙ্গে একটা বড়লোকের মেয়ে প্রেম করতে চাইছে। মানে একেবারে পারিবারিক সোস্যাল ড্রামা। ঘরে ঘরে যা হয়। তার সঙ্গে আছে ছোট ভাই-এর সঙ্গে বোনের লাফাঙ্গা প্রেমিকের ফাইট। সেই বদমাস মেয়েটাকে আরবে পাচার করতে চেয়েছিল। আউটরাম ঘাটের জেটিতে শুটিং করবো ফাইটিংটার। বোনকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করবে হিরো। তার প্রেমিকা ভুল বুঝে সিমলায় চলে যাবে বাবার পছন্দ-করা ছেলেকে বিয়ে করতে। সেখানে বরফের ওপর আর একটা ফাইটিং। এবার প্রেমিকার ভাবী স্বামীর সঙ্গে। এদিকে দুই ভাই পরস্পরকে সহ্য করতে না পেরে আলাদা হয়ে গেল। মা নামল পথে। প্রচণ্ড জ্বর। শুধু ছোটছেলের নাম করছে আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কী জল কী জল! নায়িকার ভাবী স্বামীকে পিটিয়ে হিরো একাই কলকাতায় ফিরে মাকে না পেয়ে আকাশবাণীতে গিয়ে গান গাইতে লাগল। সেই গান রাস্তার রকে শুয়ে জ্বরগ্রস্ত মা শুনল, কুটিল মেজদা মেজবউদি শুনল, মহান বড়দা আর বড়বউদিও। এমন কি নায়িকাও। সিমলায় কলকাতা রেডিও ধরা যায় না। ভাবছি রেডিও না করে দিল্লীর টি. ভি. করে দেব। দিল্লী প্রোগাম সারা দেশে একসঙ্গে শোনা যায়। এবার শেষটা। ওইটে একটু করে দিন দাদা?'

হেসে বললাম, 'বেশ তো লিখছ। বাকিটাও লিখে ফেল না।'

'একটু গোলমাল হচ্ছে। মেজদাকে করেছি অসৎ পুলিশ অফিসার। ঘুষ নেয়,

হৃদয় নেই। শেষে তাকে সততার পথে ফেরাবো। নায়ক শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাবে। একদম শেষে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

দয়ালু বড়দা তখন সবাইকে নিয়ে ওদের কাছে আসবে। মা বলবে, 'আমি আদেশ করছি, তুই রমাকে বিয়ে কর।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'রমা কে?'

'ওঃ, রমা হল সেই বড়লোকের মেয়ে। যার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

'ও। তারপর।'

'শেষ দৃশ্য। রমা এগিয়ে আসছে। হিরো এগোচ্ছে। একটা স্বপ্নের দৃশ্য। ধোঁয়া ধোঁয়া চারধার। আ যা রে টাইপের গান।'

'এ ছবি দর্শকের ভাল লাগবে?'

'একশবার। শরৎচন্দ্র থেকে সবাই নিয়েছে। একসময় খোকন দাস ওই লাইনে হিট করে গিয়েছিল। এখন বিজন চৌধুরীর অবস্থা জানেন? লাখ টাকায় গল্প বেচে। এই একই ফর্মুলা। ভাবছি ওকে দিয়ে সংলাপ লেখাবো। চোখা-চোখা সংলাপ।'

শিবু ঘোষ তারপর দীর্ঘদিন আসেনি। এবার এল মারুতি চেপে। হেসে বলল, 'ছবি শেষ। পরশু সেন্সর হবে। সামনের সপ্তাহে রিলিজ। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। যখন সব ভাগাভাগি হয়ে গেল তখন মায়ের মুখে একটা সংলাপ থাকা দরকার। খুব ইমোশনাল। ওটা নেই ছবিতে। মনে হচ্ছে না থাকলে পাবলিক পাম্প খাবে না।'

'কি আর করবে। সব যখন শেষ।'

'না দাদা, আজ দুপুরে রেকর্ডিং করে লাগিয়ে দেব।'

'লাগিয়ে দেবে মানে? কোনো চরিত্রের মুখে নতুন সংলাপ বলাতে তোমাকে রিস্যুট করতে হবে সেটার একটা প্রসেসিং আছে, এডিটিং আছে। সময় লাগবে না?'

'লাগবে। তাই শুটিং করব না। একটা দৃশ্য আছে যেখানে মা ব্যাক টু দ্য ক্যামেরা, একবার সাইড ফেস আছে। মায়ের ডায়ালগটা সে সময় ছুঁড়ে দেব। পাবলিক ভাববে মা পেছন ফিরে বলছে। অজিত মানে ডাইরেক্টার আজ কলকাতায় নেই তাই আমিই করে নিচ্ছি ব্যাপারটা। ডায়ালগটা শুনবেন? আজ লিখলাম। 'কেন? বিজন চৌধুরী লেখেনি?' 'আহা, পুরো ছবির সংলাপ লিখে পঞ্চাশ হাজার নিয়ে নিয়েছে আগেই। এখন যদি এক্সট্রা ডায়ালগ লেখাতে যাই, আবার টাকা চাইবে। আরে, আমি প্রমাণ করব যে আমিও কিছু কমতি নই। অবশ্য লোকে মনে করবে ওর ডায়ালগ, নাম হবে ওর।'

'সংলাপটা কি?'

'হ্যাঁ, ভাই-এ ভাই-এ ভাগাভাগি হচ্ছে। দারুণ টেনসন এমন সময় মা বলবে কাঁদো কাঁদো গলায়, 'ওরে তোরা টাকা পয়সা, জমি-জমা বাড়ি-ঘর টুকরো টুকরো করে নিতে পারিস কিন্তু আমি তোদের আমার বুকের ভালবাসা কি করে ভাগ করে

দেব! তোরা যে আমার পাঁজর।' 'ব্যাস, দাদা, হাততালিতে হল ফেটে যাবে। এক্সট্রা রুমাল সাপ্লাই করতে হবে।'

'ছবি শেষ হওয়ার পর নতুন করে শব্দ ঢোকানো যাবে?'

'যাবে দাদা। রিলিজ করেও ছবিতে যোগ-বিয়োগ করা যায়।'

কৌতূহল হল। শিবু ঘোষের প্রেস শো-তে দেখতে গেলাম। ভিড়ে চারপাশ ফেটে পড়ছে। ম্যাটিনি শো-এর রিপোর্ট পেয়েছে দর্শকরা। পাঁচগুণ দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। শিবু এগিয়ে এসে হাত ধরল, 'খুব খুশী হলাম দাদা। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।'

'সঞ্জিতদা ভাল বড় ভাই করছেন, ওঁর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছেই। মেজ ভাই করছেন পেলব চ্যাটার্জী, ছোট ভাই হিরো অভিজিত, নায়িকা দেবশ্রী, আর ওদের মা উষারানী, বাংলা ছবির সুপারহিট মা। আর উনি হলেন কালী ব্যানার্জী। আসলে এই টিম একসঙ্গে থাকলে ছবি ফ্লপ করে না।'

দেখলামও তাই। হাততালিতে হল ফাটছে। সেই সঙ্গে ফোঁসফোঁসানি। মেয়েরা নাকে জল টানছেন।

বোম্বাইয়ের কাউকে দিয়ে হিরোর গলায় গান বাজল, 'আমার বুকের পাঁজরে আঁকা তোমার ছবি ওগো মা, তুমি আমার সবি।' শুনতে শুনতে আমারই মন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। তারপর এল সেই সংলাপ। মা মুখ ফিরিয়ে বলছে, 'তোদের আমার বুকের ভালবাসা কি করে ভাগ করে দেব?' এত হাততালি এর আগে কখনও শুনিনি।

গত পাঁচ বছরে মুক্তি পাওয়া তালিকায় সুপারহিট ছবি 'স্নেহের শেকল'। তিন মাসেও হাউসফুল বোর্ড নামছে না। বিজ্ঞাপনে দেখছি একসঙ্গে পঁচিশটি প্রেক্ষাগৃহে চলছে। রজত, স্বর্ণ শেষে হীরক জয়ন্তী পার করে শিবু এল আমার কাছে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে!

বললাম, 'ওটা আবার কেন?'

'না দাদা, এটা আমার লাকি ব্যাপার। আপনার আশীর্বাদে ছবি দেড় কোটি টাকার বিজনেস করবেই। আপনি যদি সঞ্জিতদাকে ঠিক করে না দিতেন তাহলে আজ এখানে দাঁড়াতে পারতাম না।'

'পরের ছবি কি?'

'গল্প ভাবছি দাদা।'

'ডাইরেকশন?'

শিবু হাসল, 'ওটা আমিই করব।'

'তুমি?' বিস্ময়ে মুখ হাঁ করে গেল।

'দেখলাম তো। কিস্সু না। ভাল গল্প, ভাল স্ক্রিপ্ট, ভাল সংলাপ, ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী, ভাল ক্যামেরাম্যান, এডিটার আর ভাল এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার সঙ্গে থাকলে

ছবি ডাইরেক্ট করা কিছু না। মিছিমিছি ঘরের টাকা অন্য লোককে দেব কেন?'

'তাহলে মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়।'

মাথায় হাত ঠেকাল শিবু, 'সেটাও ভেবেছি। ওরা মহান, ঠাকুর ঘরের মানুষ। এর পর যে ফ্লপ ছবি করব সেটা আপনার গল্প। আগেই বলেছি। দেখবেন ঠিক প্যানোরমায় যাবে, আপনার দৌলতে ডিরেক্টর-প্রোডিউসার হয়ে আমি বার্লিন ফেস্টিভ্যাল ঘুরে আসব। তার আগে বার্লিন নয়, বালির জন্যে একটা ছবি করে ফেলি।'

আট

সকালবেলায় কাজের লোক এসে বলল, এক ভদ্রমহিলা এসেছেন!

আমার মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হতেই সে বলল, 'কি করব। যত বলি দাদাবাবু এখন লিখছেন, ডাকা চলবে না, কিন্তু কিছুতেই শুনছে না।'

চব্বিশ ঘণ্টার লেখার সঙ্গে আমার সংযোগ সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর আর লিখতে ইচ্ছে করত না, এখন সময় পাই না। বাড়ির সবাই, কাছের বন্ধু বান্ধবরাও জানে আমাকে সকাল সাড়ে দশটার আগে পাওয়া যাবে না। কাজের লোকটি বলল, 'আমার দোষ নেই। কোন পুরুষ মানুষ হলে ভাগিয়ে দিতাম। মেয়েছেলে বলে কথা!'

অতএব লেখা ছেড়ে নীচে নামতে হল। অপ্রসন্ন মুখে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখলাম মধ্যবয়সী এক মহিলা বসে আছেন এবং তাঁর পাশেই এক কিশোরী। দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন, 'নমস্কার। আপনাকে কি খুব বিরক্ত করলাম?'

'কিছুটা।' ইঙ্গিতে ওঁদের বসতে বলে নিজে সোফার উল্টো দিকে বসলাম। আমার এই চেয়ারটা একটু গোলমেলে। হাতে কাজ থাকলে আমি কিছুতেই ওটায় বসতে চাই না। বসলেই এক ধরনের আড্ডাবাজ মন তৈরী হয়ে যায়। কাজকর্ম মাথায় উঠে। মহিলা বললেন, 'ছিছি, আমার খুব খারাপ লাগছে, আগে জানলে এখন আসতাম না।'

'কোত্থেকে আসছেন?'

'অনেক দূর! সেই বাঁশদ্রোণী।'

বাঁশদ্রোণী থেকে শ্যামবাজারে যারা সাতসকালে আসেন তাঁদের সঙ্গে আর যাই হোক খারাপ ব্যবহার করা যায় না। মহিলার বয়স আন্দাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। মুখের গড়ন এবং শরীরের বাঁধুনিতে চল্লিশের এপারেই রাখতে পারি। সাজসজ্জায় যে টানটান ভাব রয়েছে তাতে নিজের সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন বোঝা যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলুন কি করতে পারি!'

'এ হচ্ছে নীতা। আমার মেয়ে। প্রণাম করো, যাও।'

কিশোরীর পিঠে আলতো ঠেলা দিলেন মহিলা।

কিশোরী সলজ্জ মুখে উঠে এসে প্রণামের চেষ্টা করতেই আমি আপত্তি করলাম। কিন্তু সে বেশ গেরিলা কায়দায় কাজটা সারল। কিন্তু তাকে কাছ থেকে দেখে আমার অস্বস্তি বাড়ল। মেয়েটির মুখে কিশোরীর সারল্য রয়েছে কিন্তু শরীরে নেই। বাইশ বছরের যুবতীকে পনেরতে নামালে স্বস্তি পাওয়া যায় না।

প্রণামপর্ব চুকলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার নাম ?'

'অনিতা সেন। আপনার লক্ষ্মীর পাঁচালি সিনেমা হচ্ছে, না ?'

'হওয়ার কথা। কারণ ওরা পয়সা দিয়ে গল্পের রাইট কিনেছেন।'

'আমার মেয়ে নীতা লক্ষ্মী হলে মানাবে না ?'

আমি আর একবার নীতার দিকে তাকালাম। মুখে লজ্জা মেখে বসে আসে সে।

অনিতা সেন বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে ওর অভিনয়ের খুব ঝোঁক। স্কুলে কত প্রাইজ পেয়েছে। নিজের মেয়ে বলে বলছি না ফিল্মে নামলে অনেক নায়িকার ঘুম কেড়ে নেবে একদিন। কিন্তু সবাই এমন মতলববাজ যে মেয়েকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না। লাইনটা তো ভাল নয়। লক্ষ্মী ওকে মানাবে না ?'

মাথা নাড়লাম, 'এ ব্যাপারে আমি কি বলব বলুন ?'

'না, না। আপনার লেখা গল্প, ওকে মানাবে কিনা বলুন না!'

এখানে একটু মজার কথা বলি। আমার গল্পে লক্ষ্মীর বয়স বড়জোর দশ-এগার। যে প্রযোজক গল্পটি কিনেছেন তিনি ওই চরিত্রে মুনমুন সেন অথবা দেবশ্রী রায়ের কথা ভাবছেন। আমি শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। ভদ্রলোক বুঝিয়েছিলেন, 'আরে আপনারা তো লিখেই খালাস। বয়স আবার কি। চন্দ্রনাথ ছবিতে মিসেস সেন সতের বছরের চরিত্র করেননি ? পঞ্চাশ বছর বয়সে উত্তমবাবু কলেজ স্টুডেন্ট হননি।

বলেছিলাম, 'তাহলে এ গল্প কিনছেন কেন ? ওঁদের যেমন মানায় তেমন গল্প নিন। ভদ্রলোক আর কথা বাড়াননি। দিন সাতেক আগে তিনি টেলিফোন করলেন, 'সমরেশবাবু, একটু উপকার করতে হবে।'

'বলুন।' আবার কি প্রস্তাব আসে কে জানে!

'আপনি ঠিকই বলেছেন ষাট বছর আগের ব্যাপার তো! তখন মেয়েরা ব্লাউজ পরত না গ্রামে! বেশী বয়সের অভিনেত্রী নিলে ম্যানেজ করা যাবে না।' আমার স্ত্রীও তাই বলছেন। আমরা নতুন মেয়ে নেব। একটা ইনোসেন্ট ব্যাপার থাকবে। দশ বারোজন হয়ে গেলে আপনাকে ডাকব। আপনি একটু দেখে বলে দেবেন কার সঙ্গে আপনার কল্পনার মিল আছে!'

'তাদের বয়স কত ?'

'আরে মশাই, শুধু শুধু বয়স-বয়স করছেন। একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে। ষোল-সতেরর মধ্যে রাখছি। ব্লাউজ নেই তো, আরও কম দেখাবে।'

অনিতা সেন দেখলাম এসব খবর রাখেন।

বললাম, 'ওকে নিয়ে প্রযোজকের কাছে যান না।'

'না। আমি খবর নিয়েছি। আমার এক মাসতুতো দেওর আছে ফিল্ম লাইনে, সে বলল, ওই প্রযোজক নাকি রাত আটটার সময় হোটেলে ইন্টারভিউ দিতে যেতে বলেন। ওই টুকুনি মেয়েকে হোটেলে পাঠাতে পারি বলুন?' অনিতা সেন এমন মুখ করলেন যেন এক ডজন তাতার দস্যুর সামনে পড়েছেন।

'এসব কথা আমাকে কেন বলছেন?'

'বলছি তার কারণ আপনি যদি বলে দেন তাহলে প্রযোজক খারাপ ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। আর নীতার এ্যাক্টিং যদি দেখতে চান তো দেখাতে পারি। আপনার লক্ষ্মীকে ও জীবন্ত করে দেবে।' অনিতা দৃঢ় গলায় বললেন।

'শুধু তো অভিনয় নয়, ক্যামেরায় ভাল দেখাবে কিনা সেটাও দেখতে হবে।'

'তা তো নিশ্চয়ই। মেয়ের আমার ক্যামেরা ফেস খুব ভাল। আপনাকে দেখাবো বলে এ্যালবাম নিয়ে এসেছি। ওর সব লেটেস্ট ছবি।' অনিতা সেন ব্যাগ খুলে একটা ছোট এ্যালবাম বের করলেন। নীতি হাসি মুখ করে আছে। কিছুক্ষণ থাকার পর সম্ভবত লজ্জা একটু কমেছে।

এ্যালবামের প্রথম পাতায় নববধূর বেশে নীতার মুখ। মোটেই কিশোরী বলে মনে হচ্ছে না। পায়ের পাতায় ওর অঙ্গে শাড়ি। আঁচল বুক থেকে খসে গেছে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চটপট পরের পাতায় গেলাম। প্যান্ট আর গেঞ্জি, চোখে গগলস, কোমরে হাত। চার নম্বরে চোখ পড়তেই আমি হতভম্ব। পোশাক বলতে একটা প্যান্টি। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। নগ্ন পিঠ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসছে। শরীরের সামনের দিকটা দেখা না যাওয়াতে অশ্লীল হয়নি দৃশ্যত। কিন্তু ভঙ্গীতে সেটা প্রবল। এ্যালবাম বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব ছবি।'

'ফিগারটা বোঝাবার জন্যে। দরকার হয়তো। বাঙালী মেয়েদের শরীর তো পটলের মত। বোম্বের মেয়েদের কাছে ঝি হয়ে থাকবে সব্বাই। সেই জন্যে নীতার এইসব ছবি তোলাতে হয়েছে। ওর ফিগার কি খারাপ, বলুন?'

এ্যালবামটা ফিরিয়ে দিলাম। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে। এইরকম ছবি কোন মা তোলাতে পারে?

মেয়েকে তো একজন ক্যামেরা ম্যানের সামনে নিয়ে যেতে হয়েছিল জামা খুলিয়ে। এবং তোলানোই শুধু নয়। আমাকে দেখাতেও উনি সংকোচ বোধ করছেন না।

অনিতাদেবী যাওয়ার আগে কথা আদায় করে গেলেন যে প্রযোজককে আমি নীতার কথা বলব। যেন পশ্চিমবাংলা আর একজন সুচিত্রা সেন পেতে যাচ্ছে আমি সুপারিশ করলেই। ওরা চলে যাওয়ার পর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। এক সময় ফিল্ম সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালীর আগ্রহ থাকলেও একটা দূরত্ব রাখত। ঘরের মেয়েদের

ফিল্মে নামার ব্যাপারে উৎসাহ দিত না। কাননদেবী, চন্দ্রাবতীদেবীর যেসব সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে তাতেই ওই যুগের ছবিটা দেখেছি। কিন্তু নিজের যুবতী মেয়েকে কিশোরী সাজিয়ে তার প্রায়-নগ্ন ছবি এ্যালবামে ভরে কোন মা আসবেন উমেদারী করতে যাতে ফিল্মে একটা চান্স হয়, এমন কখনই কল্পনাই করিনি।

প্রযোজককে ঘটনাটা বললাম। উনি হাসলেন, 'আজকালকার সব খবর আপনি রাখেন না। যেসব মেয়ে ফিল্মে অভিনয় করতে আসে তাদের প্রায় আশি ভাগই ওইরকম ছবি তোলায়। দেখবেন, পাইক পাড়ার মেয়ে যে পোশাক ও ভঙ্গীতে ছবি তুলিয়েছে যাদবপুরের মেয়ের ছবিও সেইরকম। জিজ্ঞাসা করবেন কি করে হল ? এক স্টুডিও ? না, আসলে এটাই স্টাইল। স্টুডিওগুলো জানে, ওরাই তুলে দেয়।'

'কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা এইসব ছবি তুলতে রাজী হন কি করে ?'

প্রযোজক হেসেছিলেন আর উত্তরটা পেলাম আমি নিতাইবাবুর কাছে। যাকে বলে দোকান-সাজানো ক্যামেরাম্যান নন নিতাইবাবু। ভাল চাকরি করেন, শখে পড়ে ছবি তুলতে গিয়ে এমন নাম করে ফেলেন যে খবরের কাগজে, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকাগুলো থেকে শুরু করে বম্বের ফিল্মদুনিয়ায় ওঁর ছবির কদর খুব।

এমনিতে মানুষটি খুব বিনয়ী। নিজস্ব স্টুডিও নেই, কিন্তু নামকরা স্টুডিওগুলো ওঁকে সাগ্রহে কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা করে। এই নিতাইবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ঘটনাচক্রে এই সময় দেখাও হয়ে গেল। আমার অভিজ্ঞতার কথা ওঁকে বললাম।

বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম প্রিয়া সিনেমার তলায়। বললেন, 'এটা একটা দারুণ সাবজেক্ট। হাতে সময় আছে ? পাশেই আমার ডেরা, চলে আসুন।'

একটা ছাতায় দুজনে মাথা গুঁজে ওঁর বাড়িতে চলে এলাম। নীচের তলায় চাবি খুলে ঢুকে লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হল। বসার ঘর এবং কাজের ঘরকে এত সুরুচি দিয়ে সাজিয়ে রাখতে খুব বেশী দেখিনি।

নিতাইবাবু বললেন 'অনেকদিন তো হয়ে গেল ছবি তুলছি। প্রথম প্রথম ফিল্মে নামবার জন্যে যারা ছবি তুলতে চাইত, তারা মুখের বিভিন্ন দিকের ছবি তোলাতো হাসি সমেত। সেটা বুঝতাম। ফিল্মে যারা প্রতিষ্ঠিত নায়িকা তাঁরা পুজোর আগে পত্রিকাগুলোর জন্যে বিভিন্ন পোশাক পরে পোজ দিতেন। উঠতি নায়িকারা যারা তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না তারা চাইল নিজের প্রচার। পাবলিক হয়তো একটু নাম জানে, তেমন প্রচার নেই এবং সেটা না পেলে আর নায়িকার রোল পাওয়া যাবে না, তাদের অনেকে অনুরোধ করতে লাগল আমায় ছবি তুলে দিতে। জিনসের প্যান্ট এবং স্লিভলেস গেঞ্জিতে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো, সোফায় পাশ ফিরে শোয়ার ছবি উঠল। আমি আপনাকে এরকম ছবি অন্তত দুডজন মেয়ের দেখাতে পারি। পত্রিকায় সেগুলো ছাপা হল। পাড়ার স্টুডিওগুলো বুঝে গেল ওই ধরনের ছবি তুলতে হবে যারা ফিল্মে নামতে চাইবে। অতএব টালা টু টালিগঞ্জ একই স্টাইল।'

ছবিগুলো দেখলাম। অনিতাদেবী তাঁর মেয়ের যে ছবি তুলেছেন তার সঙ্গে কোন ফারাক নেই। কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, মেয়েদের বিবস্ত্র ছবি তোলেন কি করে? ওরা লজ্জিত হয় না?'

'হয়, বেশীর ভাগ মেয়েই শরীরে জামা-কাপড় রাখতে চায়। কিন্তু কেউ কেউ এত আধুনিক যে, ওসব পরোয়া করে না।'

'তারা নিজেরাই প্রস্তাব দেয়?'

'দেয়। বলে আমার ফিগারটা ধরে রাখতে চাই।' হাসলেন নিতাইবাবু, 'তা ফিগার ধরতে গেলে শরীরে পোশাক থাকলে বিভ্রম হতে পারে। অতএব। তবে ছবি তোলার পর অজস্রবার শুনতে হয় যেন কাউকে না বলি।'

'এরা সবাই অখ্যাত?'

'মোটেই না। দু'বছর আগে তেমন পরিচিত ছিলেন না, এখন তো বেশ নামকরা নায়িকা হয়ে গিয়েছেন।'

নিতাইবাবু চোখ বন্ধ করলেন, 'তবে সবচেয়ে গোলমাল হয় নতুন মেয়েদের নিয়ে যেসব মহিলা আসে, তাদের জন্যে।'

'মহিলা মানে? মা দিদি মাসী?'

'ওইরকম কিছু বলে বটে আসলে এরা মহিলা-দালাল।'

'দালালদের স্ত্রীলিঙ্গ জানি না মশাই। বস্তি কলোনি অথবা মধ্যবিত্ত পাড়া থেকে অল্পবয়সী মেয়ে, যাদের মুখে একটা সুশ্রী ভাব আছে, তাদের নিয়ে আসে ছবি তোলাতে। তাদের ব্যাগে অনেকরকম জামা-কাপড় থাকে মেয়েটির জন্যে। সে গরীব মেয়েটি ওই ভাড়া-করে-আনা জামা পরে পোজ দেয়। এই মহিলারাই শেষ ছবিটা তোলায় স্বল্প পোশাকে যাতে প্রযোজককে ফিগার দেখানো যায়। সেই সঙ্গে ওই মেয়েটি চিরকালের জন্যেই মহিলার হাতের মুঠোয় চলে যায় ছবিটার জন্যে।'

নিতাইবাবুর কথা শুনে আমি তাজ্জব। অনিতাদেবীর ভূমিকাটি কি তবে মায়ের নয়? তিনিও কি দালাল? মেয়েটি তো প্রতিবাদ করেনি। ওই মেয়ে যদি অনিতাদেবীর বিরোধিতা করে তাহলে কি তিনি পিঠ-খোলা ছবি দেখিয়ে তাকে বাধ্য করবেন? প্রযোজকের কাছে শুনলাম আমার সুপারিশ সত্ত্বেও তিনি অনিতাদেবীর মেয়েকে নিতে পারেননি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ছবিটাই হল না।

এর কয়েক বছর পরের কথা। 'তেরো পার্বন,' 'মুক্তবন্ধ' নামে দুটো টি. ভি. সিরিয়াল করেছি। লোকে প্রশংসাও করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজস্ব কোম্পানি করলাম তিন-চার বন্ধু মিলে। 'কলকাতা' নামের একটি সিরিয়াল করব। খরবগুলো কেমন করে রটে যায় কে জানে, কিন্তু সিরিয়ালে অভিনয় করতে চেয়ে ছেলে-মেয়েরা দেখা করতে শুরু করল। একদিন এক প্রৌঢ়া এলেন। অন্তত পঞ্চাশের কাছে বয়স। এর আগে কখনও অভিনয় করেননি। সিনেমার ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি আছে। নাতি-নাতনিরা চায় না। ওঁর খুব সখ টি. ভি.-তে অভিনয় করা। এতে কারো

আপত্তি নেই। আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার বলল, একটা ছবিতে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যেতে। দিন সাতেক বাদে মহিলা এলেন দুটো ছবি নিয়ে। নতুন তোলা। একটিতে মাথায় ঘোমটা-দেওয়া, মা মাসীর মতনই। দ্বিতীয়টি দেখে চমকে উঠলাম। স্লিভলেস জামা পরনে, আঁচল খসে হাতে পড়ে গেছে, তিনি অলস চোখে যেন আকাশ দেখছেন। খুব খারাপ লাগল। প্রায় বৃদ্ধা মহিলারও মনে এসেছে এই ধরনের ছবি না তোলালে সুযোগ পাওয়া যায় না? প্রথম ছবিটি রেখে দিলাম। বিরক্তিটা এমন তীব্র হয়েছিল যে, ওঁকে আমরা অভিনয় করার জন্যে ডাকিনি। সম্ভবত ওঁদের সংসারে শান্তি আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

এই সময় বছর তিরিশের একটি মহিলা প্রায় রোজই আসছিলেন। রোজ আসতে নিষেধ করলে বলতেন, 'আপনাদের এখানে এলে ভাল লাগে।' মহিলা লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, মুখের গড়নে একটু মঙ্গোলিয়ান ছাপ রয়েছে। নিয়ত আসার ফলে ওর গল্প শুনতে হতো।

ফিল্মে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সবাই সুযোগ নিয়েও কাজ দেয় না। এই প্রথম একটা পরিবেশ পেলেন, যেখানে কারো ওসব মতলব নেই। বাংলা ছবিতে সুযোগ না পেলেও তিনি নাকি তামিল ছবিতে ডাক পেয়েছেন শরীরের জন্যে। একা যেতে ভয় তাই যাবেন না। এক ধরনের সারল্য স্পষ্ট হতো কথাবার্তায়।

মেয়েটিকে জানতে পারলাম। খুব অল্প বয়সে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল। বাড়ি থেকে তীব্র আপত্তি ছিল। ছেলেটি উগ্র রাজনীতি করত। যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও ছেলেটির কাছে চলে আসে, সেদিনই পুলিশ ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করে। মেয়েটির আর ফেরার পথ ছিল না। ছেলেটির বাড়িতে এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার সঙ্গে সে থেকে যায়। ছেলেটির জেল হয়। অর্থাভাব, কি করব বুঝতে পারছে না যখন তখন আলাপ হয় এক সুদর্শন মহিলার সঙ্গে। তিনি আশ্বাস দেন এত সুন্দর চেহারা যখন তখন ফিল্ম লাইন ওকে লুফে নেবে। ফিল্ম সম্পর্কে মেয়েটিরও আগ্রহ থাকায় সে ঘন ঘন দেখা করতে লাগল মহিলার সঙ্গে। মেয়েটিকে বিভিন্ন পোশাক পরিয়ে মহিলা ছবি তোলালেন প্রযোজকদের দিতে হবে বলে। প্রায়-না পোশাকে ছবি তোলার আগে মেয়েটি খুব আপত্তি করেছিল কিন্তু মহিলা বলেন, 'বম্বের প্রযোজকরা এমন ছবি ছাড়া কাউকে সুযোগ দেয় না।' তখন মহিলার সঙ্গে সে প্রায়ই স্টুডিওগুলোয় ঘুরত। তারকাদের দেখত। কেউ যদি তার সঙ্গে মিশতে চাইত মহিলা প্রতিবাদ করতেন।

এতে মহিলার প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ত। একদিন মহিলা বললেন, এক বিখ্যাত অভিনেতা পরিচালক হচ্ছেন। তিনি ছবি দেখে পছন্দ করেছেন মেয়েটিকে। আজ সন্ধ্যায় পার্ক হোটেলে দেখা করতে হবে। জীবনে সে ওসব জায়গায় যায়নি। মহিলাই নিয়ে গেলেন। অভিনেতাকে দেখেই সে চিনতে পারল। অভিনেতা নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মহিলাকে বললেন, 'আপনি যে ছবি দেখিয়েছেন তাতে বুজরুকি আছে।

কোনো বাঙালী মেয়ের অমন ফিগার হতে পারে না।' মহিলা প্রতিবাদ করলেন। ঝগড়াঝাঁটির পর মহিলা প্রায় রেগে গিয়েই মেয়েটিকে বললেন, 'যেভাবে ছবি তুলেছ সেইভাবে একটা পোজ দাও তো। আমি মিথ্যে কথা বলিনি সেটা প্রমাণিত হোক।' মেয়েটিও খুব রেগে গিয়েছিল অভিনেতার কথায়। কিন্তু পোশাক খুলতে লজ্জা পেয়েছিল। একটা জেদের ঘোরে যখন সব হয়ে গেল তখন মহিলা ঘরে নেই। অভিনেতা তাকে সারারাত ভোগ করে সকালে যখন চলে গেলেন তখন মহিলা এলেন। একটা একশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার চান্স ওর ছবিতে পাকা।' অন্তত একশবার সে টাকা নিয়েছে আর শুনেছে চান্স পাচ্ছে। কিন্তু এখনও সিকে ছেঁড়েনি। সে প্রতিবাদ করতে চাইলে মহিলা বলেছেন ওই ছবি তিনি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে ওর ভাবী স্বামী ছাড়া পেয়েছেন। তিনি সমস্ত ঘটনা আন্দাজ করেছেন। ফলে সে অকপটে স্বীকার করেছে। লোকটি বলেছে তোমাকে পুরো দোষ দিতে পারছি না। তবে আর আইনত বিয়ে করতে পারব না তোমাকে। তুমি এখানেই থাক, লোক জানবে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

এখন প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা সেই সাজানো স্বামীর হাতে দিতে হয়। মহিলা এখনও সংযোগ রেখেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, টি. ভি. সিরিয়ালে বেশী টাকা পাওয়া যায় না, তাহলে আগ্রহ কেন?'

মেয়েটি বলল, 'দাদা, একবার নিজের অভিনয় ছবিতে দেখতে চাই।'

'তুমি এখানে আসছ সেই মহিলা জানেন?'

'না। উনি এ্যান্টি টি.ভি. সিরিয়াল।'

মেয়েটিকে সুযোগ দিয়েছিলাম। ছোট্ট রোল। কিন্তু ভাল করেনি। তারপর থেকে আর দেখা পাইনি তার। দিন পনের আগে হোটেল হিন্দুস্থানে গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে। লবিতে মেয়েটিকে দেখলাম। সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা। মেয়েটি আমায় দেখেও না দেখার ভান করল। কিন্তু সঙ্গী মহিলা এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন, 'চিনতে পারছেন?' একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'যদি ধরিয়ে দেন একটু—।

'আমি অনিতা সেন। সেই যে লক্ষ্মীর পাঁচালির ব্যাপারে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। ছবিটা তো হলই না। প্রোডিউসারটাই বাজে ছিল।'

'ও, হ্যাঁ।'

'সেই যে আমার সঙ্গে যাকে দেখেছিলেন তার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভালই হয়েছে। ও হ্যাঁ, আমার বোনঝির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওর খুব শখ ফিল্মে নামার। ইনি কে জান, বিখ্যাত লেখক।'

মেয়েটি মাথা তুলছিল না। অনিতা বললেন, 'খুব লাজুক। বেশী বাইরে বের হয় না তো। যদি আপনার কোনো গল্প বিক্রী হয় ছবির জন্যে ওর, কথা মনে

রাখবেন প্লিজ। চলি। বোম্বের এক ডাইরেক্টার এসেছেন এখানে। ওকে দেখতে চেয়েছেন। বোনঝি বলে বলছি না, কলকাতায় এমন ফিগার খুব কম আছে। আচ্ছা, নমস্কার।'

অনিতাদেবী ওর বোনঝিকে নিয়ে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মেয়েটি একবারও আমার দিকে তাকায়নি। ভালই করেছে। কিন্তু অনিতাদেবীর কি বয়স বাড়ছে না ? সর্পিণীদের কি বয়সও বরফের মত জমাট ?

নয়

আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, মহাজনেরা বলেছেন। আর সেই আকাঙ্ক্ষা যদি পার্থিব ধনসম্পদ যশের জন্যে হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তারা এও বলেছেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। মুস্কিল হল আমরা সাধারণ মানুষরা জ্ঞান হওয়া ইস্তক প্রচুর উপদেশ শুনে এলেও সেগুলো মনে ঢোকাই না। আমাদের কান এবং চোখের ঠিক তলায় একটা সুন্দর ছাকনি আছে যা এইসব জ্ঞানগম্যিগুলো আটকে দেয়। কথা হল কার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশী ? নারী না পুরুষের ?

হাত তুলে পুরুষের আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি বলা যায় ইতিহাস থেকে। যে কোন পররাজ্যলোভী রাজাই ছিলেন পুরুষ। লোভের ছোবলে নীল হয়ে থাকা পুরুষের সংখ্যা গোনা মুস্কিল। ইতিহাসে মেয়েরাও অবশ্য আছেন। তাঁরা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে কি ধুন্ধুমার কাণ্ডই না ঘটিয়েছেন!

পটল মিত্তিরের ধারণা ও ব্যাপারে মেয়েরা নাকি ছেলেদের ছড়িয়ে যায়। তার বক্তব্য, পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ থাকে, এক নম্বরী ও দু'নম্বরী। তৃতীয়টি হল ক্যামোফ্লেজ এক নম্বরী। তারাই নাকি ভয়ঙ্কর। কিছু পুরুষ এবং অনেক নারী ছাড়া এই তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান পাওয়া মুস্কিল।

আগে পটল মিত্তিরের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চেহারাটি ঠিক পুজোর আগের পটলের মতো। উনি বলেন, হিমঘরের পটল, জানুয়ারীতেও পাবেন।

পৃথিবীতে কোন কোন মানুষ আছে যাঁরা না বলতে জানেন না অথবা চান না, পটল তাঁদের একজন। জন্ম উত্তর কলকাতার মিত্তির পরিবারে। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছেন সাহেব প্রিন্সিপ্যালের আমলে। এখন করেন সিনেমার প্রোডাকশান ম্যানেজারি। বছর খানেক আগে টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে বসেছিলাম। একজন বিখ্যাত পরিচালক তাঁর নতুন ছবি শুরু করতে যাচ্ছেন। চা খাচ্ছি, এমন সময় পটল মিত্তির এলেন। পরিচালক তাঁকে বসতে বলে লিস্ট খুললেন 'পটলবাবু, ছবিটার মেজর পোর্শন আমি শুট করতে চাই একটা ক্যামেল টাইপের বাড়িতে, যার চারপাশ ফাঁকা।'

'ক'তলা ?'

'দোতলা হলেই হবে।'

'পাবেন।' মাথা নাড়লেন পটল।

'একটা পোষা বাঘ চাই, অল্প বয়স।'

'পাবেন।' দু'বার মাথা নড়ল।

'ছবিতে তিনজন বিদেশিনীর প্রয়োজন। তার মধ্যে একজন ব্ল্যাক স্কিন, মানে যাদের নিগ্রো বলা হয়। এইটে খুব জরুরী।'

'পাবেন।' পটল মিত্তির হাত বাড়ালেন, 'রিক্যুজিশন লিস্টটা আমাকে দিয়ে দেবেন। ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন, তার কোনটাই না-পাওয়ার কোনো কারণ নেই। পরিচালক তুষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব বিনীত হয়ে পড়লেন পটল মিত্তির, 'ওহো আপনি! আমি মশাই অশিক্ষিত লোক, তবে একটা জিনিস বুঝেছি, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করতে পারেন না, আপনারা পারেন।'

মানুষটিকে ভাল লেগে গেল আমার। তারপর মাঝে-মধ্যে দেখা হতে হতে বেশ ভাবও হয়ে গেল। পটল মিত্তিরের বর্তমান বাস পার্ক লেনের একটা ফ্ল্যাটে। ছোট ফ্ল্যাট, খাট থেকে বেসিন সবই দেখা যায়। দেওয়ালের একপাশে মিনি কিচেন আর ওপাশে মিনি টয়লেট। ঘনিষ্ঠ হবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি একা ?'

'হ্যাঁ দাদা। অনেক ভেবে দেখেছি বউয়ের সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারব না। আমাকে যে রেটে মিথ্যে কথা বলতে হয়, তাতে বেচারা তাল রাখতে পারবে না। অশান্তি ডেকে না এনে বিয়েই করলাম না।'

পটল মিত্তিরের রোজগার কম নয়। ইনকামট্যাক্স দেন না। ফিল্মের প্রোডাকশন ম্যানেজারিতে যে মাইনে থাকে তাতে স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট খাওয়া যায় না। দু'মিনিটের পথ ট্যাক্সি ছাড়া যান না পটল। কিন্তু ওঁর ওপর প্রযোজক পরিচালকরা খুব নির্ভর করেন। পটল বলেছিলেন, 'যে গরু দুধ দেয় সে ল্যাথি মারলেও আনন্দ। তবে হ্যাঁ, আমি মার্জিন রাখি বটে কিন্তু কখনই দুটো জিনিস করি না। এক, প্রযোজককে ঠকাই না। দুই, আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানদের কাছ থেকে কমিশন খাই না। জিজ্ঞাসা করবেন, প্রথমটা কি করে সম্ভব ? ধরুন, একজন ডিরেক্টর হুকুম করলেন বাঘের ছবি আনতে। অর্থাৎ একটা বাঘ ধরতে হবে। না, বাঘিনীকে ধরতে হবে যার সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছে। তারপর তার দুধ দুইয়ে নিয়ে আসতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, বাজেট কত ? ওঁরা অনেক ভেবে বললেন, গরুর দুধ যদি পাঁচ টাকা কিলো হয় তাহলে বাঘের দুধের দাম কিলো প্রতি একশো হওয়া উচিত। ওদের হাফ কিলো হলেই চলবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ। আমি চলে গেলাম খালপাড়ে। সেখানে প্রচুর শুয়োর ঘোরে। তাদের মালিককে ধরে হাফ কেজি শুয়োরের দুধ দুইয়ে এনে দিলাম পনেরো টাকায়। খাঁটি ঘন দুধ। ডিরেক্টর গরু ছাগলের দুধ দেখেছেন, কৌটোয় দুধ খেয়েছেন, বাঘ বা শুয়োরের দুধ জীবনে দেখেননি। পাত্র নেড়েচেড়ে বললেন,

'সাবাস পটল, তুমি না হলে এ জিনিস কে এনে দিত?' প্রোডিউসার বললেন, 'পটলবাবু ছাড়া প্রোডাকশন চালানোই যেত না। এখন আপনি বলুন দাদা, আমি কি ঠকালাম? যারা আমাকে বাঘিনী ধরে তাকে দুইয়ে দুধ আনতে বলে তাদের শুয়োরের দুধ সাপ্লাই দিয়ে আমি কি অন্যায় করলাম?'

হেসে ফেলেছিলাম। পটলের বিপক্ষে কথা বলতে পারিনি। ফিল্ম কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার মানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে সক্ষম এমন একটি মানুষ যাঁর কপালে প্রশংসা খুব কম লেখা থাকে। শুটিংয়ের সমস্ত আয়োজন এই মানুষটিকে করতে হয়। টাকা-পয়সা এর হাত দিয়েই খরচ হয়। ফলে বদনামের সম্ভাবনা থাকে। পটলবাবু একটি ঘটনা বললেন, 'শুটিং হচ্ছে ডায়মণ্ডহারবারে। রিক্যুজিশন লিস্টে সহকারি পরিচালক লিখেছিল, একশো গ্রাম ছোলা। প্রোডাকশনের লোকদের দিয়ে তাই কিনিয়েছিলাম। শুটিংয়ের দিন সকালে পরিচালক সেই ছোলা দেখে খেপে লাল। ছোলা নয় কাবলি মটর চাই। ওটা ছাড়া নাকি শট হবে না। লোক পাঠালাম বাজারে। তারা ফিরে এসে বলল, ও জিনিস লোকাল বাজারে পাওয়া যাবে না। কলকাতা যাতায়াত করতে ঘণ্টা দুয়েক লাগল এবং তেল পুড়ল যা, তাতে একশো গ্রাম কাবলি মটরের দাম যদি একশো পঁচাত্তর টাকা লেখা হয়, তাহলে পরে বাড়িতে বসে প্রোডিউসার ভাববেন পটল চোর। কিন্তু পরিস্থিতিটা চিন্তা করুন। শুটিং নির্বিঘ্নে হয়েছিল। আমার গুরু আমায় শিখিয়েছিলেন, কাজটা ঠিক সময়ে ঠিকঠাক উতরে দেবে, তারপর অন্য কথা। এবার যদি আপনি লেখেন দুটো টাকার মটর আনতে একশো তিয়াত্তর টাকার তেল পোড়ানো হয়েছে তো লোকে ভাববে কি চুরি, কি চুরি! কিন্তু বলুন একদিনেব শুটিং ক্যানসেল হলে কত খরচ হতো, তা কেউ হিসাব করল না।'

যুক্তি অকাট্য। ওর কাছে দুটো লিস্ট থাকে। একটা মনে অন্যটি খাতায়। সাধারণত খাতা তাঁকে দেখতে হয় না। দু'ঘণ্টার নোটিশে যে কোন চেহারার ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পটল হাজির করতে পারেন। ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়সে ঢের বড় তবু দাদা শুনতে হয় তাঁর কাছে। কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'অভ্যেস। বাইশ বছরের ছেলে সম্পত্তি হাতে পেয়ে প্রোডিউসার হয়ে এসেছে, তাকে দাদা বললে সে খুশী হয়। আর লাইনে দাদা শব্দটা আজকাল কেউ মিন করে বলে না।'

পটল মিত্তিরের সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। একদিন ওঁর ফ্ল্যাটে চা খাবার নেমন্তন্ন পেয়ে হাজির হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'অনেকদিন তো লাইনে আছেন, বাংলা ফিল্মের ভবিষ্যৎ কি?' পটলবাবু বললে, 'হাসালেন। নিজের ভবিষ্যৎ জানি না, তা ফিল্মের ভবিষ্যৎ বলব।' তারপর হেসে বললেন, 'এখানে একদল লোক ভারি ভারি বোধ মাথায় নিয়ে টলমল করছে আর একদল বোধহীন হয়ে হাওয়ায় ভাসছে। আচ্ছা বলতে পারেন উৎপলেন্দু বুদ্ধদেব দাশগুপ্তেরা কেন ছবি তৈরী করে?'

বললাম, 'সৎ ছবি ভাল ছবি করেন এঁরা।'

'কে বলল? খবরের কাগজ? পাবলিক ভাল বোঝে না? তারা হাঁদা? তারা পথের পাঁচালি দেখেন না? যা ভাল তা সব সময় ভাল। ভালর সাইনবোর্ড চাপিয়ে যা খুশী চালিয়ে দিলে মানবে কেন?' পটলবাবুকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, 'সব ধান্দা হল কম পয়সা দিয়ে হাতে পায়ে ধরে ছবি শেষ করে সেন্সর করিয়ে প্যানোরামায় ঢুকিয়ে দেওয়া। ব্যাস। হয়ে গেল। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হল। পয়সা খরচ করে সরকার যেসব বিদেশী সমালোচককে ডেকে আনেন তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন উঠবস করতেই দেখা যায়, অমুক বার্লিনে যাচ্ছেন, তমুক মস্কোয়। একটা ছবি করে একটি বছর শুধু বিদেশে ঘোরা। সেই গর্দভ লোকটা যার নাম প্রযোজক, মাথায় হাত দিয়ে বসে। ছবি দিল্লী দূরদর্শন থেকে একবার দেখালে যে টাকা পেলেন তাই চিবিয়ে শান্তি। হলে গেল না ছবি। গেলেও এক সপ্তাহে চম্পট। পাবলিক দেখল না। তার মানে এখানকার পাবলিক গাধা আর বাংলা ভাষায় তোলা ছবি প্যারিসের দর্শক দেখলে তারা বুদ্ধিমান?' আপনি অঞ্জন চৌধুরীদের সমর্থন করেন?'

পটলবাবু একবার মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল, পরক্ষণেই মনে হল সেটা নয়। ব্যাখ্যা চাইলাম। বললেন, 'যদি পেটের জন্যে কাজ তাহলে বলব হ্যাঁ। টালিগঞ্জে মশাই একসময় আলু বেচতে হতো। স্টুডিও খাঁ খাঁ করছে। নো কাজ। যে-সব ছবি মুক্তি পাচ্ছে সেগুলো তিন-চার হপ্তায় পাততাড়ি গোটাচ্ছে। প্রোডিওসার বেপাত্তা। ওই যারা উত্তমবাবুকে ধরে বেঁচে ছিলেন তাদের ছবি সব। লোকটা মারা গিয়ে প্রমাণ করল ওরা পরিচালকই নয়। একা তপনবাবু আর কতটা সামলাবেন। সত্যজিৎবাবু অসুস্থ। মৃণালবাবুর দর্শক ভুবনসোমের পর আর নেই। তরুণবাবু রিমেক করছেন আর ডুবছেন। যাঁর নাম বললেন তিনি আর তাঁর চেলাচামুণ্ডা এসে অবস্থা ঘোরালেন। রমরম করে চলতে লাগল বাংলা ছবি। আমাদের পেট ভরছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে ভাল?'

'কে বলছে? আমাদের ছোটবেলায় শের আলির একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। শের আলি হিসেব করে দেখল ঘোড়াটা ধুঁকতে ধুঁকতে দেড় বছর বাঁচতে পারে। সে উত্তেজক ইঞ্জেকশন লাগালো। দেখা গেল ঘোড়া টগবগ করছে। রোজ ইঞ্জেকশন রোজ ঘোড়া চনমনে খাটে। তিনমাসেই ঘোড়া অক্কা পেল। সবাই বলল, শের আলি, তুমি ডোপ করে ঘোড়াটাকে মেরে ফেললে? শের আলি হেসে বলেছিল, ধুঁকে ধুঁকে দেড় বছরে মরত, কোনো কাজে আসতো না তদ্দিন, ডোপ করিয়ে তিনমাসে প্রচুর কাজ করিয়ে নিলাম। এই নব্য পরিচালকরা ছবির মাধ্যমে দর্শকদের ডোপ করছে। সুখেন দাস শরৎচন্দ্রের ফর্মুলা নিয়ে চেষ্টা করেছিল একসময়। তখন তার ছবি মানেই সুপারহিট। সেই ইঞ্জেকশন যখন অকেজো হয়ে গেল, তখন আর তিনি নেই। এদেরও এক অবস্থা হবে। পাবলিক আর কত ফর্মুলা খাবে? আপনি ভাবুন, দীপ জ্বেলে যাই, উত্তর ফাল্গুনি, ঝিন্দের বন্দী, বালিকা বধূ, ছুটি, পলাতক,

মণিহারের মত টিপটিপ ছবি, যা চিরকাল পয়সা দেবে, দর্শকদের ভাল লাগবে, করার ক্ষমতা আজকের কোন পরিচালকের আছে? নেই। তবে হ্যাঁ, নিভে-আসা প্রদীপকে এরা জ্বালিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু ভয় হয় প্রদীপটাকেই না ভেঙে দিয়ে যায়।' টানা অনেকক্ষণ কথাগুলো বলে পটল বললেন, 'সব কথা একদম আন-অফিসিয়ালি বললাম। ছবি হিট হলে পরিচালক নাম কামায়, প্রোডিউসার পয়সা পায়, হিরো-হিরোইনের কন্ট্রাক্ট বাড়ে, আমার মত প্রোডাকশন ম্যানেজারের যা অবস্থা, তাই থাকে।'

'কিন্তু আপনাকে তো সবাই খাতির করে।'

'তা করে। কিন্তু কারা করে?' ঘড়ি দেখলেন পটলবাবু 'একটু দাঁড়ান, একজনের সময় হয়েছে আসার। কাল স্টুডিওতে দেখা হয়েছিল, বলেছিলেন পার্সোনাল টক আছে। তিনি আমাকে কেমন খাতির করেন দেখবেন।'

'কি রকম?'

'আপনাকে বলেছিলাম তিন ধরনের মানুষ আছে। সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ক্যামোফ্লেজ এক নম্বরী। ইনি তিনি। আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।' পটলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন দিকের একটা পর্দা টেনে দিলেন। দেখলাম, বইয়ের একটা ছোট টেবিল-চেয়ার পর্দার আড়ালে চলে গেল। পটলবাবু বললেন, 'উনি এলে আপনি ওই আড়ালে চলে যাবেন। সময় হলেই আমি আপনাকে ডেকে নেব।'

বললাম, 'তা কেন? অসুবিধে হচ্ছে যখন তখন আমি চলেই যাই।'

'না দাদা। আপনি থাকবেন জেনেই ওকে আসতে বলেছি। নইলে আমার ফ্ল্যাটে কোনো মহিলাকে আমি এ্যালাউ করি না। তাছাড়া আমি চাই আপনি কথাবার্তা শুনুন।'

'মহিলা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যাদের আকাঙ্ক্ষার কোনো লাগাম নেই। তবে ব্যতিক্রম আছে, নিশ্চয়ই আছে। নইলে শরৎবাবু অমন চরিত্র লিখলেন কি করে? বলতে না বলতেই বেল বাজল। আমি চলে গেলাম পর্দার ওপাশে। চেয়ার টেনে নিলাম। টেবিলে যে বইটা পড়ে আছে তা আমাকে অবাক করল, আরব্য রজনী।

ওপাশে পটলবাবু দরজা খুলতেই একটা মিষ্টি গলা বলে উঠল, 'আসি।'

'আসুন দিদি। ভাল আছেন?'

'ওঃ পটলদা, তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে দিদি বলবে না। আমাকে কি খুব বুড়ি দেখায়? তুমি কিছুতেই শোন না। ও-মা, কি সুন্দর ফ্ল্যাট। বাঃ, তুমি একা থাক? একদম একা?' সুন্দর কণ্ঠস্বর বিভিন্ন রকম খাতে বয়ে গেল।

আমি খুব আকর্ষণ বোধ করছিলাম এমন কণ্ঠস্বরে।

পটলের গলা শুনলাম, 'বসুন। এটা আর এমন কি সুন্দর! কোনমতে মাথা গোঁজা যায়। কিছু খাবেন?'

'নাঃ। ডায়েটিং করছি।'

'ও।'

'পটলদা, আমি খুব বিপদে পড়েছি। তুমি না বাঁচালে আমি বাঁচব না।'

'বলুন কি করতে পারি?'

'তুমি তো সোমাকে জানো কত কষ্ট করে কত লড়াই করে আজ আমি ওকে বাংলা ফিল্মের প্রথম চারজনের মধ্যে এনেছি। তবু দ্যাখো, অন্য তিনজন যত কাজ পাচ্ছে, সোমা তা পাচ্ছে না। তুমি কি ভাবছ আমি কারণ জানি না?'

'না, আমি কিছুই ভাবছি না।'

'আহা, শোনই না, এই যে নদী আমার নদী ছবিটা হচ্ছে, বিরাট বাজেট, সোমা কাজ পেল না। কেন পেল না? পরিচালক বলল হিরোইনের গায়ে জামা থাকবে না ছবিতে, তাই পার্ক হোটেলের ঘরে তিনি আগে খোলা গায়ে নায়িকাকে দেখতে চান। কি লজ্জার কথা বলতো। আমি কেন সোমাকে ওখানে পাঠাবো। তবু ক্যারিয়ারের কথা ভেবে পরিচালককে বললাম, আমারই তো মেয়ে, একদম এক গড়ন পেয়েছে, আমি গেলে কাজ হবে। আমারটা দেখে ওরটা বুঝে নেবেন। শুটিংয়ের সময় কোনো অসুবিধে হবে না। পরিচালক রাজী হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু প্রোডিউসার বাগড়া দিল। আমি তো জানি, যে জামা খুলে রোল পেয়েছে, তাকে আর কি করতে হয়েছে। নিজের মেয়েকে সেখানে জেনেশুনে পাঠাই কি করে পটলদা?'

পটলবাবু বললেন, 'ওই ছবিতে তো আমি কাজ করছি না, তাই কিভাবে সাহায্য করব—।'

'না, না, না। ওই সাহায্য চাই না। আমার বিপদ আরও মারাত্মক।'

'কি বিপদ?'

'তুমি পল্লবকুমারকে জানো তো। কি বদমাস লোক। আমার সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করেছে কত। সোমার চেয়ে অন্তত পনের বছরের বড়। এই পল্লব সোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমি যে কি করব, বুঝতে পারছি না।'

'কি করে হল?'

'শিমুলতলায় আউটডোরে গিয়ে। তুমি তো জানো, আমি কখনও মেয়েকে একা ছাড়ি না। সকালে নিজে স্টুডিওতে নিয়ে যাই, নিয়ে আসি। পার্টি থাকলে আমি সঙ্গে যাই। আউটডোর থাকলে তো কথাই নেই। মরবি তো মর, শিমুলতলায় যেদিন যাব সেদিনই আমার জ্বর এল। একশ তিন। বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। মেয়ে অবশ্য বলছিল শুটিং ক্যান্সেল করবে, কিন্তু তাতে বদনাম হত। একাই গেল। আর হল আমার সর্বনাশ।

'কদ্দূর এগিয়েছে?'

'রোজ সন্ধ্যেবেলায় ঘরের দরজা বন্ধ না করলে অন্ধকার দেখছে।'

'হুম। বিয়ে করবে বলছে?'

'সেটাই তো বিপদ। দু-একদিনের মাখামাখি তারপর যে যার পথ দেখা, এতে চিন্তা ছিল না। মেয়েকে এত করে বোঝালাম, তুই এখন উঠতির মুখে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এখন বিয়ে করলে ক্যারিয়ারের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার এক কথা, পল্লব ছাড়া বাঁচতে পারবে না। বিয়ের পর বাচ্চা মানে ফিল্ম হয়ে গেল। তাহলে এ্যাদ্দিন এত চেষ্টা কেন করলাম? আর পটলদা ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারছ? ডেইলি প্রায় আড়াইশো টাকা খরচ। মেয়ে লাইন থেকে সরে গেলে আমি ভিখিরী হয়ে যাব। তুমি পারো আমাকে বাঁচাতে, যে করেই হোক বিয়েটা ভেঙে দাও।'

'ওটা প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজের মধ্যে পড়ে না।'

'আঃ। ইয়ার্কি মেরো না। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। আমাকে বাঁচাও। বিয়েটা যাতে না হয় তাই কর।'

'কি আশ্চর্য আমার কথা পল্লবকুমার শুনবে কেন?'

'শোনাতে হবে।'

'কি করে?'

'তা আমি জানি না। তোমার মাথায় নানা রকম বুদ্ধি খেলে। এটা বের করতে পারছ না। ধরো, কোন মেয়ের সঙ্গে পল্লব হোটেলে আছে। খবর পেয়ে আমি সোমাকে নিয়ে সেখানে গেলাম। নিজের চোখে সোমা সেটা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সব ছুটে যাবে।'

'দূর। এসব পঞ্চাশ দশকের ছবির চিত্রনাট্য। এখন চলবে না।'

'ও, এখন যেসব ছবি হিট করছে সেগুলো যেন বড় আধুনিক!'

'দাঁড়ান। আমরা একজনের সাহায্য নিতে পারি। উনি গল্প উপন্যাস লিখে বেশ নাম করেছেন। উনি যদি একটা স্ক্রিপ্ট বলেন।'

'কার কথা বলছ?'

পটলবাবু আমার নাম বললেন।

'ওঁকে আমি চিনি না, ঘরের কথা তাঁকে বলতে যাব কেন?'

'যখন দুজনের মাথায় বুদ্ধি আসে না তখন তৃতীয়জনকে দরকার হয়। তাছাড়া দাদা লোক খুব ভাল। আলাপ করলে খুব ভাল লাগবে। উনি এ ঘরেই আছেন।'

পটলবাবু গলা তুলে বললেন, 'দাদা, লেখা ছেড়ে এখানে একটু আসবেন?'

ভদ্রমহিলার গলা থেকে বিস্ময় ছিটকে উঠল, 'উনি এখানেই লিখছেন?'

পটলবাবু বললেন, 'এই ফ্ল্যাট ওঁরও পছন্দের।'

অগত্যা আমাকে পর্দা সরিয়ে বেরুতে হল। দেখলাম সুন্দরী, লম্বা, সুদেহী এক ভদ্রমহিলা নার্ভাস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল না। 'নমস্কার। কি সৌভাগ্য আমার আপনার দর্শন পেলাম।'

নমস্কার ফিরিয়ে বললাম, 'আসলে আপনারা সমস্যার কথা বলছিলেন বলেই বেরুতে পারিনি। সোমাদেবী আপনার মেয়ে? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

লজ্জায় বলে উঠলেন তিনি, 'তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। পনেরতে পড়তে সোমা কোলে এল। সেটা প্রায় বাইশ বছর আগের কথা।'

হিসেব করলে ভদ্রমহিলার বয়স দাঁড়ায় সাঁইত্রিশ। কিন্তু শরীর যতই যত্নে থাকুক মুখ বলছে সেই বয়স অনেককাল পেরিয়ে এসেছেন। আমরা বসলাম। বসেই তিনি বললেন, 'সমরেশবাবু, একটা অনুরোধ করব, আমার এখানে আসার কথা চতুর্থ ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। আমাদের লাইনটার অবস্থা জানেন তো!'

'আপনি তো অভিনয় করেন না।'

'ওমা। না করতেই আমায় নিয়ে গল্প। তাছাড়া স্ক্যাণ্ডাল ছড়ালে মেয়ের খুব ক্ষতি হবে। প্লিজ!'

পটলবাবু বললেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। ওহো, আপনি জানেন তো দাদা একটি সিরিয়াল কোম্পানির মালিকানায় জড়িত, চারটে গল্প ছবি হচ্ছে!'

'ওমা তাই? আমার সোমাকে একটা বড় সুযোগ দিন না। আপনার কথা ডিরেক্টর ফেলতে পারবে না। আপনারা তো রূপাকে সুযোগ দিয়েছিলেন মুক্তবন্ধে। দেখুন, আজ ওর হাতে কত ছবি। আমার মেয়েকে দেখেছেন?'

'না। সুযোগ হয়নি।'

'বারোটা ছবিতে করেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

'কিন্তু আপনার সমস্যা?'

'রাত্রে ঘুম আসছে না, জানেন। ওর যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে কোথায় দাঁড়াবো? তাছাড়া ওই পল্লবকুমার লম্পট। আমার সঙ্গেই.....।' ঠোঁট কামড়ালেন মহিলা।

'সেটা মেয়েকে বলেছেন?'

'না। তা পারিনি। বলা যায়, বলুন? একটা কিছু বুদ্ধি দিন না।'

'আপনি নিজে কেন ফিল্মে নামছেন না?'

'অনেকেই বলেছে। অমুক চক্রবর্তী আর্ট ফিল্ম করে, বলেছিল। খালি গায়ে বস্তির মাসী করতে হবে। ওরা তো পয়সা দেয়না তেমন। মা মাসী বস্তির রোলে আমি বাবা নামতে পারব না।'

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'ও, হাউ সুইট। কি রকম?'

'আগামী শনিবার নেতাজী ইনডোরে একটা বড় ফাংশন আছে। বম্বের আর্টিস্ট-ডিরেক্টররা আসছে। পি. এস. ভার্মা আসছেন।'

'ভার্মা? সাতটা সুপারহিট ছবির ডিরেক্টর। স্টার ডাস্টে পড়েছি।'

'আমাকে খুব ভালবাসেন। কতবার বম্বে যেতে বলেছেন। বাংলার মায়া ছেড়ে যেতে পারিনি। হাত দেখতে ভালবাসেন। অনুষ্ঠানের পর সোমাকে ওঁর কাছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে হাত দেখতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি?'

'তাতে কি হবে?'

'সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টারদের খবরটা দেব। ভার্মাজির ভোরের আগে হাত দেখা শেষ হবে না। বম্বে কলকাতার সব কাগজে খবর হয়ে যাবে। এত বড় খবরের কাছে পল্লবকুমার কুটোর মত ভেসে যাবে। আর যদি ভার্মাজি ওর হাতে হিন্দী ছবির নায়িকা হবার লক্ষণ দেখতে পান তাহলে পরের ছবিতে মিঠুনের এগেনস্টে বই করাবেন। মিনিমাম পাঁচ লাখ। অল ইণ্ডিয়া ফেম। পল্লব আউট।'

'আর যদি না সই করান?'

'পাবলিসিটি যা পাবে তাতেই মাথা ঘুরে যাবে মেয়ের। এখানকার প্রোডিউসাররা লাইন দেবে। কাজের পর কাজ এলে পল্লবকে পাত্তাই দেবে না। হাত দেখে ভার্মা যাতে একটা জব্বর ফোরকাস্ট করে যান তার ব্যবস্থা করব। আরে, কত নামকরা নায়িকা এখন লাইন দিয়েও ভার্মাকে হাত দেখাতে চান্স পাচ্ছে না।'

পটল খুব গ্রাম্ভারি চালে কথাগুলো বলতেই স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠলেন মহিলা। প্রায় দুহাতেই জড়িয়ে ধরলেন পটলকে। পটল 'করছেন কি, করছেন কি' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। একটু স্থির হতে মহিলা বললেন, 'তাহলে আর একটা উপকার করতে হবে!'

'আমার বাড়িতে যেতে হবে। এখনই।'

'কেন?'

'কাল ভোরে পল্লব সোমাকে নিয়ে প্রি-হানিমুনে যাবে গোপালপুরে। ওটা বন্ধ করতেই হবে। আমি বললে শুনবে না। আপনারা চলুন।'

পটল রাজী হল। আমি আপত্তি করলাম। বিস্ময়ে তখন আমি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার আপত্তি মানলেন না মহিলা। আমি যেহেতু লেখক তাই সোমা নাকি আমাকে সম্মান করবে। একটা নিঃসহায় মাকে বাঁচাতে হবে আমাকে। তাছাড়া, স্বীকার করছি, কৌতূহল বাড়ছিল আমার।

অভিনেত্রীর বাড়ি যেমন হয় তেমনই। বাইরের ঘরে সোমার চারটে প্রমাণ সাইজের ছবি, তাতে বিভিন্ন ধরনের পোজ। একটি ছোকরা বসে আছে। পটল আলাপ করিয়ে দিল। ওর প্রথম ছবি প্যানোরামায় দেখিয়েছে, উগাণ্ডায় একটা পুরস্কার পেয়েছে, রিলিজ করেনি এখনও। ছেলেটি বলল, আমার ছবিতে কাজ করলে সোমা ইন্টারন্যাশন্যাল ফেম পাবে। যে ছবি করছি সেটা মেক্সিকো ফেস্টিভালে যাবে কথা বলে এসেছি। তার মানে সোমাও যাচ্ছে সেখানে। যে রোলটা ওকে দেব সেটা ও ছাড়া কেউ পারবে না।'

'কি রকম রোল?' মহিলা জানতে চাইলেন।

'একটা ল্যাম প্রস্টিটিউট। মাণ্ডি দেখেছেন?'

'অসম্ভব। ওরকম খারাপ রোল করে মেয়ে নিজের সর্বনাশ করতে পারবে না। ও কোথায়?'

'মেক আপ নিচ্ছে ভেতরে। খারাপ রোল ? চরিত্রটা যে কোন অভিনেত্রীর পক্ষে দারুণ। বিদেশে দ্যাখেন না ?'

'কত টাকা দেবেন ?' মায়ের প্রশ্ন।

'দেখুন। টাকাটা বড় কথা নয়। আমার ছবিতে এখন এন.এফ.ডি.সি. টাকা দিচ্ছে। বাজেট খুব টাইট। দশ দিনের কাজ। তিন হাজার দেব। কিন্তু বিদেশে বেড়ানো ফ্রি। সেটা ভাবুন।'

'আপনি কাটুন। আমার মেয়ে আপনার ছবিতে কাজ করবে না।'

'মানে ? আপনি আমাকে অপমান করছেন ?'

'যদি তাই ভাবেন, ভাবতে পারেন।'

ছেলেটি রেগে-মেগে বেরিয়ে গেলে মহিলা বললেন, 'এই হয়েছে এক জ্বালা। ব্যাঙের ছাতার মত সব প্যানোরামা দেখায়।'

এই সময় দারুণ মেক-আপ নিয়ে মিনি স্কার্ট পরে সোমা বেরুলো। সামনা-সামনি দেখে বুঝলাম তিরিশের কাছে বয়স। সোমা বলল, 'ও কি সারপ্রাইজ। পটলদা, তুমি ? আচ্ছা, উনি কোথায় ?' মা বললেন, 'কেটে গেছে। তিন হাজার দিত। সোমা, পটলবাবু তোমার জন্যে একটা জব্বর খবর এনেছে! কি খবর পটলদা, বল।' লবঙ্গলতিকার মত সোমা পটলের চেয়ারের হাতলে এসে বসল। পটল একটু কুঁকড়ে বসে বলল, 'শনিবার ভার্মাজি কলকাতায় আসছে।'

'ভার্মাজি ? দিল্ কি লহর ? জানি তো। সঙ্গে সব হিরোইন থাকছে।'

'তা থাকুক। কিন্তু তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলে শো-এর পর তোমার হাত দেখতে চান।' পটলের কথা শেষ হওয়া মাত্র সোমা চিৎকার করে উঠল, 'সত্যি ?'

পটল মাথা নাড়ল, 'টপ সিক্রেট। হাতে সব ঠিক থাকলে নেক্সট ফিল্মে চান্স। পাঁচ মাসের কন্ট্রাক্ট।'

'সো সুইট !' এক লাফে নিজেকে শূন্যে নিয়ে গিয়ে নেচে নিল সোমা।

'কিন্তু একটা প্রব্লেম আছে।'

'কি ?'

'তোমার সম্পর্কে কোন গল্প ওঁর কানে যেন না যায়। উনি ফ্রেস মেয়ে চান। এই কদিন কারো সঙ্গে মিশোনা।' মা বললেন, 'তা কি করে হয়, কাল ওর গোপালপুর যাওয়ার কথা।'

'তুমি চুপ করো', মেয়ে ধমকে উঠল, 'আমি কোথাও যাব না। ভার্মার ছবিতে চান্স পাওয়ার জন্যে বুলবুল সোম মুখিয়ে আছে। তাকে টেক্কা দিতে হবে। আমি পল্লবকে ফোন করে বলছি প্রোগ্রাম ক্যানসেল।' সোমা ছুটে চলে গেল ভেতরে।

বুকে হাত দিয়ে প্রচণ্ড একটা নিঃশ্বাস নিলো ভদ্রমহিলা, 'আঃ! ভূত নামল। তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব পটলদা।'

'এখন উঠি।' পটলবাবু আমায় ইশারা করলেন। মহিলা আমায় বললেন, 'একদিন

আসুন না। দুজনে আপনার গল্প নিয়ে আলোচনা করব। লেখকদের আমার এত ভাল লাগে।'

বললাম, 'দেখা যাবে। কিন্তু এই পল্লবকুমারের ধাক্কা না হয় সামলালেন, ভার্মাজি যদি বিয়ে করতে চায়?' একগাল হাসলো মহিলা, 'বাপের বয়সী লোক। বউ মেয়ে আছে। বিয়ে করতে চাইলেও টিকবে না। তাছাড়া ওখানে তো রোজ ডিভোর্স হচ্ছে। তাতে বিরাট খোরপোষ। আর তখন না হয় আর একটা মতলব বের করা যাবে। আমার ষাট বছর হওয়ার আগে মেয়েকে বিয়ে করতে দিচ্ছি না। নামদাম হোক, উর্বশী পাক, তারপর বিয়ে। এত খাটুনি আমার জলে যাবে, বললেই হল?'

দশ

সুরজিৎ গুপ্তের ছবি আপনারা অনেকে দেখেছেন। অমুক ছবির মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক সুরজিৎ গুপ্ত, এইরকম ক্যাপশনের কথা মনে না পড়ার কোনো কারণ নেই। সুরজিৎ আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। কিন্তু মেদহীন ঈষৎ স্কয়াটে ধরনের শরীর বলে ওঁকে অনেক কম দেখায়। ধুতি-পাঞ্জাবির বাইরে পোশাক পরতে কেউ কখনও দ্যাখেনি সুরজিৎকে, আমিও না। আমার কথা বললাম এই কারণে সুরজিৎকে আমি চিনি প্রায় পঁচিশ বছর। তখন তিনি সমালোচনার ধারে-কাছে ছিলেন না। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল সত্যজিৎ রায় হওয়া। সেই সময়ে সত্যজিৎবাবুর নামডাক শুরু হয়েছে, ঋত্বিক ঘটক চমকে দিচ্ছেন দর্শককে, মৃণালবাবুর 'সুনীল আকাশের নিচে'র বিষয়-বৈচিত্র অনেকের ভাল লেগেছে, অনেকের কাবুলিওয়ালার কথা মনে পড়ছে, তপনবাবু বাণিজ্যধর্মী ভাল ছবির পরিচালক হিসেবে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন, মানে বাংলা ছবির বেরবার যুগ সেটা, আমাদের সুরজিৎ তখন পরিচালক হতে বদ্ধপরিকর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মত বাঙালীরা চিরকাল ধুতি-শার্ট পরেছেন। পাঞ্জাবিও নয়। সেই সময় এই পোশাক একধরনের আলাদা স্বীকৃতি দিত। সুরজিৎ ওঁদের পোশাকটা নকল করবেন। হেমন্তবাবু যদি ধুতি-শার্ট পরে বোম্বেতে গিয়ে নাগিন ছবির সুর করতে পারেন তবে তিনি কেন পারবেন না। কলেজ জীবনে নাটক করতেন সুরজিৎ। সেই সুবাদে দু-একজনের সঙ্গে চেনাজানা। সেই সময় থেকে বিদেশের কিছু ভাল ছবির চিত্রনাট্য পড়তে শুরু করলেন। তারপর বর্ধমানের এক বন্ধুর বাবার পয়সায় ছবি শুরু করলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। সেই মফঃস্বলের পয়সাওয়ালা মানুষটিকে আমি দেখিনি। যাঁরা নিজের পরিশ্রমে অর্থবান হয় তাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অবশ্যই বেশী। তা সেই মানুষটি কেন সুরজিৎকে টাকা দিতে গেলেন, বুঝতে পারিনি কখনও। কিন্তু আটদিন কাজ করার পর তিনি নিজেকে খুঁটিয়ে নেন। সুরজিতের সেই ছবি এ জীবনে শেষ হবে না। সেই ইচ্ছে তাঁর নেই। তার নায়ক-নায়িকারাও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। এরকম

সময় থেকে সুরজিৎকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মাঝখানে শুনেছিলাম উনি একটা সিনেমা পত্রিকায় স্টুডিও রিপোর্টারের ডায়েরী লিখছেন। ফিল্ম নিয়ে খুব পড়াশুনা করছেন। সিনে ক্লাব তৈরী করেছেন। তারপরেই একটি বড় পত্রিকায় নাটক এবং চলচ্চিত্র বিভাগের সম্পাদক হিসেবে যে যোগ দিয়েছেন সেটা জানা ছিল না। উনি যে কাগজে চাকরি করেছেন সেটি আমি নিয়মিত পড়ি। কিন্তু ওঁর ছদ্মনাম যে 'অবিকল্প' তা জানা ছিল না। একসময় যখন ছদ্মনাম ছেড়ে স্বনামে প্রকাশিত হলেন, তখন আর অজানা থাকল না।

এক অপরাহ্ণে সুরজিৎ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বড় সংবাদপত্রের অফিস, খুব আধুনিক ভাবেই সাজানো। দরজা ঠেলে দেখি জনা-চার বিশিষ্ট মানুষকে সামনে রেখে সুরজিৎ নিঃশব্দে হাসছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। আমি যে ঢুকেছি তা দেখারও চেষ্টা করলেন না। বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের দুজনের মুখ আমার চেনা। একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, অন্যজন তরুণ নায়ক। বাকী দুজনকে বেশ অর্থবান মনে হচ্ছে। পরিচালক মাখন-মাখানো গলায় বললেন, 'দাদা, আমি তোমার পায়ে বডি থ্রো করে দিয়েছি, মারতে হলে মারবে, বাঁচালে তুমিই বাঁচাবে।'

সুরজিৎ আরও একটু হাসলেন। তাঁর চোখ এখনও বন্ধ। এবং সেইভাবেই বললেন, 'কত করে বললাম তখন নীতা সোমকে নায়িকা করো না। কানেই তুললে না কথাটা। আরে, ওই বাঁশের মত চেহারার মেয়েকে দেখলে পাবলিকের ভাল লাগবে?'

পরিচালক পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন, 'আমার একার দোষ? প্রবীরবাবু আপনি নিষেধ করেননি। নীতাকে কম পয়সা দিতে হবে বলে?

প্রবীরবাবু হাত তুললেন, 'মোটেই না। পরিচালকের মুখের ওপর কথা বলি না আমি। আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে ফিল্ম প্রডিউস করছি, ঘরানা আছে আমাদের, আপনি চেয়েছেন নীতা সোমকে, তাই আমি না বলিনি।'

নায়ক চুপচাপ শুনছিল, এবার মুখ খুলল, 'দাদা, আপনার ওপরে আমার ক্যারিয়ার নির্ভর করছে। আগের দুটো ছবি ভাল চলেনি। এখন যদি একটু তোল্লাই না দেন তাহলে চোখে অন্ধকার দেখব।' এই সময় সুরজিৎ চোখ খুললেন এবং সে দুটো কোঁচকালেন। কারণ তাঁর নজর পড়েছিল আমার ওপর। চিনতে একটু সময় লাগল যেন তারপরেই বললেন, 'আরে তুমি? কী মনে করে? কতদিন পরে দেখা হল। বসো, বসো।' পঞ্চম চেয়ারটি দেখিয়ে দিলেন তিনি। ভঙ্গী দেখে বিশ্বাস হল, অখুশী হন নি।

হেসে বললাম, 'চলে এলাম আপনাকে দেখতে।'

'বসো। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।' তিনি চারজনের দিকে তাকালেন, 'আজকাল টালিগঞ্জে একটা কথা চাউর হয়েছে যে, সমালোচনার ওপর ছবি চলে না। একশবার চলে না। তা আমি বলি বাবা, তাহলে আর আমার কাছে আসা কেন।'

পরিচালক প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললেন, 'ওসব বাজে কথায় কান দেন কেন?

এই তো 'মেঘের মাদল' ছবিটা, প্রথম ছ'দিন হলে মাছিও বসছিল না, যেই আপনি দু'কলম প্রশংসা লিখলেন অমনি সেল বাড়তে লাগল।' সুরজিৎ বললেন, 'বলো। কে বোঝাবে ওদের? সমালোচনা না থাকলে দর্শকদের সঙ্গে কে ছবির পরিচয় করিয়ে দেবে? এই যে সত্যজিৎবাবু, 'পথের পাঁচালি' যখন করেছিলেন তখন সাধারণ মানুষ তাঁকে চিনতো? ছবি তো রিলিজ হল। সেইসময় পঙ্কজদা, মানে পঙ্কজ দত্ত পথের পাঁচালির প্রশংসা করে যে রিভিউ লিখলেন সেটা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একটা রিমার্কেবল ব্যাপার হয়ে গেল। যাক, এসব কথা বলে তো কোনো লাভ নেই। হাউস রিপোর্ট কেমন?' 'কাল ছবি রিলিজ করেছে। ফিফটি পার্সেন্ট এ্যাডভান্স নিজেরাই কিনে দুটো শো-এর টিকিট ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করেছি আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে। এসব তো আপনার অজানা নয়। কিন্তু দুটোর বেশী হাততালি পড়ছে না।' প্রবীরবাবু বললেন।

'ইন্টারভ্যালের আগের মুহূর্তে বা ছবির শেষে পড়েছে?'

'না।' পরিচালক মাথা নাড়ল।

'চিন্তার ব্যাপার! দেখি কি করা যায়।'

প্রবীরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কবে দেখবেন দাদা। আগামীকাল প্রেস শো।'

'না, না। প্রেস শো-তে যেতে পারব না। কাল একটা বোম্বে ছবির পার্টি আছে। রবিবার ইভনিং চারটে টিকিট ভারতীতে দিলেই চলবে।'

সুরজিতের কাছে আরও খানিকটা কাকুতি মিনতি করে ওরা শেষ পর্যন্ত উঠলেন। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সুরজিৎ রিসিভার তুলে কিছু শুনে বললেন, 'পাঠিয়ে দিন। রিসিভার রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দু'দণ্ড নিরিবিলিতে থাকব তার উপায় নেই। একজন বিখ্যাত নায়িকা আসছেন দেখা করতে।'

'তাহলে আমি উঠি।' আমি সত্যি উঠতে যাচ্ছিলাম।

'না, না। তুমি বসো। ওরকম একটা ব্লো হট নায়িকার সঙ্গে একা থাকলে তোমার বৌদি মেসিনগান চালাবে। তা তোমার তো একটু আধটু নামটাম হয়েছে। কোন গল্পো সিনেমা হয়েছে?' সুরজিৎ পকেট থেকে পানবাহারের কৌটা বের করে খানিকটা মুখে দিলেন।

'না। আসলে সিনেমার মত করে গল্প লিখতে পারি না তো।'

'যাচ্চলে! এটা কি বললে? বিভূতিভূষণ সিনেমার মত করে পথের পাঁচালি, অপরাজিত লিখেছিলেন বুঝি? তারাশংকরের নাগিনী কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, সমরেশ বসুর গঙ্গা কি সিনেমার কথা ভেবে লেখা?'

'না। কিন্তু ওসব গল্প যারা করেছেন তারা স্রষ্টা। অন্য পরিচালকরা—।'

কথা শেষ হল না। একটু সুন্দরী মুখ, রঙের প্রলেপ চমৎকার, দরজা খুলে উঁকি মারল, 'সুরজিৎদা আসব?'

সুরজিৎ মাথা নাড়লেন।, 'আসুন, আসুন।'

ইনিই নায়িকা, 'ওম্মা, তুমি আজও আমাকে আপনি বলছ সুরজিৎদা। আমি অবশ্য আজ একা নই, সঙ্গে মা আছেন।'

'ও, তিনি কোথায় ?'

'নীচে রিসেপশনে। আগে যখন সঙ্গে থাকত তখন খারাপ লাগত না। এখন তো সব চিনে গিয়েছি অথচ মা কিছুতেই বোঝে না।'

'মায়ের মন তো।'

'রাখো। ডায়ালগ বলা হচ্ছে। যাক্, বসতে বলো।' ততক্ষণে তাঁকে আমি দেখেছি। ব্লো হট শব্দটি বাংলা নাটকের বিজ্ঞাপনে প্রথম নজরে পড়েছিল। শব্দটির সঙ্গে যৌনতা মিশে আছে। সুরজিৎ যে অর্থ করেছেন তার সঙ্গে কোন বেমিল দেখছি না। ইনি সুতপাদেবী। গোটা চারেক ছবিতে কাজ করেছেন। অভিনয় দেখিনি। কিন্তু এমন ডেয়ো পিঁপড়ের মত নিতম্ব আর উদ্ধত উর্ধ্বাঙ্গ সচরাচর নজরে পড়ে না। কোমর সরু, গায়ের রঙ মোমের মত, দীর্ঘাঙ্গিনীর নাকটাই যা একটু গোলমেলে।

সুরজিতের অনুরোধ রেখে সুতপাদেবী বসলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি যেন মনে করছেন ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। একটু ঝুঁকে বসলেন সুতপাদেবী, 'আমার একটা উপকার করতে হবে তোমাকে। না বললে শুনছি না। বলো কথা রাখবে।'

সুরজিৎ ঈশ্বরের মত হাসলেন, 'কি ব্যাপার শুনি আগে।'

'না, কোন কথা শোনাবো না। আগে বল কথা রাখবে ?'

বলতে বলতে তাঁর বুকের আঁচল খসে পড়ল টেবিলের ওপর। সেটাকে তোলার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শক্তি সামন্তকে আমার কথা একটু বলবে ?'

'শক্তি ? কেন ?'

'আঃ ন্যাকা। জানো না যেন। পরের বাংলা হিন্দী ছবিটায় কাস্ট চাইই চাই।'

'ও তো বম্বের হিরোইন নেয়।'

'আমি কিছু কমতি আছি। ওঁর ছবিতে কাজ না করলে ব্রেক পাওয়া যাবে না। খবর পেয়েছি, কাল রাত্রে পার্ক হোটেলে উঠেছেন উনি। তুমি টেলিফোন করলেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাব।'

'ওটা তুমি নিজে টেলিফোন করলেই পাবে।'

'দূর ! কেমন ভিখিরি-ভিখিরি লাগে আগ বাড়িয়ে বলতে।'

'ঠিক আছে, দেখছি।'

'না। এখনই টেলিফোন করো।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন রিসিভার তুলে পার্ক হোটেল চাইলেন সুরজিৎ। এই সময় আমার দিকে তাকালেন সুতপাদেবী। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে আঁচল টেনে নিয়ে অনাবশ্যক তৎপরতায় নিজেকে ঢাকলেন টান-টান করে। 'হ্যালো, পার্ক হোটেল ! আমি একটু শক্তি সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম সুরজিৎ

গুপ্ত ফিল্ম ক্রিটিক। ও আচ্ছা!' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সুরজিৎ, 'শক্তি হোটেলে নেই। ঠিক আছে, আজ রাত্রে দেখা হবে। পার্টি আছে, তখন বলব। এর সঙ্গে আলাপ আছে? সাহিত্যিক। গল্পের ডিম্যাণ্ড হচ্ছে।' সুতপাদেবী আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, 'ওমা। তাই? আপনাকে লেখক বলে মনেই হয় না। আমি অবশ্য অঞ্জনদা ছাড়া কোন লেখককে দেখিনি।'

'অঞ্জনদা?'

'সেকি! আপনি অঞ্জন চৌধুরীর নাম শোনেননি?' কোথায় থাকেন? ওঁর ছবির সব গল্প ওঁরই লেখা।'

আমি সুরজিতের দিকে তাকালাম। সুরজিৎ বললেন, 'না না, ফিল্ম করছে বলে মনে করার কারণ নেই সাহিত্যিক হিসেবে খারাপ। তবে দুটো আলাদা লাইন।'

সুতপাদেবী উঠলেন, 'আমি কাল সকালে ফোন করব?'

'বাড়িতে থেকো আজ রাত্রে, প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব।'

'সো নাইস অফ ইউ। ওহো, যে জন্যে এসেছিলাম তাই বলা হয়নি।'

'কি ব্যাপার?'

'সামনের রবিবার সন্ধ্যায় ফ্রি আছো?' চোখ ঘোরালো সুতপাদেবী।

'কেন?' ছোট্ট হাসলেন সুরজিৎ।

'আমার মা তাঁর বাকী জীবনের সঙ্গীকে সেদিন বেছে নেবেন আইনসম্মত করে।'

'তাই নাকি? লোকটি কে?' সুরজিৎ চেঁচিয়ে উঠলো। 'শঙ্কর মিত্র। ফিল্ম প্রোডিউসার। আমার বাবা একটা দুশ্চিন্তা গেল। আসছ?'

'সিওর।'

সুতপাদেবী চলে গেলেও আমার হতভম্ব ভাবটা কাটছিল না। মায়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন অভিনেত্রী? এঁর বয়স যদি তিরিশ হয় মা তো পঞ্চাশ হবেনই। সেই মহিলাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। তারপরেই মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার রবিবার সন্ধ্যায় সিনেমার যাওয়ার কথা না?'

'যাব তো।'

'তাহলে এঁকে বললেন যে যাব।'

'বলতে হয়। মুখোমুখি কাউকে অখুশী করতে নেই। কোথায় যাবে এখন?'

'আড্ডা মারতে বেরিয়েছিলাম।'

'চল আমার সঙ্গে টালিগঞ্জে। স্টুডিওতে।'

'আপনার তো আজ শক্তি সামন্তর সঙ্গে পার্টিতে কথা আছে।'

'দূর। কোন পার্টিফার্টি নেই। ভদ্রলোক যে এসেছেন, তাই জানতাম না।'

আমি চমকে উঠলাম। ফিল্ম লাইনের দু'নম্বরী ব্যাপার যে একজন নামী চলচ্চিত্র সমালোচকের রপ্ত করতে হয়, তা জানা ছিল না। কিন্তু সুরজিৎ গুপ্তকে আরও

জানতে ইচ্ছে করছিল। অতএব সঙ্গী হলাম। খবরের কাগজ থেকে দেওয়া ওঁর গাড়িতে উঠে বললাম, 'সুরজিৎদা আপনি আর ছবি করবেন না?'

'ইচ্ছে আছে। কিন্তু সাহস পাই না।'

'কেন?'

'যদি ফ্লপ করে। বাজে ছবি করিয়েদের এত গালাগালি দিই যে, নিজের ছবি খারাপ হলে চাকরিটা থাকবে না। ধরা পড়তে চাই না ভাই।'

'আপনার সঙ্গে সব শিল্পী পরিচালকের আলাপ আছে?'

'কি বলছ? এদের সঙ্গেই তো ওঠাবসা। টালিগঞ্জ থেকে ধর্মতলা পাড়া, কার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক নেই? এই তো, আজ সকালেই মিঠুনের সঙ্গে কথা বলেছি?'

'ধর্মতলা পাড়া মানে?'

'ওহো। টালিগঞ্জে ছবি হয়। যারা করে প্রযোজক-পরিবেশক তাঁদের বেশীর ভাগ থাকেন ধর্মতলায় অফিস করে। টাকা তো এখানেই ওড়ে।'

'আপনি প্রবীরবাবুর ছবিকে বাঁচাবেন কি করে?'

'আছে হে কায়দা আছে। সব সময় অবশ্য ক্লিক করে না। ধরো, আমি একটা ছবিকে দারুণ প্রশংসা করলাম। যেমন উৎপলেন্দুর 'চোখ', বুদ্ধদেবের 'দূরত্ব' অথবা গৌতমের 'দখল'। বললাম যুগান্তকারী ছবি দারুণ ট্যালেন্ট পরিচালকের, সঙ্গে ম্যানোয়াসা বা বাইরের ফেস্টিভ্যালের ব্যাকিং আছে। চলবে ছবি? পাবলিক নিজের মত রিঅ্যাক্ট করে হে। তাও আবার যুগে যুগে পাবলিক পাল্টায়। 'ছুটি' ছবি এখন রিলিজ করলে চলত কিনা সন্দেহ! আসলে সব কিছু এক সময় পুরোন হয়। সুখেন দাস ছবি করতে এসে সুপারহিট তৈরী করল। পর পর। কিন্তু ফর্মুলার রিপিট হতে আরম্ভ করল অমনি হয়ে গেল। অঞ্জন চৌধুরী সুখেনের ফর্মুলাকে আর একটু বুদ্ধি দিয়ে এমন মশলা তৈরী করে নিল, পাবলিকের না খেয়ে উপায় নেই।'

'তাহলে প্রবীরবাবুরা আপনাকে অনুরোধ করলেন কেন?'

'ধরো, আমি লিখলাম ছবিটি জমজমাট, তবে ভাল ছবির সংজ্ঞায় পড়ে না। কারণ এতে এই আছে সেই আছে, এই চমক আছে ওই সেক্স আছে, ফাইটিং আছে, গল্পের গরু গাছে উঠেনি কিন্তু গুতিয়েছে অমনি পাঠক মনে করবে ছবিটায় খুব কিছু এন্টারটেইনমেন্ট আছে। তারই ধক-এ দুতিন সপ্তাহ চলে যাবে, যদি মেকিং স্মার্ট হয়। তাতে ছবির সেল উঠলে প্রবীরবাবুরা আশা করতে পারে ছবিটা পরেও চলতে পারে।' সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলেন সুরজিৎ।

'এরকম হলে তো বাজে পরিচালকের ফালতু ছবিকেও ব্যাক করে কয়েক সপ্তাহ চালাতে পারেন।'

'কখনো না। আমার শিল্প সম্পর্কে ধারণা নেই নাকি। এদেশে ছবি হয় অনেক। বাংলাতে বছরে তিরিশটা। আগে আমাদের এক বছরে তিনটে ছবি দেখতে হতো। রেফারি হিসেবে যেমন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিং এর ম্যাচ খেলাতে

হয়। সত্যজিৎ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক। এই তিনজনের ছবি দেখলেই সারা বছরের ছবি দেখা হয়ে যায়। তোমাকে একটা ঘটনা বলি, শোন! দেখো, আবার লিক করোনা।'

সুরজিৎ জানালা দিয়ে রাস্তা দেখে নিলেন একবার, 'এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় ছবি বেরুচ্ছে, তার সব কটা কি দেখা সম্ভব? কিছু আছে, ইন্টারভ্যাল পর্যন্ত বসে থাকা যায় না। পর পর গোটা চারেক ছবি দেখলে এর গল্প ওর মনে হয়। এখন তো দশ মিনিট দেখলেই বুঝতে পারি ফর্মুলাটা কি, ছবি কিভাবে শেষ হবে। পরিচালকের নাম আর ছবির নাম পড়ে হলে না গিয়েও গল্প বলে দিতে পারি। অথচ মালিকপক্ষ চাইলেন প্রতিটি ছবির সমালোচনা যেন আমি কাগজে লিখি। গর্ভযন্ত্রণা তার চেয়ে ভাল। তাই আমি কিছু ছবি না দেখেই সমালোচনা করি। বছরে অন্তত তিরিশটা।'

'সেকি কেউ বুঝতে পারে না?'

'কেউ না, এমন কি সেই ছবির পরিচালক দেখা হলে বলে দাদা আমাকে বড্ড গালাগাল করেছেন। একটু চাপলে বেঁচে যেতাম। বোঝ ব্যাপারটা। এসব ক্ষমতা অবশ্য বেশী দিন লাইনে থাকলে হয়। বিধান রায় যেমন রোগীর লক্ষণ দেখেই রোগ বলে দিতে পারতেন। এই যেমন ধরো, অঞ্জনের ছবি। এ্যাকশন, মেলো, চোখের জল, দারুণ যেন, মা ছেলে অথবা দাদা ভাই কিংবা গুরু শিষ্যের সম্পর্কে, টান-টান নাটক এবং তা করতে যত অবাস্তব ব্যাপার, সব চুলোয় যাক। সুখেনের ছবি মানে গল্পের গরু গাছে উঠে চোখের জলে স্নান করছে। এখন আর ভাবতে হয় না।'

'কিন্তু অভিনয়?'

'তুমি খবর রাখো না। বাংলা ছবিতে নায়ক বলতে দুজন, তাপস আর প্রসেনজিৎ। নায়িকা দেবশ্রী, মুনমুন, শতাব্দী। এরা এত ছবি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, মানে যে দেশে গাছ নেই সে দেশে ঘাসও গাছ, উত্তমবাবুও বোধ হয় 'এত মূল্য পাননি। তা এরা আর কি নতুন অভিনয় করবে? একই গলায় একই অভিব্যক্তিতে কথা বলে যায়। ওই বললাম না তখন, বছরে তিনটে ছবি দেখতে হয়। এখন ঋত্বিকবাবু নেই, তার বদলে তরুণ মজুমদারের ছবি। আর ছবি দেখি অনুরোধে পড়ে। একবার এক বিখ্যাত পরিচালকের ছবি দেখে লিখব। দিন আটেক বাদে ফিরে এসে দেখি ছবি উঠে গিয়েছে। দু'দুটো ফেস্টিভ্যালে প্রাইজ পেয়েছে ছবি, না বললে পারা যায় না। অথচ দ্যাখার সুযোগ নেই। আমাকে দেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই আলাদা প্রজেকশন হবে না। অতএব পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করলাম, যারা ছবিটা দেখেছে। তারপর লিখে দিলাম দু'পাতা।

সত্যি বলছি, ছাপা হয়ে যাওয়ার পর একটু নার্ভাস ছিলাম। কারণ আমার পরিচিত সাধারণ মানুষের যে যে পয়েন্ট খারাপ লেগেছিল, তাই লিখে দিয়েছিলাম। দিন

সাতেক পরে পরিচালকের চিঠি এল দপ্তরে। তিনি কৃতজ্ঞ। এত বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা ছবিটির নাকি কেউ করেনি। ত্রুটিগুলো ভবিষ্যতের ছবিতে নিশ্চয়ই হবে না।' সুরজিৎ গুপ্ত হাসতে লাগলেন ঈশ্বরের মত।

টালিগঞ্জে স্টুডিওয় ঢোকা মাত্র হৈ-চৈ পড়ে গেল। বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো পর্যন্ত সুরজিতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। নায়ক-নায়িকা পরিচালক ওঁকে মাঝখানে রেখে ছবি তুললেন। বুঝলাম ছবির মহরৎ হচ্ছে। দাঁত বের করে ক্লাপস্টীক দিলেন তিনি। পরিচালক বক্তৃতা দিলেন, 'আজ আমি ভাগ্যবান কারণ ভারতখ্যাত চিত্র-সমালোচক সুরজিৎ গুপ্ত দয়া করে ছবির মহরতে এসেছেন। তাঁকে আমরা দাদা বলি। তিনি বাংলা ছবির অভিভাবক। আমাদের বিপদে তিনি সাহায্য করেন। টালিগঞ্জ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।'

উত্তরে সুরজিৎ বললেন, 'আমি বাংলা ছবির সেবক মাত্র। সততাই আমার মূলধন।'

গোটা কুড়ি প্রণাম কুড়িয়ে সুরজিৎ আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সুরজিৎ বললেন, 'চল, তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাই। একা যাওয়া ঠিক নয়।'

'কোথায় যাবেন?'

'কাছেই, লেক গার্ডেন্স। একটি মাত্র সম্ভাবনাময় মেয়ে এসেছে লাইনে। একটু প্রচার করলে বাংলা ছবির নায়িকা-সমস্যা মিটতে পারে। তাই ইনটারভিউ নেব।' কৌতূহল বাড়ছিল। লেক গার্ডেন্সে ঢুকে বেশ কয়েকজনকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে আমরা নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে পৌঁছালাম। বেল বাজাতে একটি রোগা মানুষ দরজা খুলল। উনি বললেন, 'খবর দিন, সুরজিৎ গুপ্ত এসেছে।'

তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী দৌড়ে এল, 'ওমা, আপনি! কি ভাল! আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আজ আসবেন। আসুন। ও মা, মাগো!'

সুরজিৎ বললেন, 'সময় হাতে ছিল। অসুবিধে করলাম না তো।'

সারা মুখে আলো ফুটিয়ে মেয়েটি বলল, 'মোটেই না।'

সাজানো ড্রইংরুমে বসলাম আমরা। একজন মোটাসোটা মহিলা এসে দাঁড়ালেন ভেতর থেকে হাসি-হাসি মুখে। হাসিতে একটু নার্ভাসনেস লেগে আছে। মেয়েটি সুরজিতের সঙ্গে তার মায়ের আলাপ করিয়ে দিল। সুরজিৎ আমার পরিচয় দিলেন। মেয়েটির মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সিনেমার বই লেখেন?'

মাথা নেড়ে না বলতেই ওঁদের আগ্রহ চলে গেল।

মেয়েটির পরনে প্যান্ট আর গেঞ্জি। বিপরীত দিকে বসল সে। সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটা ছবিতে সাইন করেছ?'

'দুটো। সাইড পার্টে।'

'আঃ। ছোট রোল কেন করছ?' সুরজিৎ বিরক্ত হলেন।

'আপনি একটু দেখুন, দাদা।'

'দেখব। শক্তি সামন্ত এসেছে শহরে। ওর সঙ্গে কথা বলব। তার আগে তোমার

একটা ইন্টারভিউ ছাপব।

'ও, কি দারুণ! কি খাবেন বলুন?' মেয়েটি হাততালি দিল, 'চা, কফি।'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

'ওহো! 'মেয়েটি ঘুরে রোগা লোকটিকে বলল, 'শোন, দাদার জন্যে স্কচের বোতল আর গ্লাস নিয়ে এস ভেতর থেকে। ইন্ডিয়ান হুইস্কিটা এনো না।'

সুরজিৎ বললেন, 'তোমার কাছে স্টক থাকে, দেখছি।'

ওর মা বললেন, 'ফিল্মের লোক এলে দিতে হয়। তবে মেয়ে কাউকে স্কচ দেয় না। আপনাকে তো খুব শ্রদ্ধা করে, তাই।'

আমি ড্রিঙ্কস নিলাম না। সুরজিৎ দুঘন্টায় পাঁচ পেগ খেলেন। এইসময় প্রশ্নগুলো যা হল, তার সারমর্ম এইরকম।

'তোমার বয়স?'

'কত বললে ভাল হয়?'

'একুশ। একুশই লিখলাম।' সুরজিৎ ডায়েরিতে লিখলেন, 'পড়াশুনা?'

মেয়েটির মা জবাব দিল, 'আমরা তো সোদপুরে ছিলাম। সেখানকার স্কুলে পড়তে পড়তে। কথা থামিয়ে রোগা লোকটিকে দেখলেন তিনি। মেয়েটি একটু চড়া গলায় লোকটিকে বলল, 'আঃ, কতবার বলেছি কথার সময় মুখের সামনে থাকবে না।' লোকটি ভেতরে চলে গেল।

সুরজিৎ বললেন, 'না। সোদপুর ইচ্ছাপুর বলবে না। তুমি লরেটোতে পড়তে। মনে রেখো। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সিতে। কি করে লাইনে এলে?'

'ওঃ, কত লোকের কাছে ঘুরেছি। সবাই ঠকিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শোভনদা সাইড রোলে চান্স দিল।'

'দূর। এসব বলবে না। প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিলে, এমন সময় শোভন তোমাকে প্রস্তাব দিল ফিল্মে অভিনয় করার জন্যে। তুমি খুব নার্ভাস হয়ে গেলে। শোভন বাড়িতে এল। শেষ পর্যন্ত তোমার মা মত দিলেন।'

'দারুণ।' মেয়েটি হাততালি দিল।

সুরজিৎ বললেন, 'একটা ডিগনিটি না থাকলে পাঠকরা চার্মড হবে কি করে? বাবা কি করেন? ব্যবসা না চাকরি?'

মেয়েটির মা বলল, 'উনি আগে বড়বাজারে দোকান করতেন। শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় বিক্রী করে বাড়িতে বসে আছেন।'

'নাঃ। এটাও চলবে না। লিখছি, তিনি চা-বাগানের মালিক। তোমার শৈশব কেটেছে চা-বাগানে। ফলে মনে শরীরের ফ্রেশনেস আছে। অভিনয় কার কাছে শিখেছ?'

'কারো কাছে না।' মেয়েটি মুখ কালো করল, 'কেউ শেখায় না।'

'না। সেটাও বলবে না। তুমি নাটক দেখতে। শম্ভু মিত্র উৎপল দত্তের নাটক।

এক নাটক দশবার করে। বুঝতে পারলে। নাটকগুলোর নাম আমি লিখে দেব। তুমি পড়ে মুখস্থ করে ফেলো। বিয়ে-থা ?'

মা ও মেয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করল।

সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেরকম মতলব আছে নাকি ? তাহলে ক্যারিয়ার খতম হবে।'

মেয়েটি আঁতকে উঠল, 'না, না। লিখুন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।'

'না। ইচ্ছে নেই বলাটা খারাপ। বিবাহিতা পাঠিকারা রেগে যাবে। লিখব, এখনই ভাবছি না আগে ভাল অভিনয় করি, প্রতিষ্ঠা পাই, তারপর যদি স্বপ্নের মানুষটির দেখা মেলে, তাহলে আপনাদের আশীবাদ নিয়ে ওটা করব। এখনই না, কিছুতেই না।' খসখস করে লিখে সই করিয়ে নিলেন মেয়েটিকে দিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি আছে তো ?'

আমি বললাম, 'এবার উঠি, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। সুরজিতের খেয়াল হল, 'ও হ্যাঁ, তুমি তো আবার শ্যামবাজার যাবে।'

মেয়েটি বলল, 'শ্যামবাজার ? মা, ওকে বলো এর সঙ্গে চলে যেতে। ইনি কেন একা যাবেন ? দাদার সঙ্গে এসেছেন যখন ?'

রোগা লোকটির সঙ্গে আমি বেরিয়ে এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

লোকটি বলল, 'কাশীপুর। ওখানেই আমার চালডালের ব্যবসা। সুরজিৎবাবু খুব নামকরা লোক, এবার নিশ্চয়ই ও চান্স পাবে, না ?'

'সম্ভাবনা আছে।' আমি আর কি বলি।

'সোদপুর থেকে কাশীপুর আমাদের বাড়িতেই ভাড়াটে হয়ে এল যখন তখন আলাপ।'

'আপনি রোজ আসেন ?'

'যেদিন ও ব্যস্ত থাকে সেদিন আসি না। তেইশ বছরের সম্পর্ক তো !'

'তেইশ ?'

'হ্যাঁ। সোদপুর থেকে ও এসেছিল এগারো বছর বয়সে। পনেরো বছরে পড়তেই বিয়ে হল আমাদের। তাই তো পড়াশুনা হল না বেচারার।'

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ বাদে বললাম, 'ওকে নিজের কাছে রাখেননি কেন ?'

'কাশীপুরের বাড়ি থেকে নায়িকা হওয়া যায় না। ওর নায়িকা হবার খুব শখ। যা খরচ লাগবে, তা আমিই দিচ্ছি। ও যদি নায়িকা হয় তার চেয়ে আনন্দ কিছু নেই।'

'আপনার খারাপ লাগে না এই মদ খাওয়া, পাঁচজন আসে যায়।

'পথে হাঁটতে গেলে নতুন জুতোয় ফোস্কা পড়ে বইকি। ও কিছু না।'

পরের সপ্তাহে ইন্টারভিউ ছাপা হল। সঙ্গে একুশ বছরের যুবতীর লাস্যময়ী ছবি। বাংলা ছবির নায়িকার অভাব মেটাতে প্রতিভাময়ী শিক্ষিতা কুমারী নায়িকার কথা সুন্দর ভাবে লেখা হয়েছে তাতে। তলায় নিজের নাম পুরো না লিখে সুরজিৎদা আদ্যাক্ষর দিয়েছেন, এস. জি.।

এগারো

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, জহর গাঙ্গুলিরা এক সময় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু পঞ্চাশ দশকের পরে বাঙালী দর্শক কিন্তু তাঁদের দাদু অথবা বাবা হিসেবে যে-রকম গ্রহণ করেছিল, নায়ক হিসেবে তত সাফল্য পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। সময় বিচার করলে তাঁদের নায়ক হবার কথা প্রমথেশ বড়ুয়া দুর্গাদাসের সময়ে। আমরা খামোকা বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক বাংলা ছবি পিতামহ-পিতৃহীন ছিল না। পাহাড়ি সান্যাল রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর গান-বাজনা জ্ঞান তো প্রায় ওস্তাদের মতনই। দরাজ দিল, আপনভোলা চরিত্রগুলো চমৎকার করতেন। কিন্তু আমি তাকে মনে রাখব কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে। জহর গাঙ্গুলির প্যাটার্ন অফ এ্যাক্টিং তাঁর নিজস্ব ছিল কিন্তু তিনি আমাকে খুব একটা টানতেন না। তার মানে এই নয় যে, আমি তাঁর প্রতিভা-বিষয়ে কটাক্ষ করছি, আমি ব্যক্তিগত পছন্দের কথাই বলছি। এঁদের পাশাপাশি ছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, শিশির বটব্যাল এবং কিছু বাদে নায়ক-ভিলেন থেকে সরে এসে বিকাশ রায়। রাধামোহন এক ধরনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন তাঁর শিক্ষা থেকে অর্জিত প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্যে। কমল মিত্র প্রায় এক স্কেলে সব চরিত্র বেঁধে ছিলেন বটে, কিন্তু কড়া বাবা হিসেবে বাঙালী তাঁর মধ্যেই সামাজিক প্রতিফলন আবিষ্কার করেছিল। অভিনেতা হিসেবে বিকাশ রায় কতটা ওপরের স্তরে, তা নিয়ে আজও বিশ্লেষণ হয়নি। মনে আছে সুচিত্রা সেনের বিপরীতে ভালবাসা ছবিতে তাঁকে এক সময় দারুণ রোমান্টিক লেগেছিল, আবার 'জ্যোতিষী' ছবিতে (প্রায় কাছাকাছি সময়ে) ওঁকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। বিয়াল্লিশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কতরকমের চরিত্র তিনি উপহার দিয়ে গেলেন, তা শুনতে বসলে অবাক হতে হয়। শেষের দিকে তিনি বাবা হচ্ছিলেন। এই একটি মানুষ দারোগা থেকে চাকরও সেজেছেন। ওর চেহারা সব রকম চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মানাতো। 'দৌড়' ছবির শুটিং এর সময় ওর সঙ্গে একটু হৃদ্যতা হয় আমার। সব রকম ভূমিকায় অভিনয় করেও ওঁর আক্ষেপ ছিল ভাল পরিচালকরা তাঁর প্রতি অবহেলা করেছেন। প্রায় এই রকম অভিমান নিয়েই তিনি কর্মজগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন, যা এদেশে অভিনব। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে বাধা নেই, বাংলা ছবির বাবা হিসেবে তিনি খুব একটা সফল হননি।

পাঠক বুঝতেই পারছেন আমি একটি নাম এতক্ষণ সরিয়ে রেখেছিলাম। এক

সময় আমাদের মধ্যে তর্ক হত এবং সবাই একমত হতাম বাংলা ছবির সর্বকালের সেরা অভিনেতার নাম ছবি বিশ্বাস। কাবুলিওয়ালা অথবা জলসাঘরের কথা ছেড়ে দিন, রাশভারি অথচ স্নেহপ্রবণ পিতা হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল যে সাম্রাজ্য চালিয়ে গিয়েছিলেন, তার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা নিয়ে কেউ আসেন নি। একথা ঠিক, উত্তমকুমার তাঁর শেষ দিকের অভিনয় জীবনে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, একমাত্র তিনিই ছবি বিশ্বাসের অভাব পূর্ণ করতে পারেন কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল না, সেটা হোক। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে বাঙালী পিতার রক্তে অহঙ্কার ছিল।

এখন পিতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্ক বন্ধুর মত, ছোট্ট ইউনিটের ফ্যামিলি যত বাড়ছে, তত বাপ মেয়ের ব্যবধান কমছে। সে-সময়ে এটা ভাবা যেত না। মেয়ের ওপর সবরকম কর্তৃত্ব নিয়ে বাবা বিরাজ করতেন। পান থেকে চুন খসলেই সংঘর্ষ হত। এই ব্যক্তিত্ব বাংলা ছবিতে ছবি বিশ্বাস ছাড়া আর কারো ছিল না। তাঁর ম্যানারিজম ছিল না বললে ভুল হবে। কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল এবং সেটি বেশ অভিজাত। এই ভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর চেহারা চমৎকার মানানসই ছিল। এরকম চেহারার কোন অভিনেতাও পরের প্রজন্মে এলেন না। আমার এক বন্ধুর কলেজ জীবনে শখ ছিল অভিনেতাদের গলা নকল করা। ওঁর খুব ভাল লাগত ছবি বিশ্বাসের ঢঙে কথা বলতে। একবার সবাই দল বেঁধে দীঘায় গিয়েছি। সন্ধ্যে নামলে দীঘায় সমুদ্রের গায়ে বসে বন্ধু হঠাৎ ছবিবাবুর গলা নকল করে সংলাপ বলে যেতে লাগল। সেই বিখ্যাত সংলাপ, অভাব দরজা দিয়ে ঢুকলে ভালবাসা জানালা গলে পালিয়ে যায়। তুমি যা মাইনে পাও তাতে তো আমার মেয়ের একটা শাড়িও হবে না, হুম্। বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল সংলাপ শোনার জন্যে। অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই বন্ধু কথা বলছেন, মনে হবে ছবি বিশ্বাস সংলাপ বলে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ছবির সংলাপ ছেড়ে জীবনের স্বাভাবিক কথাগুলো বন্ধু ছবিবাবুর গলায় বলে যেতে লাগলেন। প্রথমে স্বাধীনতা নিয়ে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়ে আমাদের আর এক বন্ধুর একটু বাসনা হয়েছিল, মদ কি জিনিস চেখে দেখার। ছবি বিশ্বাসের গলায় যখন তাকে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন, বন্ধু তখন হাসির তুবড়ি ফাটাল। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভিড় সরে গেলে অন্ধকারে আমরা যখন হোটেলে ফিরছি তখন একটা গলা ভেসে এল, 'চমৎকার।'

আমরা চমকে বন্ধুর দিকে তাকালাম। কিন্তু সে কথা বলেনি। শব্দটা এসেছে খানিকটা দূর থেকে। অন্ধকারে মানুষটিকে বোঝা যাচ্ছে না। বন্ধু বিস্ময়ে বললেন, 'আরে, আমার মত গলা নকল করেছে।'

মানুষটি এগিয়ে এলেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, দীর্ঘদেহ, হাতে লাঠি। কাছাকাছি হতেই চমকে উঠলাম, সেই সঙ্গে পুলকিত। ছবি বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার মত গলা করেছি? এ্যাঁ?' আমাদের তখন কথা বলার শক্তি নেই। বন্ধু যেন বালির

ভেতর ঢুকে যেতে পারলে বেঁচে যেত। ছবিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওভাবে কথা বলছিল ?'

মুখ চাওয়াচায়ি করলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করেই বন্ধু জানাল, 'আমি।'

'স্মরণ শক্তি এত দুর্বল কেন ? সংলাপগুলো ঠিকঠাক বলতে পারলে না। হাউ-এভার, নট ব্যাড। খুব খারাপ হয়নি।' ছবিবাবু আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

নট ব্যাড, খুব খারাপ হয়নি, এই কথাগুলো এখন খুব মনে পড়ে। সত্তর দশক থেকে বাংলা ছবিতে তিনটে জিনিস ধীরে ধীরে উধাও হচ্ছে! এক, কমেডিয়ান।

জহর, ভানু অথবা তুলসী চক্রবর্তীরা আজ নেই। নেই শ্যাম লাহা অথবা শীতল ব্যানার্জী।

'সাগরিকা' ছবির জীবেন বসুও চলে গিয়েছেন। বেঁচে আছেন যাঁরা, রবি ঘোষ, অনুপ কুমার, চিন্ময় রায়রা আজকাল ছবিতে সুযোগ পান না তেমন করে।

এখন যাঁরা চিত্রনাট্য লেখেন তাঁরা ওঁদের ধরনের চরিত্র রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। শুধু বাংলা ছবি নয়, হিন্দীতে একই ঘটনা। জনি ওয়াকার, মেহমুদ, মোহন চোটিয়া জীবিত অবস্থায় কর্মহীন হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের সময়ের নায়কদের কেউ কেউ এখনও সমানে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলা ছবিতে তাই বলে হাস্যরস নেই, এমন ভাবনা ঠিক হবে না। সেটা এত হাস্যকর যে বসে থাকা যায় না।

দ্বিতীয় জিনিসটি হল গান এবং তার উপযুক্ত পরিবেশ। হেমন্ত মুখার্জী বা সন্ধ্যা মুখার্জীর সে সব গানগুলোর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হতে চলল যা এখনও আমাদের উদ্বেলিত করে। গানে মোর ইন্দ্রধনু অথবা মৌ বনে আজ মৌ জমেছে শুনলেই বুকের ভেতর ঢেউ ওঠে।

সেই মেলোডি, গানের কথা, গাইয়ে আজ নেই। গাইতে সক্ষম মানুষ থাকলেও সুর এবং কথা লেখার অক্ষমতায় ওই সব চিরকালীন গানের বদলে তাৎক্ষণিক জগঝম্প-মার্কা গান বুদ্বুদের মত উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

গত বছর লণ্ডন থেকে চারশো মাইল দূরে এক নির্জন হাইওয়ের পাশে পেট্রল পাম্পে তেল নিতে গিয়ে চমকে গিয়েছিলাম। পার্ক-করা একটা গাড়ির রেকর্ডারে হেমন্ত মুখার্জীর বাংলা গানের ক্যাসেট বাজছিল। এসব আনন্দ ক্রমশ আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে।

নট ব্যাড, খুব খারাপ হচ্ছে না, বাংলা ছবির বাবাদের ক্ষেত্রে বলা যায়। তাঁরা প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও তিন-চারটে দৃশ্যে মিন মিন করেন। এককালের বাবারা মার খাওয়ার পর যেসব শিল্পীর বাবা হবার কথা তাঁরা তেমন সুযোগ পান না। এখন তো বাংলা ছবিতে দু ধরনের শিল্পী দেখা যায়।

ফেস্টিভাল-মার্কা পরিচালকদের ছবির শিল্পীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অচেনা হন।

ভাবখানা এমন যে জনসাধারণের মধ্যে থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করছেন তাঁরা। প্রতিষ্ঠিত বা চেনা মুখের শিল্পীদের কথা ভাবতেই চান না। আসলে এতে বাজেট বেশ বড়রকম কমানো যায়। আর ব্যবসায়িক ছবির পরিচালকরা জানেনই না, তাঁরা কি করছেন।

নায়ক নায়িকা গান মারপিটের বাইরে বাকী শিল্পীদের প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টা থাকে না তাঁদের চিত্রনাট্যে।

আমার বন্ধু মনোজ ভৌমিক আমেরিকায় থাকতেন। ভাল চাকুরে, ছাত্র হিসেবে দারুণ ছিলেন। কলকাতায় থাকার সময় নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটার করতেন।

সেই ভূত নিউইয়র্কে গিয়েও থামেনি। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে নাটক, পত্রিকা বের করা থেকে শুরু করে বাঙালীদের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে ফেললেন।

লেখালেখি করতেন। 'দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই মনোজ নিউইয়র্ক শহরের পটভূমিকায় এক বাঙালী বাবা যার বয়স প্রায় ষাট, তাঁর মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে দারুণ গল্প লিখেছিল। এত ভাল জমাট গল্প, যেখানে নাটক উঠে এসেছে জীবনের টানে, আমি বিদেশী পটভূমিকায় খুব কম পড়েছি। মনোজ স্থির করল ওই গল্পের ছবি করবে।

আমেরিকায় প্রথম বাংলা ছবি। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। সেই সময় বাজেট হয়েছিল ভারতীয় টাকায় দশ লক্ষ। আমি নিউইয়র্কে গিয়ে চিত্রনাট্য লিখলাম। এবার শিল্পী নির্বাচন।

বাবার চরিত্রে খুব ভাল অভিনেতার দরকার। ছবির ষাট ভাগ তাকে নিয়েই। অভিনয়ের সুযোগ প্রচুর। ছবি বিশ্বাস অনেক আগে চলে গিয়েছেন। উত্তমকুমারও নেই। যেসব শিল্পী এখান থেকে যাবেন, তাঁদের অন্তত মাসখানেক নিউইয়র্কে থাকতে হবে।

টাকা দেওয়া হবে ভারতীয় টাকা এবং আমেরিকান ডলারে মিশিয়ে। যিনি মনোজকে আর্থিক সাহায্য করছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল অশোক কুমারকে নিতে। অশোক কুমারের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ভাল। কিন্তু আমাদের মনে হল বয়সটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। এই বাবা প্রৌঢ়ত্বের শেষ পর্যায়ে, কিন্তু বৃদ্ধ নন। যাঁদের কথা মনে হল তাদের বয়স হয়েছে অথবা নিম্ন বা মধ্যবিত্ত বাঙালী নুয়ে-পড়া আদল এসে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত কেরানি বাঙালী চল্লিশে নিউইয়র্কে এসে যখন গুছিয়ে বসেন, তখন তাঁর মধ্যে যে তেজ ফোটে তা একমাত্র উৎপল দত্তের মধ্যে আছে বলে মনোজের ধারণা হয়েছিল। উৎপলবাবুকে চমৎকার মানাতো। তাঁর পাশাপাশি আমরা আর একজনকে ভাবলাম। একসময় নায়ক করেছেন অনেক, পড়াশুনা আছে ওই ভদ্রলোকের। অভিনেতা হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র। একটু ম্যানারিজম আছে, এই যা।

কলকাতায় ফিরে এসে জানলাম যে সময়ে শুটিং হবে সেই সময়ে উৎপলবাবু খুব ব্যস্ত। যাকে খবর দিতে বললাম সে ফিরে এসে বলল, অসম্ভব, অতদিন

উনি দেশের বাইরে থাকতেই পারবেন না। এবার দ্বিতীয় জনের সাক্ষাৎ প্রার্থী হলাম। টেলিফোনে নিজের পরিচয় দিতেই সংলাপগুলো এমন হল—

'আরে, কি সৌভাগ্য! এ্যাঁ, ভাবা যায় না, আমার মত একজন ক্ষুদ্র অভিনেতার কথা মনে পড়ল তোমার, এসো, এসো, কবে আসবে বল।' এত আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম।

'আপনার কখন সময় হবে?'

'যখনই তুমি আসবে। আমাকে তো কেউ কাজ দেয় না (টেনে বললেন)। বেকারের আর সময় অসময় কি! সন্ধ্যেবেলায় চলে এস। এ্যাঁ?'

তাই হল। উনি লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে বসেছিলেন। বয়স ওঁর চেহারাকে অভিজাত করেছে। প্রায় প্রাণখোলা হাসি নিয়ে আমায় সাদরে ঘরে বসালেন।

'কেমন আছেন?'

'আরে, থাকা! আমি তো ছ্যাকড়া গাড়ি, যার যখন দরকার কম দামে ভাড়া করে নিয়ে যায়। এত বছর অভিনয় করলাম অথচ তার যেন কোন দামই নেই।'

'একথা বলছেন কেন?'

'আরে, কালকের ছোকরা আজ পরিচালক হয়ে আমায় জ্ঞান দিতে আসে, এভাবে বলবেন না, ওভাবে বলবেন না! ভাবো তো?'

মনে মনে ভাবলাম, পরিচালক তো চাইতেই পারেন তার মনের মত অভিনয় করুক অভিনেতা। কথা ঘোরাতে বললাম, 'স্বপ্ন নয়' ছবিতে আপনার অভিনয় খুব ভাল লেগেছে। খুব জীবন্ত।'

'কি ভাল হল? দাদা দাদা বলে ধরে নিয়ে যায়। ভাইদের বাঁচাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি। কিন্তু পয়সা দেওয়ার সময় কাঁদুনে গায় ভাইয়েরা। এই ধরো অনিলেন্দুর কথা। ছবি করার আগে ঘনঘন আসতো। আমাকে দিয়ে পাঁচশো টাকার একটা চরিত্র পর্যন্ত করিয়ে নিল। তারপর ছবি যেই পুরস্কার পেল অমনি হাওয়া। পরহিতব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে বায়না নিয়ে বসে আছি ভাই, যে পারছে এক্সপ্লয়েট করে যাচ্ছে।'

'এভাবে বলছেন কেন?'

'বলব না? তোমাদের বড় পরিচালকরা কি করছেন? না, ক-বাবু খুব খারাপ লোক। ওকে নেব না। খারাপ তো হবেই। আমি কারো খাই না পরি যে কেয়ার করব? মুখের ওপরে সত্যি কথা বলি বলে খারাপ লাগে, না?' ক-বাবু ক্ষিপ্ত গলায় যেন আমার প্রতিই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

'আমাদের বড় পরিচালকদের ছবিতে তো এক সময় আপনি নায়ক করেছিলেন।'

'হুম্। তখন তো আমাকে ছাড়া চলত না। কিন্তু তেল দেওয়া আমার স্বভাবে নেই বলে বাদ পড়ে গেলাম। দূর দূর!'

চা এল। সঙ্গে খাবার। ক-বাবু প্রায় জোর করেই খাওয়ালেন। আমি ইতিমধ্যে

জেনে গিয়েছি তিনি নানান জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। ফিল্মের অনেক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক ভাল ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে। ফলে নানারকম কমিটিতে, চলচ্চিত্র উৎসবে প্রায় কর্ণধারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। এতে বেশ সময় দিতে হয় তাঁকে।

শেষ পর্যন্ত আমি আমার প্রস্তাব তাঁকে দিলাম। তিনি উচ্ছ্বসিত হলেন, 'গুড! জাগো বাঙালী। এইতো চাই। বাংলা ছবির সীমানা বাড়িয়ে দাও। আমাদের ছবি বাংলাদেশে রপ্তানি হয় না। তোমরা যা করতে যাচ্ছ তাতে আমেরিকা থেকে বাংলা ছবি ওখানে পাঠাতে পারবে। বাঃ, মন ভরে গেল!'

'মনোজ এবং আমার ইচ্ছে আপনি প্রবাল ঘোষের ভূমিকাটা করুন।'

'একশোবার করব, আনন্দের সঙ্গে করব। আর কে কে যাচ্ছে?'

'ক্যামরাম্যান, কয়েকজন টেকনিশিয়ান, পরে এডিটার যাবেন।'

'আর্টিস্ট?'

'আরও দুই তিনজনকে নিচ্ছি। ওখানেও নাটক-করা ছেলেমেয়ে আছে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকেও দুজন শিল্পীকে নেবার ইচ্ছে আছে।'

'দেখ বাবা, এখান থেকে যাদের নিচ্ছ বুঝে-সুঝে নিও। ওখানে গিয়ে আবার রাজনীতি শুরু করে দেয়। বাঙালীর বাচ্চাকে বিশ্বাস নেই।'

কথাটা ভাল লাগল না। এবার খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনোজ জানতে চেয়েছে যে আপনাকে জন্যে আপনাকে কত দিতে হবে?'

'আরে, তুমি এসব কথা কেন বলছ। কত ভাই আমাকে টুপি পরিয়ে যাচ্ছে দিন রাত। তুমি তো একটা দারুণ কাজের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ!'

'তবু।'

'কত দিতে পারবে?'

'দেখুন, আমেরিকায় ছবি হচ্ছে অথচ বাজেট এখানকার অনেক বাংলা ছবির প্রায় অর্ধেক। বুঝতেই পারছেন টাকার ব্যবস্থা করতে কষ্ট হচ্ছে বলে খরচ কমাতে চাইছি। আর টাকা তো নয়, ডলার দরকার হবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়া যায় না। তবু আপনি বলুন কত দিলে আপনার অভিযোগ থাকবে না।'

'কতদিন থাকতে হবে ওখানে?'

'ধরুন দিন কুড়ি।'

'কি বলি, বল তো?'

'যাতায়াত ভাড়া প্রায় তেরো হাজার।'

শেষ পর্যন্ত আমিই বললাম, 'আপনাকে ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজার আর ডলারে দশ হাজার টাকা দিতে পারব আমরা।'

'গুড। ডান। কথা পাকা হয়ে গেল। শুটিং কবে?' আমার খুব ভাল লাগল ক-বাবুকে। ভিসার ব্যবস্থা নিয়ে মনোজ কলকাতায় এলে ওঁকে এ্যাডভান্স দেওয়া

হবে। শুটিং হবে আগামী সেপ্টেম্বরে।

খবরটা কি করে জানি না জানাজানি হয়ে গেল। আমরা চাইছিলাম সবকিছু পাকা না হওয়া পর্যন্ত প্রেস কনফারেন্স করব না। ক-বাবুর সঙ্গে তখন প্রায়ই টেলিফোনে কথা হত আমার। তিনি খোঁজ খবর নিতেন। আমাদের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় একজন পরিচালক প্রায় গায়ে পড়েই আমাকে বললেন, 'ক-বাবুকে কাস্টিং করছেন, দেখবেন ভুগতে হবে।'

'কেন ?'

'শুটিংয়ের আগে উনি ভাই ব্রাদার বলে এমন ভাব করেন যেন নিজেকে উৎসর্গ করছেন। কিন্তু শুটিং শুরু হতে না হতেই এক একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা করেন তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

'কি করেন উনি ?'

'ড্রেস নিয়ে ঝামেলা করেন। চিৎকার করে বলেন, 'আমি কি রাস্তার অভিনেতা যে এইসব বাজে জামা পরতে এসেছি। মাপ নিয়ে আগে বানাওনি কেন ? এই যে সব প্রযোজকবাবু, একদিনের টাকা দিয়ে দুদিন শুটিং করানো যায় না! আমাকে কি ভেবেছ তুমি ? খাটিয়ে মুখে রক্ত তুলে মেরে ফেলবে ?'

'খুব বেশী কাজ করানো হয়েছিল ?'

'না। এক শিফ্‌টের পর আধঘণ্টা বেশী লেগেছিল সিন শেষ করতে। ওঁর কথা শুনে টেকনিশিয়ানরা পর্যন্ত বিগড়ে যায়। লাঞ্চের সময় উনি আলাদা খাবার খাবেন। যারা নায়ক নায়িকা করল তারাও এত আবদার করে না। ওঁর ধারণা উনি নায়কদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সময় পাল্টাচ্ছে।'

'এই কারণে কি বাংলা ছবিতে ওঁর কাজ কমে যাচ্ছে ?'

'ঠিক। প্রচণ্ড কমপ্লেক্সে ভুগছেন ভদ্রলোক।'

কথাগুলোর সবটাই বিশ্বাস করিনি তখন। ক-বাবু আমার সঙ্গে তো এখনও খারাপ ব্যবহার করেননি। এই সময় মনোজ এল। সে তৈরী। সমস্ত শিল্পী টেকনিশিয়ান এবং প্রেসের সঙ্গে কথা বলে যাবে। ফিরে গিয়ে টিকিট পাঠাবে। মূল চরিত্রে ক-বাবুকে নির্বাচিত করে সে খুশী। তাঁর সম্মান-মূল্য দিতে সে তৈরী। আমি টেলিফোনে ক-বাবুর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। মনোজ এসেছে শুনে খুশী হলেন। কিন্তু সেদিন মনোজের সঙ্গে ক-বাবুর বাড়িতে যেতে পারিনি। একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যেবেলায় গিয়েছিল মনোজ ক-বাবুর বাড়িতে। ফিরে এল ঘণ্টাখানেক বাদে। মুখ চোখ বেশ গম্ভীর। এসেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি চিঠিতে ক-বাবুর সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, সেটা সত্যি ছিল ?'

অবাক হলাম, 'কি ব্যাপার ?'

'ক-বাবু রাজী হয়েছেন অভিনয় করতে।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই গত সপ্তাহেও টেলিফোনে কথা হয়েছিল।'

'টার্মস কি ছিল ?'

'কথা হয়েছিল ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজার টাকা আর ডলারে দশ হাজার টাকা আমরা দেব। উনি সেটা মেনে নিয়েছেন খুশী মনেই।'

'না মেনে নেননি।'

'মানে!'

'আমি আজ যেতেই উনি খুব আপ্যায়ন করে বসালেন। বাঙালী ছেলে আমেরিকায় বাংলা ছবি করছি বলে হেভি প্রশংসা করলেন। আমি এ্যাডভান্স দেব বলতেই খুশী হলেন। বললেন, এই মুহূর্তে তার মত অভিনয় বাবার চরিত্রে কেউ করতে পারবে না। তবে মুস্কিল হল সব ভাইয়েরা আসে তাকে এক্সপ্লয়েট করতে। যে যা পারছে, করে নিচ্ছে।

আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেই টাকাই আমরা দেব।' মনোজ থামল।

'তারপর ?' আমি গম্ভীর হলাম।

'উনি বললেন কত টাকার কথা হয়েছিল একটু মনে করিয়ে দিতে। দিলাম। তাই শুনে উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, সমরেশের নিশ্চয়ই শুনতে ভুল হয়েছে। এই মুস্কিল, কাগজে কলমে লিখে নিই না বিশ্বাস করে অথচ পরে এই ভাবে কথা ঘুরে যায়। মনোজ, আপনি যদি না আসতেন তাহলে বিদেশে গিয়ে আমি কি বেইজ্জত হতাম! সমরেশ বলল, ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজারের বেশী দিতে পারব না কিন্তু ডলারে দশ হাজার দেবে। অর্থাৎ দশ হাজার ডলার আর কুড়ি হাজার টাকা। আমি রাজী হলাম। একমাস দেশে থাকব না, সংসার চালাবার টাকা দিয়ে যেতে হবে তো। একমাস তো রোজ শুটিং হবে না বসে থাকতে হবে। সেরকম অবস্থায় এখানে আমি আরও পাঁচটা ছবির কাজ করে নিতে পারতাম। এই যে লসটা না হয় বাংলা ছবির কল্যাণে আমি গায়ে মাখব না কিন্তু ভিখিরীর মত থাকব না বলেই আমি দশ হাজার ডলার শুনে রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'কক্ষনো হয়। আমি বলেছিলাম ডলারে দশ হাজার দেব। তার মানে সেটা এক হাজার ডলার, দশ টাকায় এক ডলার চলছে।'

মনোজ মাথা নাড়ল, 'আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম, পুরো ছবির বাজেট যখন এক লক্ষ ডলার তখন আপনাকে তার ওয়ান টেনথ দেওয়া যায় না। ভারতীয় টাকা বা যাতায়াতের ভাড়াটা যোগ করুন। উনি বললেন, তার নিচে কিছুতেই পারবেন না।'

আমি তখন জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম, দশ হাজার ডলার মানে এক লক্ষ টাকা আর ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজার, অর্থাৎ মোট এক লক্ষ কুড়ি হাজার উনি কোন ছবিতে অভিনয় করে পেয়েছেন ? শুনে ক-বাবু প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন,

তিনি অপমানিত বোধ করছেন। আমিও বললাম, আমি নতুন করে ভেবে দেখব।

মনোজ মাথা নাড়ল, 'না মশাই। যে মানুষ এত অল্পে ডিগবাজি খায়, কথা ঘুরে যায়, তার সঙ্গে কাজ করা বুদ্ধিমানের ব্যাপার হবে না। তা তিনি যত বড় অভিনেতা হোন।'

মনে মনে ততক্ষণ আমিও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি। ওঁর সম্পর্কে শোনা কথাটা সেটে যাওয়ার আগেই সত্যি হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি। তবু মনে হল একবার মুখোমুখি কথা বলা উচিত। দিনতিনেক বাদে এক দুপুরে নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে গেলাম। দেখা গেল, এর মধ্যেই কেউ কেউ খবর জেনেছেন। তাঁরা দেখা হতেই প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। জানলাম, ক-বাবু ডানদিকের ফ্লোরে শুটিং করছেন। যেতেই সেটের বাইরে একজন নায়কের সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলেছি কি বলিনি এমন সময় চিৎকার ভেসে এল, 'এই যে সমরেশবাবু, ওই নায়ক কি আমার চেয়ে বড় অভিনেতা যে, আপনি আমাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না।'

'আরে না না, আমি আপনার খোঁজেই এসেছি।'

'আরে খোঁজ! আমেরিকায় ছবি করছেন আর এই বাঙালী বাদ হয়ে গেল।' ক-বাবু আমাকে আপনি বলতেন না আগে। অস্বস্তি হচ্ছিল। ক-বাবু তখন বলে যাচ্ছেন, 'চিরকাল লোকে আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। আপনাদের তথাকথিত দাদাদের খেলা তো দেখলাম। ভেবেছিলাম তুমি লেখক মানুষ, একটু আলাদা হবে। কিন্তু টালিগঞ্জের হাওয়া গায়ে লাগলে সব কাকের এক ডাক হয়ে যায়।'

'আপনি কিন্তু ভুল কথা বলছেন।'

এইসময় একজন সহকারি পরিচালক বেরিয়ে এসে তাঁকে বললেন, 'দাদা, আপনার একটা শট নেওয়া হবে।'

'ডায়ালগ কি?' গম্ভীর গলায় বললেন ক-বাবু।

'সাইলেন্ট শট।

'কথা নেই? তাহলে আমাকে নিলে কেন? যা ডায়ালগ সব তোমাদের হিরো বলবেন, আমি কি এখানে গরম জল দিতে এসেছি। আজ আমার মুড নেই, কাল টেক করতে বল।'

'দাদা, প্লিজ এটা হলেই সিন কমপ্লিট হয়ে যায়।'

ক-বাবু আমার দিকে তাকালেন, 'মনোজকে বলো কথা বলতে। আরে, এখন টালিগঞ্জে আমি ছাড়া বাবা করবে কে? পাঁচজন মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে তোমরাও বাদ যাবে কেন?' উনি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

নায়ক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'অদ্ভুত মানুষ। প্রচণ্ড কমপ্লেক্সে ভুগছেন। এই কারণেই ওঁকে আজকাল ছবিতে কেউ নিতে চায় না।'

'কিন্তু একথা সত্যি, উনি ছাড়া বাবা।'

'সমরেশদা, আপনি হাসালেন, কাবুলিওয়ালার পর পিতৃহৃদয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। বাংলা ছবিতে বাবা না থাকলে কিস্যু এসে যায় না। এইসব চরিত্র বাদ দিয়ে ছবি করলে এরা টাইট হবেন।'

বুঝতে পারলাম। বাংলা ছবি ইতিমধ্যেই পিতৃহারা হতে চলেছে।

চার

'এই, আপনি ভিলেন হবেন?'

এরকম প্রশ্নের উত্তরে একশোজনের মধ্যে একজন হ্যাঁ বলবেন তা আপনারা জানেন। অথচ জীবনে আমরা নায়ক হই কদাচিৎ, কিন্তু ভিলেনি করতে ছাড়ি না। এইসব ভিলেনি কখনও ইচ্ছে করে কখনও অজান্তেই হয়ে যায়। একজন সম্পাদকের কথা জানি। তিনি নতুন লেখক খুঁজে বের করতে খুব উৎসাহী। করলেনও। লেখা ছাপা হল। আপনারা বললেন, দারুণ। সম্পাদক আবার লেখা ছাপলেন, এবারও আপনারা খুব খুশী। আবিষ্কারের আনন্দে সম্পাদক পর পর মাসে একখানা করে হয় বড় গল্প নয় উপন্যাস ছেপে চলেছেন সেই লেখকের। সুযোগ পেয়ে প্রথম দিকে বেচারা খুব উৎসাহিত হয়েছিল। তারপর চাপের মাথায় আর সামলাতে পারল না। লেখা খারাপ হয়ে গেল। আপনারা বললেন, দয়া করে এবার থামুন। সম্পাদক বললেন, 'কি করব, সুযোগ দিয়েছিলাম, কাজে লাগাতে পারল না।' অথচ রয়ে সয়ে বছরে তিনটে লেখা লেখালে লোকটি আরও ভাল লিখতে পারত। সম্পাদকের এই কাজ যদি ভিলেনি হয় তাহলে ধরে নিচ্ছি, না বুঝে অতি উৎসাহেই করেছেন।

একবার কাগজে নিয়মিত লিখছি। কর্তৃপক্ষ টাকাও দিচ্ছেন প্রতি মাসে লেখা ছাপা হলে। হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হল। কাগজটির প্রতিনিধিকে জানিয়ে গেলাম বাড়িতে আমার অনুপস্থিতিতে টাকা পৌঁছে দিতে। আর বাড়ির খরচের হিসেবের পাশে ওই টাকা আয় হবে বলে নিশ্চিত হলাম। কর্তৃপক্ষ যাঁর হাতে টাকা পাঠালেন তাঁর একটি প্রকাশনার ব্যবসা ছিল। টাকা পৌঁছে দেবার সময় তিনি ভাবলেন আমার হাতে যদি দেয় তাহলে একটা বইয়ের ব্যাপারে পাকা কথা বলতে পারে। বাড়িতে এসে আমি নেই শুনে টাকা না দিয়ে তিনি চলে গেলেন। ফিরে এসে জানলাম ওই টাকা না পাওয়ায় খুব অসুবিধে হয়েছিল। রাগ হল, কাগজটির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হল। সেই লোকটি ভিলেন হয়ে গেলেন। আমার কাছে তো বটেই, কাগজটির কর্তৃপক্ষের কাছেও নিশ্চয়ই, কারণ তাঁরা তো ঠিক সময়ে টাকা দিয়েছিলেন।

এ তো গেল ছোটখাটো ব্যাপার। ভিলেনদের আমরা ভিলেন জেনেও মেনে নিই। ধরুন, আপনারা একটি জলসা করবেন। বড় শিল্পী দরকার। আপনি গেলে এক নম্বর শিল্পী বিশ হাজার চাইবেন। বোম্বে থেকে আনতে গেলে কয়েক ডবল।

তখন খোঁজ করবেন ফাংশনবাজদের। সেই সরোজ সেনগুপ্তের আমল থেকে কলকাতায় দফায় দফায় ফাংশনবাজ এসেছেন। সরোজবাবুদের যুগ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা ফাংশন করান তাঁরা আপনার বাজেট জানতে চাইবেন। আপনি ধরা দিতে না চাইলে বলবেন অমুক কুমার তমুক মুখার্জী অমুক দে তমুক লাহিড়ীকে চাই, কত দিতে হবে। ইনি একটা অঙ্ক বললেন। দর কষাকষি চলল। আপনি বুদ্ধিমান। তাই চুক্তিতে সই করার সময় লিখলেন গাড়ি ভাড়া এবং সঙ্গীদের খরচ ওই টাকার মধ্যে। এবার পুচ্ছ আকাশে তুলে প্যানেল বেঁধে টিকিট বিক্রী শুরু করলেন। ফাংশনের আগের দিন ফাংশনবাজ জানালেন, 'কোন ভয় নেই। সবাই পৌঁছে যাবে। বিশ বছর এই লাইনে আছি, কোন শিল্পী আমাকে ঢপ দিতে সাহস পাবে, বলুন? তবে ভাবছি অমুক কুমারকে নেব না।' আপনি চোখ কপালে তুললেন, সে কি? ওর নামে টিকিট বিক্রী হয়েছে।

'আরে, ওর নামে না ওর বাবার নামে? ওকে আমি এমন টাইট দেব না যে বেঙ্গলে ফাংশন করতে হবে না। গায় তো সারসের মত, তার আবার মত কেতা। শুনুন, আমি ওর বদলে বাংলাদেশের নামী গায়িকা ফিরদৌসি চৌধুরীকে নিয়ে যাব। নাম শুনছেন নিশ্চয়ই। ক্যান্টার গায়।'

আপনার তখন ছুঁচো গেলা অবস্থা। ফাংশন বন্ধ হলে পাবলিক চামড়া খুলে জুতো বানাবে। অতএব ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলাদেশী গায়িকা যিনি কলকাতায় ভাগ্য-অন্বেষণে এসেছিলেন, তাঁকে গিলতে হল আপনাকে। আপনার চোখে এই ফাংশনবাজ ভিলেন হয়ে গেলেও জলসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তেল মাখিয়ে কথা বলতে বাধ্য হলেন আপনি।

কিছুদিন আগে টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম। পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর ছবির শুটিং দেখতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানকার বড় বড় স্টার আছে ওই ছবিতে। শ্যামবাজার থেকে যাওয়ার পথে অনেক সময় পাওয়া যায়। গল্প হচ্ছিল। প্রযোজক বলছিলেন আগে জানলে ছবি করতেন না। পয়সা খরচ করেও যেন ক্রীতদাস হয়ে আছেন। যে ভদ্রলোকের গল্প আর চিত্রনাট্য তাঁর রেট একশো টাকা। একটা পায়সাও কমাননি। তাও টাকা নেবার ছ'মাস পরে ওগুলো দিয়েছিলেন দুবার ঘুরিয়ে। তার ওপর শর্ত। একে নিতে হবে ওকে বাদ দিন। নায়কের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি যে টাকা চাইলেন তাতেই রাজী হয়েছি। কিন্তু এখন শুটিং-এর ডেট দিতে ঝোলাচ্ছেন। সকালে এক শিফট করে এসে আমার কাজ শেষ না করেই আর-একটা জায়গায় ছুটছেন। বললে চোখ রাঙাচ্ছেন। পরিচালক ছবি করার আগে তেল মাখাতো দুবেলা। এখন পাত্তাই দেয় না। যা বাজেট, তার বেশী খরচ হচ্ছে। ছাড়াতেও পারছি না ইউনিয়নের ভয়ে। ছবি চৌপাট হয়ে যাবে। কিন্তু শুটিং স্পটে গিয়ে এই ইনি যেভাবে পরিচালক নায়ক এবং হঠাৎ-আসা কাহিনীকার চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে গদগদ কথা বললেন, তাতে মনে হল একেবারে ভাই-ব্রাদার সম্পর্ক। অর্থাৎ এঁদের সবরকম

ভিলেনি মুখ ইনি সহ্য করছেন স্বার্থের কারণে। তবু যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, ভিলেন হবেন কিনা আপনি চট করে হ্যাঁ বলতে পারবেন না। আগে ছেলেরা ফিল্মে যেত নায়ক হবার জন্যে। ভিলেন হতে কেউ গিয়েছে বলে সেকালে শুনিনি। টি.ভি. সিরিয়াল প্রযোজনা করতে গিয়ে দেখালাম শ'য়ে শ'য়ে ছবি পাঠাচ্ছে নতুন ছেলেমেয়েরা। সবাই টেরি বাগিয়ে পোজ দিয়েছে। মেয়েরা যেন এক-একজন নায়িকা। তবে একটা ব্যাপার বদল হয়েছে। কেউ এসে বলে না নায়ক হব বা নায়িকা। সবাই বলে, একটা ভাল চরিত্র দিন, যাতে চার-পাঁচটা এপিসোডে অন্তত থাকতে পারি। শ্রদ্ধেয় পরিচালক অসিত সেন আমাকে একটি মেয়ের ছবি দেখিয়েছিলেন। সে সুযোগের জন্যে তাঁকে পাঠিয়েছিল। অসিতদা বিব্রত হয়েছিলেন দেখে। খাটো প্যান্ট গেঞ্জি পরে খাটের ওপর পা তুলে হাতে হুইস্কির বোতল নিয়ে ছবি তুলেছে মেয়েটি। দেখতে ভাল। অসিতদা বলেছিলেন 'দেখুন তো, কি মুস্কিল! এইব ছবি আমার কাছে কেন পাঠায়।' অসিতদার অস্বস্তির কারণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওই সময় 'কালপুরুষ' সিরিয়ালটির কাস্টিং চলছিল। ওখানে তৃষ্ণা দাস নামে একটি চরিত্র রয়েছে যে ক্যাবারে ড্যান্সারদের মক্ষীরানী। পরিচালক রাজা দাশগুপ্তকে ছবিটার কথা বললাম। ভিলেন নয়, ভ্যাম্প। ভাল অভিনয় এবং আবেগময়ী দরকার। মেয়েটিকে খবর পাঠালাম। সে এল। শাড়ি পরেই এল। বেশ আধুনিকা। ব্লাউজের শেষভাগ আর শাড়ির শুরুর মধ্যে এক হাত পার্থক্য। চরিত্রটি বলা হল। সে একটু ভাবল, 'এটা কি সেকেন্ড হিরোইনের রোল নয়?'

'না। মিসেস ভিলেন বলতে পারেন। তবে শেষে চরিত্রটি মহৎ হবে।'

'আর কোন ভাল রোল নেই?'

'না। আপনাকে এই চরিত্রে ভেবেছি।'

'দেখুন, আমি দুটো ছবিতে সেকেন্ড হিরোইনের রোল করেছি। এই চরিত্র নিলে আর কখনও হিরোইন হতে পারব না।'

রাগ হল, 'তাহলে ওইরকম ছবি তুলে পাঠিয়েছেন কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'ওই ছবি দেখেই তো দুজন প্রোডিউসার আমাকে সেকেন্ড হিরোইন করেছে। অডিও থেকেও তো ওরকম ছবি তোলাতে বলল।'

অথচ একসময় বাংলা ছবিতে ভিলেনের কদর ছিল। আমি খুব ছোটবেলায় পিসীমার এসকর্ট হিসেবে ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি। যদ্দূর মনে আছে সেইসময় ভিলেন ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। ওঁকে দেখলেই আমার রাগ হত। কথা বলার ভঙ্গীতে চরিত্র বোঝাতে পারতেন অসাধারণ কিন্তু এই একই ভদ্রলোক যখন লিখলেন, 'যখন পুলিশ ছিলাম' এবং 'যখন নায়ক ছিলাম' তখন পড়ে চমকে গিয়েছিলাম। আমার জ্ঞান হবার সময়ে দাপটে ভিলেনি করেছেন নীতিশ মুখার্জী। গলাটি ভাল। চেহারা সুন্দর। ভিলেন মানেই যে কুশ্রী দেখতে হবে নীতিশ বাবু অবশ্যই তার বিপরীত ধারণা দিলেন। সে সময় বিকাশ রায় নায়ক সাজতেন। ছবিতে সুচিত্রা সেনের বিপরীতে

নায়ক হয়েছিলেন, একটি ছবির নাম 'ভালবাসা'। সন্ধ্যা মুখার্জীর গান সুচিত্রা সেনের ঠোঁটে ওঁর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, 'তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের লজ্জা জড়ানো ছন্দ ওগো।' বিকাশবাবুকে ওই চরিত্রেও দর্শকরা নিয়েছিলেন।

তারপরই তিনি যাকে বলে ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হয়ে গেলেন। নিজে ছবি পরিচালনা করতে লাগলেন। ফিরে এলেন ভিলেন হয়ে।

সেই বিয়াল্লিশের কথা ছেড়ে দিন। প্রায় দুই দশক জুড়ে ভদ্রলোক ভিলেন করে গেলেন বাংলা ছবিতে। উত্তমকুমারের সঙ্গে সমান তালে অভিনয় করলেন দাপটে। 'দৌড়' ছবির সময় ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আড্ডাবাজ এই মানুষটির ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ভিলেনি নেই। বরং এক ধরনের ছেলেমানুষী অভিমান ছিল। নিজেকে উপেক্ষিত ভাবতেন। এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তেন যখন, তখন মুগ্ধ হতে হত।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'শেষের কবিতা' শ্রুতি নাটক করেছিলেন। ওঁর হাঁটার একটা বিশেষ স্টাইল ছিল।

একবার স্টুডিওতে কেউ একজন সেটা নকল করে দেখাচ্ছিল। এক সময় তিনি এসে গেলেন। যে দেখাচ্ছিল সে লজ্জায় পড়ল। উনি হেসে বললেন, 'নকলটা ভাল করে করতে পারোনি। এই দ্যাখো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' তারপর নিজের হাঁটার ধরন নিজেই দেখিয়ে দিলেন।

বীরেন চ্যাটার্জীর নাম এখনকার দর্শকরা বোধহয় মনে রাখেননি। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকের ওপর সুবিচার হয়নি। কিন্তু সেই 'কঙ্কাল' থেকে অনেক ছবিতে উনি চুটিয়ে ভিলেন করে গিয়েছেন।

একই কথা বলা চলে দীপক মুখার্জীর সম্পর্কেও। কিন্তু চিত্রনাট্যে এঁদের আবদ্ধ রাখা হত শুধুমাত্র ভিলেনিতেই। ভিলেনও যে মানুষ, তা তখনকার চিত্রনাট্যকাররা বড় একটা ভাবতেন না। ভ্রূ তুলে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলিয়ে পরিচালকরা নাটক তৈরী করতেন। 'উল্কা'তে এই দীপকবাবু দেখিয়ে দিলেন ভাল চরিত্র পেলে তিনি কি অভিনয় করতে পারেন। এই সময়ের পর জ্ঞানেশ মুখার্জ্জী খুব সামান্য এবং শেখর চ্যাটার্জী প্রবলভাবে ভিলেনি করেছেন বাংলা ছবিতে। মনে রাখা দরকার, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা, গলার আওয়াজে আবেগ বর্জন করা— এসবই ভিলেনদের প্রতীক হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছিল।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন বাংলা ফিল্মে ভিলেন হয়ে। তাঁর শরীর, চোখমুখ, কথা বলার ভঙ্গীতে তিনি যতটা না ভিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী চরিত্রাভিনেতা। নব্যেন্দু চ্যাটার্জীর ছবি 'আজ কাল পরশু'তে অজিতেশবাবু যে ভিলেনের অভিনয় করেছেন তা তাঁর দ্বারাই সম্ভব। 'হাটে বাজারে'র কথা ছেড়েই দিলাম।

ভিলেন বলতে এককালে কিন্তু অন্যরকম বোঝাতো। একজন নায়িকা মন দিয়েছেন যাঁকে, তিনি নায়ক। আর একজন পুরুষ সেই নায়িকার কাছে পাত্তা না পেয়ে নায়ক

নায়িকার সম্পর্কটি ভন্ডুল করতে চেষ্টা করছেন। ছবির শেষে এই ব্যক্তির পরাজয় হল অবশ্যম্ভাবী। ইনিই ভিলেন।

পরবর্তীকালে যিনি অসৎ যিনি অনিষ্ট করতে চান তিনি ভিলেন হয়ে গেলেন। রামায়ণে রাবণ ভিলেন। আবার মধুসূদন যখন মেঘনাদ বধ কাব্য লিখলেন তখন রাবণকে তত ভিলেন বলে মন হল না। অর্থাৎ দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলে গেলে চরিত্রের চেহারাও পাল্টে যায়।

ভিলেন যে রক্তমাংসের মানুষ তা প্রমাণ করলেন উৎপল দত্ত। বাংলা ছবির এতদিনকার ভিলেনির চেহারা তিনি এক ঝটকায় বদলে দিলেন। অথচ তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল মধুসূদন চরিত্র দিয়ে। যা রীতিমত নায়ক।

একই সঙ্গে কৌতুক অভিনয়ে দক্ষতা এবং চরিত্রাভিনেতার সব গুণ মিশিয়ে তিনি ভিলেন চরিত্রগুলোর চেহারা দেন। তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয়, তিনি পৃথিবীর মানুষ। যে কাজটা করতে বাধ্য হচ্ছেন তার পেছনে যুক্তি আছে। এবং সেটা এত বিশ্বাসযোগ্য হয় যে তিনি যখনই পর্দায় আসেন তখনই দর্শক আরাম পায়। তিনি ক্ষতি করবেন, অসাধু মানুষ, জানা সত্ত্বেও দর্শক তাঁকে দেখতে চায়। ছবির শেষে তিনি যখন শাস্তি পান তখন দর্শক খুশী হয়। এইটে কিন্তু তাঁর আগের ভিলেনরা এমন ভাবে অর্জন করেননি।

একথা এখন বলতে বাধে না, উৎপলবাবু বাংলা ছবির সর্বকালের সেরা ভিলেন। সেই সঙ্গে স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তী বা জহর রায়ের কথা স্মরণে রেখেও বলছি কৌতুকাভিনেতা হিসেবে তাঁর জায়গা প্রথম শ্রেণীতে।

টুকটাক ভিলেন হয়েছেন এবং হারিয়ে গিয়েছেন এমন অভিনেতার সংখ্যা অনেক। এককালে লেঠেল এবং এখন গুন্ডা ভিলেন তো অনেক। শম্ভু চক্রবর্তী থেকে বিপ্লব চ্যাটার্জী বাংলা ছবিতে একটু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পেয়েছিলেন। বিপ্লব সেই অর্থে ভাগ্যবান।

এই সময়ে তিনি একাই ভিলেন করে যাচ্ছেন। বড় বড় ভূমিকা থাকছে তাঁর। এরাঁ ছবিতে আসার সময় জানতেন নায়ক হবার মত চেহারা তাঁদের নয়। সেই চেষ্টাও করেননি। তাই তাঁদের ওপর ভিলেন শব্দটি সেঁটে বসে আছে।

উৎপলবাবু যেমন কখন ভিলেন হতে হতে চট করে স্নেহময় পিতা হয়ে যান, হয়ে যেতে পারেন তা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। মনে আছে উত্তমকুমার যখন নায়ক তখন অসিতবরণ একটি ছবিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অসিতবরণ নায়িকার প্রেমপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু কখনই তাঁকে ছাপমারা ভিলেন বলে মন হয়নি। এই কর্মটি বিপ্লব চ্যাটার্জীদের দ্বারা সম্ভব নয়।

ইদানীং বাংলা ছবিতে ভিলেন কমে যাচ্ছে। দুই নায়ক এবং এক নায়িকা হলে একজন নায়িকাকে পাচ্ছে অন্যজন ছবির শেষে আত্মত্যাগ করছে। তা সত্ত্বেও প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যে নায়িকাকে পাচ্ছে সেই নায়ক। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নায়িকাই নায়ক এবং ভিলেন ঠিক করে দিচ্ছে।

একটু সরে যাই। হিন্দী ছবির সব চেয়ে সফল ভিলেন প্রাণ কিন্তু স্বচ্ছন্দে নায়ক হতে পারতেন। তাঁর চেহারা অভিনয় গলার স্বর সবই ছিল নায়কোচিত। কে.এন. সিং থেকে শুরু করে আমজাদ খান প্রেম চোপরারা যখন সরে যাচ্ছেন পাদপ্রদীপ থেকে তখনও তিনি ভিলেন। এই মানুষটি যখন ভিলেনি ছেড়ে কৌতুক অভিনয় অথবা চরিত্রাভিনয়ে নেমেছেন তখনও দর্শক তাঁকে গ্রহণ করেছে।

দেখা যাবে, বাংলা ছবিতে ভ্যাম্পের সংখ্যা হিন্দী ছবির তুলনায় কিছুই নয়। সুচিত্রা সেনের শিল্পীজীবন শুরু থেকে শতাব্দী রায় পর্যন্ত তাঁদের বিপাকে ফেলতে কোন নারী ভিলেন তেমন সক্রিয় হতে পারেননি। আমি সংমা বা পিসীর কথা বলছি না।

রাজলক্ষ্মী দেবী গীতা দেরা নায়িকাদের অনেক যন্ত্রণা দিয়েছেন কিন্তু তাঁদের তো ভ্যাম্প বলা যাবে না। হয়তো বাংলা ছবিতে হিন্দী ছবির মত নাচ গান এবং মদির ব্যাপার খুব কম থাকায় ভ্যাম্পদের প্রাবল্য কখনই হয়নি।

অনেক হাতড়ালে তিনচার জনের বেশী নাম মনে পড়বে না। তাঁরাও ঢেউ তোলার আগেই হারিয়ে গিয়েছেন। একজন বিখ্যাত পরিচালক সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'আপনি পাগল ! বাংলায় একজন ভাল হিরোইন পাওয়া যায় না তো ভ্যাম্প ! তাকিয়ে দেখুন, এখন হিরোইন বলতে দেবশ্রী রায়, শতাব্দী রায়, মুনমুন সেন আর রূপা গাঙ্গুলি। চতুর্থ জনের পরীক্ষা এখনও হয়নি। তৃতীয়জন ভাল করে বাংলাই বলতে পারেন না। দ্বিতীয়জন ডাঁসা অবস্থায় এত চাপের মধ্যে আছেন যে দরকচা পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমজন মোটামুটি ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু এঁরা সেই সুচিত্রা সেন দূরের কথা অপর্ণা সেনের রোমান্টিক ইমেজের ধারে-কাছে নন। সে সময় সুপ্রিয়া, সাবিত্রী, মাধবী থেকে অঞ্জনা' নন্দিতারা কাজ করেছেন। সেই রকম ট্যালেন্ট এখন কোথায় ? তখনই আমরা ভাল ভ্যাম্পের চরিত্র লিখতে পারিনি। কাউকে পাবো না বলে, এখন তো ন্যাড়া মাঠ।'

সত্যি কথা। হেলেন, বিন্দু দূরের কথা সেই একটি ছবিতে নাদিরা যা করেছিলেন তা এখানে কেউ করছেন এমন স্বপ্ন দেখতে আমি অন্তত রাজী নই। একেই কি বলে ধান ভানতে শিবের গীত ? ভিলেন নিয়ে লিখতে বসে রূপালী পর্দার ভিলেনদের গল্প শোনালাম।

শেষে এরকম একটা কথা বলা গেল, বাংলা ছবিতে ভিলেন এই মহূর্তে বিপ্লব ছাড়া তেমন কেউ নেই। অতএব আপনাকে প্রশ্নটা আবার করা যাক, 'আপনি কি ভিলেন হবেন ?'

সেই গল্পটি আবার শোনাচ্ছি। পাঠকের স্মরণে থাকলে আমাকে মার্জনা করবেন। এই শহরের একজন মাঝারি সাইজের বড়লোক রাকেশ গুপ্ত। ভাল চেহারা, চারটে বড় ক্লাবের মেম্বার, রোজ দু'পেগের বেশী স্কচ হুইস্কি খান না। রাকেশের ইম্পোর্ট

এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে, ডালহৌসিতে বিরাট চেম্বার। অন্তত আশিজন মানুষ ওঁর অধীনে কাজ করেন। এই কর্মচারীরা রাকেশকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করেন। তাঁদের বাড়িতে বিয়ে হলে রাকেশ অন্তত এক মিনিটের জন্যে গিয়ে উপহার দিয়ে আসেন। ওঁর কোম্পানিতে আজ পর্যন্ত একবারও শ্রমিক বিক্ষোভ হয়নি। অর্থাৎ যাকে বলে ভিলেন, রাকেশ কোন অর্থেই তা নন। রাকেশের একটি দুর্ঘটনা আছে।

আটাশ বছর বয়সের সময় তার স্ত্রী একটি দুর্ঘটনায় মারা যান বোম্বাইতে। তখন তিনি কলকাতায়। এর পরে আর বিয়ে করেননি। কিন্তু তাই বলে ক্লাব বা পার্টিতে নারী জাতির সঙ্গ থেকে তিনি বঞ্চিত নন। যদিও কাউকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে। এই রাকেশ ঠিকঠাক ইনকামট্যাক্স দেন। কলকাতায় পাঁচটি বাস স্ট্যাণ্ডে শেড করে দিয়েছেন। কাজেকর্মে প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়।

একদা এক দ্বিপ্রহরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে থিয়েটার রোড দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে এল একটা বিশাল শো রুমে নতুন গাড়ি এসেছে। এমন গাড়ি তিনি এর আগে দ্যাখেননি। ড্রাইভারকে থামতে বলে তিনি সোজা চলে এলেন শো রুমে। দোকানের মালিক তাঁকে দেখতে পেয়েই চিনতে পারলেন। আলাপ না থাকলেও চোখে দেখেছেন। নিজেই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে ? বলুন কি সেবা করতে পারি ?'

রাকেশ ততক্ষণে শো রুমে রাখা নতুন গাড়িটির পাশে চলে গিয়েছেন। ঘুরে ফিরে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইটে কারা তৈরী করেছে ?'

মালিক সবিনয়ে বললেন, 'জাপানের এক নামজাদা কোম্পানির সঙ্গে পুনার এক কোম্পানি এই গাড়ি তৈরী করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।'

'দাম কত ?'

'আজ্ঞে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।'

'কবে পাওয়া যাবে ?'

'এখন চুক্তি করলে মাস আস্টেক লাগবে।'

'বুকিং চার্জ ?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

রাকেশ সময় নষ্ট না করে চেকবুক বের করে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক কেটে বললেন, ক্যাশ হলে আমার লোক এসে রসিদ নিয়ে যাবে।

মালিক ব্যস্ত হলেন. 'না না, এই চেক দিয়েছেন আপনি, তার রসিদটা নিয়ে যান।'

রাকেশ কোন কথা না বলে নিজের গাড়িতে উঠলেন।

তিনদিন বাদে দোকানের মালিক টেলিফোন করলেন, স্যার চেক ক্যাশ হয়ে গিয়েছে। আপনার সিরিয়াল এক নম্বর। এত কষ্টলি কার যে বায়ার বেশী নেই। আমি লোক দিয়ে আপনার অফিসে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মাসখানেক বাদে রাকেশ ওই পথে যেতে যেতে দোকানটা দেখতে পেয়ে নামলেন। মালিক খুব আপ্যায়ন করলেন। কবে নাগাদ গাড়ি পাওয়া যাবে জানতে চাইলেন। একটু তাঁর হয়ে তাগাদা করতে বলে তিনি চলে গেলেন। ছয় মাসে তিন চারবার এমন আসা-যাওয়া চলল। মালিক বুঝলেন যে রাকেশের ভারি পছন্দ হয়েছে ওই মডেলের গাড়ি। তিনি চেষ্টা করলেন বাজারে ছাড়া মাত্র যেন আগে গাড়ি তাঁর দোকানে আসে। এক শুক্রবার বিকেলে গাড়ি এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাকেশের অফিসে জানিয়ে দিলেন সে কথা। রাকেশ ছিলেন না। পরদিন বেলা বারোটায় তিনি এলেন শো রুমে। গাড়ি দেখলেন। পছন্দ হল। এবং ডেলিভারী নিতে চাইলেন। তাঁর আসক্তির কথা মালিক জানত। কাগজপত্র তৈরী করে চেকে বাকী টাকা নিয়ে গাড়ীর চাবি দিয়ে দিল। ড্রাইভারকে নিজের গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলে নতুন গাড়ি চালিয়ে রাকেশ বেরিয়ে গেলেন শো রুম থেকে।

ঠিক পৌনে একটা নাগাদ দোকানে একটা টেলিফোন এল। কেউ একজন কোঠারি জানতে চাইছেন আজ রাকেশ গুপ্তা যে গাড়ি কিনেছেন তার দাম কত দিয়েছেন?'

মালিক একটু অবাক হয়েই উত্তরটা দিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি এই প্রশ্ন করছেন কেন?'

কোঠারি বললেন, রাকেশের হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়ায় আমার কাছে আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রী করতে চাইছেন। তাই ভেরিফাই করলাম।

'আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'রেস কোর্স থেকে।' লাইন কেটে গেল।

মালিক ঘড়ি দেখলেন। আর দশ মিনিট বাকি আছে দোকান বন্ধ করতে। তাঁর মাথা ঘুরছিল। ছ মাস ধরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলে রেখে বার বার তাগাদা দিয়ে যে লোকটা একটু আগে গাড়ি নিয়ে গেল হাসি মুখে সে এক ঘণ্টার মধ্যেই এক লক্ষ টাকা লস্ করে বিক্রী করবে? এমন গল্প কেউ কখনও শুনেছে? অসম্ভব। ড্রয়ার থেকে চেক বের করলেন তিনি। সব ঠিক আছে। কিন্তু এই চেক ক্যাশ হবে তো! হবে না। হলে কেউ আন্ডার সেল করে না। মাথা খারাপ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। তিনি তৎক্ষণাৎ লালবাজারে ছুটলেন।

লালবাজারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। অফিসাররা সকলেই একমত হলেন যে ওই চেক ভাঙানো যাবে না। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হল। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন। শনিবার।

আড়াইটে নাগাদ পুলিশ অফিসার মালিককে নিয়ে এলেন রেস কোর্সে। রাকেশ গুপ্তা লনের চেয়ারে বসে ঘোড়ার বই দেখছিলেন। সামনে এক ভদ্রলোক, পুলিশ এবং মালিককে দেখে অবাক হলেন তিনি।

পুলিশ অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার গুপ্তা, আপনি সকালে অত দামী গাড়ি সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় কিনে এক ঘণ্টার মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রী করতে চাইছেন কেন? ইনি আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন।

'আমার গাড়ি আমি কি টাকায় বিক্রী করব সেটা কি উনি ঠিক করে দেবেন?

ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাসে আলতো চুমুক দিলেন রাকেশ।

মালিক উত্তেজিত হলেন, নিশ্চয়ই না। কিন্তু আপনার দেওয়া চেক এখনও ক্যাশ হয়নি।'

'ও।' চোখ তুললেন রাকেশ, 'আপনি বলছেন যে আমার চেক বাউন্স করবে?'

'হ্যাঁ, এই সন্দেহ আমার হচ্ছে।' মালিক স্বীকার করলেন।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়ি কেনার এক ঘণ্টা পরেই আপনি কেন আন্ডার সেল করতে যাচ্ছেন। মিস্টার গুপ্তা?'

'আমার টাকার দরকার। আজই।'

জানাতে আপত্তি আছে কেন হঠাৎ আপনার এত টাকার দরকার?'

'বিন্দুমাত্র নয়। আমাকে আগামী কাল লণ্ডনে যেতে হবে।'

'না কক্ষণো নয়।' চেঁচিয়ে উঠলেন মালিক, 'যদি চেক ক্যাশ না হয় তাহলে আমি তিন লক্ষ টাকা লস করব।'

'তার মানে আপনি বলছেন আমি লন্ডনে গিয়ে দেশে আর ফিরে আসব না?

'এখন সব কিছু হতে পারে। অফিসার, আপনি একটা বিহিত করুন।'

অফিসার বললেন, 'দেখুন, উনি যে চেক দিয়েছেন তা যদি বাউন্স করে এবং দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে ওঁকে আমি এ্যারেস্ট করতে পারি।'

রাকেশ হাসলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনারা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কেন যোগাযোগ করছেন না। ব্যাঙ্ক বলে দিতে পারে ওই চেক বাউন্স হবে কিনা।'

অফিসার বললেন, 'শনিবার ব্যাঙ্ক বারোটায় বন্ধ হয়। আমরা যখন যোগাযোগ করি তখন আরও সময় গিয়েছে। ম্যানেজার বাড়িতে চলে গিয়েছেন।'

'কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে তার বাড়িতে যোগাযোগ করা কি খুব দুরূহ কাজ। আপনারা নিশ্চিত হন যে, তিন লক্ষ টাকা আমার ব্যাঙ্কে আছে।'

'কিন্তু লন্ডনে কেন কালকেই যেতে হবে আপনাকে?'

'এখানে এসে এক বন্ধুর কাছে জানলাম যে আগামী পরশু লন্ডনে আমি না পৌঁছালে দু'লক্ষ টাকার একটা লোকসান হবে আমার। ওদের সঙ্গে যে ব্যবসা করেছিলাম তাতে দু'লক্ষ টাকা লাভ হবার কথা। আমি জানতাম ওটার জন্যে আমি সপ্তাহ খানেক সময় পাব। কিন্তু এখন জানলাম, কালই রওনা হতে হবে। বুঝতেই পারছেন দু'লক্ষ টাকা ক্ষতি করার চাইতে লক্ষ টাকা হারানো বুদ্ধিমানের কাজ। রাকেশ উঠে দাঁড়ালেন। মালিক কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।'

অফিসার বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, এঁর নিরাপত্তার প্রয়োজনে আজ আপনি কোথায় কোথায় থাকছেন, তা আমার জানা উচিত।'

'বাড়িতেই। আজ বাড়িতেই থাকব আমি।'

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করতে অসুবিধে হল না পুলিশের। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। একজন সাদা পোশাকের পুলিশ রাকেশের পেছনে ছিলেন।

তিনি জানালেন, রেসকোর্স থেকে সোজা নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন রাকেশ।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পুলিশ দেখে থতমত। অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বলতে পারেন মিস্টার রাকেশ গুপ্তর এ্যাকাউন্টে আজ কত টাকা আছে?'

ভদ্রলোক চিন্তা করলেন, 'দেখুন, কোন ক্লায়েন্টের এ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, তা যদি সরকার অফিসিয়ালি না জানতে চান, তাহলে জানানো রীতিবিরুদ্ধ কাজ। তাছাড়া আমার ব্যাঙ্কে সব এ্যাকাউন্টের হিসেব মুখস্থ রাখা সম্ভব নয়।'

'তবু, মিস্টার গুপ্তর মত একজন ব্যবসায়ীর—'

হ্যাঁ, যদ্দূর জানি ওর এ্যাকাউন্টে অনেক টাকা থাকে। আপনি এক কাজ করুন। উনি একটা তিন লক্ষ টাকার চেক কেটেছেন সোমবার সেটা প্রোডিউসড্ হবে। কিন্তু আগামীকাল ওঁর দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা। তাই আপনি যদি ব্যাঙ্কে গিয়ে রেজিস্টার থেকে ভেরিফাই করে বলেন, ঠিক সব—।'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'শনিবার ব্যাঙ্কের দরজা একবার বন্ধ হলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া সোমবার সকাল দশটার আগে খোলা যাবে না। এটা আইন।'

'যদি আগুন লাগে, কিংবা ডাকাতি হয়?'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা সেই ধরনের ইমারজেন্সি নয়।'

অতএব কোন কাজ হল না। সেই রাত্রে রাকেশ গুপ্তর বাড়িতে মালিক এবং অফিসার পৌঁছালেন। তারা স্পষ্ট জানালেন যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সোমবার সকালের আগে কিছু বলতে অক্ষম। সেক্ষেত্রে রাকেশকে সোমবার লন্ডনে যেতে হবে।

'আপনারা আমার দু'লক্ষ টাকা ক্ষতি হোক চাইছেন?' কেউ জবাব দিল না।

রাকেশ বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনারা আমাকে বিশ্বাস করছেন না কেন? আমি তো এখনও কোন অন্যায় করিনি।'

অফিসার বললেন, 'এক কাজ করুন। আপনি গাড়ি মালিককে ফেরত দিন আর পঞ্চাশ হাজার টাকাও উনি আপনাকে ফেরত দিচ্ছেন।'

'অসম্ভব। আমার কাল সকালে দু'লক্ষ টাকা দরকার।' রাকেশ মাথা নাড়লেন।

'যদি গাড়ি ডেলিভারী না পেতেন?'

তাহলে কোন বন্ধুকে ওই এ্যাকাউন্টের চেক দিতাম। ব্যাঙ্কে এখন মাত্র তিন লাখ টাকা আছে। তাই দ্বিতীয় চেক ইস্যু করতে পারছি না। একটু ভাবলেন রাকেশ, 'আচ্ছা, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি লন্ডনে গেলে এক লক্ষ টাকা লাভ

করব। যদি না যাই, যদি সোমবার ব্যাঙ্ক খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করি এবং দেখা যায় চেক ক্যাশ হয়েছে তাহলে আমার ক্ষতিপূরণ হিসেবে উনি আমাকে এক লক্ষ দেবেন। আমি গাড়ি বিক্রী করছি না, যদি দেখা যায় চেক বাউন্স করেছে তাহলে উনি গাড়ি ফেরত নিয়ে যাবেন। আর জমা দেওয়া পঞ্চাশ হাজার আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

মালিক আর অফিসার পরস্পরের দিকে তাকালেন। শেষ পর্যন্ত মালিক রাজী হলেন এই প্রস্তাবে। মৌখিক নয়, লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। মালিক স্বস্তি পেলেন। তিন লক্ষ টাকার বদলে এক লক্ষ টাকার ওপর দিয়ে যদি যায় তো যাক।

সোমবার সকালে নিজে ব্যাঙ্কে না গিয়ে পুলিশ অফিসারকে নিয়ে রাকেশের ব্যাঙ্কে পৌঁছে গেলেন মালিক ঠিক সময়। ম্যানেজার এ্যাকাউন্ট দেখলেন। রাকেশের একাউন্টে সেদিন তিন লক্ষ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা রয়েছে।

মালিকের পকেট থেকে এক লক্ষ টাকা রাকেশের কাছে পৌঁছে গেল চুক্তি মত।

পাঠক, রাকেশ গুপ্ত নিশ্চয়ই নায়ক হলেন। প্রমাণ হল তিনি সৎ লোক। মিথ্যে চেক দেননি। ভাঁওতা করে টাকা হাতাতে চাননি মিথ্যে চেক দিয়ে। তাঁর সততা যখন প্রমাণিত হল তখন তিনি নিশ্চয়ই সর্বাংশেই নায়ক। মালিক কিংবা পুলিশ অফিসার যে ঘটনাটা জানালেন না, পাঠক সেটা জানার পর বিচার পর্ব নতুন করে শুরু করা যেতে পারে।

একথা সত্যি একদিন ওই রাস্তায় যাওয়ার সময় রাকেশ শো রুমে গাড়ি দেখতে পেয়ে নেমে পড়েছিলেন। গাড়ি কাছ থেকে দেখার পর তার এত ভাল লেগেছিল যে তিনি কিনতে চেয়েছিলেন। এই চাওয়ায় কোন ফাঁকি ছিল না। সেই মুহূর্তে কিছু না ভেবেই তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়ে এসেছিলেন গাড়ির ডিলার তথা শোরুমের মালিককে।

তারপর যখন তাগাদা দিয়েও কোম্পানির কাছ থেকে তিনি গাড়ি আগেভাগে পাচ্ছিলেন না তখন তাঁর আগ্রহ নিশ্চয়ই কমতে শুরু করেছিল। মুস্কিল হয়ে গেল শনিবার সকালে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছোনোয়।

শনিবার সকাল পৌনে এগারোটায় রাকেশ প্রথমে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে টেলিফোন করেন। তিনি তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন। নামকরা ব্যবসাদারের এ্যাকাউন্ট নিজের ব্রাঞ্চে থাকলে ম্যানেজার খাতির করবেনই। ফোনে রাকেশ ম্যানেজারের কুশল জিজ্ঞাসা করার পর বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে এই মুহূর্তে খাতা না দেখে বলতে পারবেন যে আমার এ্যাকাউন্টে কত টাকা ব্যালেন্স পড়ে আছে।'

ম্যানেজার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খাতা না দেখে বলতে বলছেন কেন?'

'জাস্ট কৌতূহল।'

'তা কি বলা যায়। তবে তিন চার লাখ তো নিশ্চয়।'

'আমি ছাড়া এই প্রশ্ন আর যদি কেউ করে তাহলে কি উত্তর দিতে আপনি বাধ্য ?'

'সরকারি লেভেল, এ্যাপ্রোচ হলে বলতেই তো হবে।'

'আজ ব্যাঙ্ক বারোটায় বন্ধ হচ্ছে। তারপর সরকারি বা বেসরকারি অনুরোধ হলে ?'

'তখন তো আমি খাতা দেখাতে পারব না। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সরকারি অনুরোধ আমরা রাখব। কিন্তু তারপর এলে তাঁদের সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'গুড। কিন্তু স্মৃতি থেকে যে বললেন, আপনার স্মৃতি ভুল করতে তো পারে।'

'তা পারে। কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'কিছুই নয়। আমার ম্যানেজার বললে এ্যাকাউন্টে লাখ দুয়েক আছে।'

'হয়তো। ভেরিফাই করব ?'

'না। সোমবার সেটা হবে। আপনার কাছে অনুরোধ আছে।'

'বলুন।'

'এখন থেকে ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আগে আপনি কিংবা আপনার স্টাফ আমার খাতা দেখবেন না। কেউ জিজ্ঞাসা যদি পরে করে তাহলে বলবেন ওই এ্যাকাউন্টে ভাল টাকা আছে কিন্তু ফিগারটা আন্দাজে বলা আপনার পক্ষে অসম্ভব।'

'এটাই তো সত্যি কথা। আমি তাই বলতাম।'

'খুব ভাল। আপনার উপকার আমি মনে রাখব।'

লক্ষ্য করুন, রাকেশ কোন অন্যায় করলেন না। শনিবার দুটোর পর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার স্মৃতি থেকে সঠিক অংক বলতেও পারতেন না। কিন্তু ধরা যাক, সেদিন সকালে তিনি কোন কারণে রাকেশের এ্যাকাউন্ট দেখতে গিয়ে অংকটা মনে রেখেছিলেন। তাই রাকেশ কোন ঝুঁকি নিলেন না। একজন ভদ্র মানুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক তাই করতে ম্যানেজারকে অনুরোধ করলেন। কোন জাল জুয়োচুরি অথবা মিথ্যা ভাষণ করতে তাঁকে প্রলুব্ধ করলেন, কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে ওঁকে সচেতন করে দিলেন।

এরপরে তিনি এমন সময় গাড়ির ডিলারের শো-রুমে পৌঁছালেন যাতে তাঁর দেওয়া চেক বেলা বারোটার মধ্যে মালিক ব্যাঙ্কে জমা না দিতে পারেন। তাঁকে সেটা দেবার জন্যে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। প্রথম পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ঠিক সময়ে ভাঙাতে পেরে এবং মাসে মাসেই রাকেশের দেখা পাওয়ায় মালিকের মনে দ্বিতীয় চেক নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি গাড়ি দিয়ে দিলেন।

গাড়ি নিয়ে রেসকোর্সে গিয়ে যে লোকটিকে তিনি দেখলেন তাকে ইদানীং দেখতে চান না। এককালে ভাল পরিচয় ছিল। কিন্তু শুধু জুয়ো খেলে নিজের সর্বনাশ করেছে সে। মাসে মাসে এই রেসকোর্সে পাঁচশো ছয়শো ধার চেয়েছে লোকটা। কখনও শোধ করার কথা বলেনি। রেসের মাঠে এসে এমন অসম অবস্থায়

মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। এড়ানো যায় না। এক সমিয় তিনি মত পাল্টালেন। লোকটার সামনে গিয়ে বললেন, তুমি আজ পর্যন্ত পাঁচশো পাঁচশো করে কত টাকা ধার নিয়েছ্ জানো?'

লোকটি প্রায় হাতজোড় করল, 'বিশ্বাস করুন, খুব ঝামেলায় আছি। মাসখানেক সময় দিলে শোধন করে দেব সব।'

রাকেশ হাসলেন, 'তোমাকে শোধ করতে হবে না। তার বদলে একটা কাজ করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'

ওকে নিয়ে এলেন যেখানে তার নতুন কেনা গাড়ি পার্ক করা ছিল। সেটা দেখে লোকটির চক্ষু স্থির। রাকেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম একটা গাড়ি কিনতে ইচ্ছে করে?'

লোকটি মাথা নাড়ে, 'কি করে কিনব? পয়সাই নেই।'

'কিন্তু আমি এই গাড়িটা বিক্রী করব।'

'বিক্রী করবেন? একদম নতুন গাড়ি।'

'আজ সকালে কিনেছি।'

'সে কি? কেন?'

'আমাকে কাল লন্ডনে যেতে হবে। গাড়িটা কেনার আগে জানতাম না। টাকার দরকার হয়ে পড়েছে খুব।'

'কত পড়ল গাড়িটা?'

'সাড়ে তিন লক্ষ।'

'বাপ্‌স। কত পেলে বিক্রী করবেন?'

'দশ বারো হাজার কম হলে ভাল হয়।'

'অসম্ভব। যদি আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রী করেন তাহলে আমি খদ্দের দেখতে পারি।'

'মানে এক লাখ লস?'

'এরকম টোপ না দিলে পার্টি গাড়ি নেবে কেন?

'আজ বিকেলের মধ্যে টাকা চাই। আমি দরাদরি পছন্দ করি না।'

'কিন্তু স্যার, একবার আপনার ডিলারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কি কথা?'

'টাকার ব্যাপার তো, অনেক টাকা। তাই ওর কাছে ভেরিফাই।'

রাকেশ ঘড়ি দেখলেন, 'যেতে যেতে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি এখান থেকে টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

তারপর লোকটি অত্যন্ত দীপ্ত ভঙ্গীতে ডিলারের সঙ্গে কথা বলে এল টেলিফোনে। বিকেলের মধ্যে সে সব ব্যবস্থা করবে জানিয়ে দিল রাকেশকে। সেই কাজ করে দেবার জন্যে রাকেশ তাকে আর ধার শোধ করতে বলবে না। যে কিনছে তার

কাছ থেকেও কমিশন পাবে সে। পুলিশ যদি জানতে চাইত ক্রেতা কে, তাহলে তাকে দেখিয়ে দিতেন রাকেশ। জেরা করলে সে যা বলত তা রাকেশের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণ করত। লন্ডনে যাবে বলে টাকার দরকার হওয়ায় রাকেশ গাড়িটা কম দামে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন। লোকটি স্বীকার করবে যে, সে যাচাই করার জন্যে ডিলারকে ফোন করেছিল। অবশ্য সেই বিকেলে লোকটি আর রাকেশের দেখা পায়নি। তাঁর ম্যানেজার জানিয়ে দিয়েছিল যে অত ব্যস্ত যে, দেখা করার সময় নেই তাঁর। এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছে। পাঠক এখনও কি রাকেশকে ভিলেন বলে মনে হচ্ছে আপনার? এই লোকটিকে দিয়ে ডিলারকে ফোন করানো প্রয়োজন ছিল রাকেশের। কোন পরিচিত মানুষকে ওই ফোন করতে যদি অনুরোধ করতেন তাহলে তার সন্দেহ হতো। এই সাজানো টেলিফোনের গল্প চাউর একদিন নিশ্চয়ই হতো। কোন ঝুঁকি না নিয়ে রাকেশ এমন ভাবে গল্প সাজালেন যে, ওই দালাল টাইপের লোকটি একটি চরিত্র হয়ে গেল। সে কখনই বলবে না রাকেশ তাকে দিয়ে ফোন করিয়েছে। অথচ এই ফোনটি সব চেহারা পাল্টে দিল। এরকম একটা ফোন না পেলে শোরুমের মালিক কখনই বিচলিত হতেন না। তাঁর মানে রাকেশের দেওয়া চেক সম্পর্কে সন্দেহ, রাকেশের বাইরে যাওয়া মানে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি আতঙ্ক ওই ফোন পেয়েই এত প্রবল হল যে, তিনি পুলিশের কাছে ছুটলেন।

এরপরে সবাই যখন তার কাছে এল তিনি কোনরকম মিথ্যে কথা বলেননি একটি ছাড়া। তবে সেটিও আধা মিথ্যে। লন্ডনে ব্যবসা ছিল তাঁর। যেতে হবে। এই অবধি ঠিক কিন্তু কালই যেতে হবে এমন ধরাবাঁধা ব্যাপার ছিল না। মজার কথা হল ভদ্রলোক পুলিশ অফিসারকে সমানে সত্যিকথা বলে গিয়েছে তাঁর ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টের ব্যাপারে। তিনি সমস্ত সবিনয়ে জানিয়েছেন, তাঁর ব্যাঙ্কে ওই টাকা আছে। কিন্তু এই বলা কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাতে পারেনি ডিলার অথবা পুলিশ অফিসারের সামনে। তাঁরা সমানে অবিশ্বাস করে গিয়েছেন।

এবার শেষ চাল। রাকেশ গুপ্ত বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে কিছু অর্থ রোজগারের বাসনায় সকাল থেকে যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই মত যখন ঘটনা এগিয়ে গেল তখন তিনি ক্ষতিপুরণের টাকা চাইলেন। প্রতিপক্ষ অর্দ্ধ ত্যজতি পণ্ডিতঃ এই নীতি মেনে নিয়ে রাজী হল। তিনি দোলায় দুলছিলেন কিন্তু রাকেশের কোন ঝুঁকি ছিল না কারণ ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে তা তাঁর জানা ছিল। কেউ যে তাঁর নিজের কাছে রাখা পাশ বই অথবা স্টেটমেন্ট অফ এ্যাকাউন্ট দেখতে চাইল না এইটেই বিস্ময়ের। অবশ্য জবাব তৈরী ছিল। ওগুলো আপ-টু-ডেট করা ছিল না।

রাকেশ গুপ্ত কি ভিলেন? এই নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আইনের চোখে তিনি কোন অন্যায় করেননি প্রতিটি মুভমেন্টের স্বপক্ষে সহজ যুক্তি রেখেছেন।

ধমকে বা খারাপ কাজ করে টাকা আদায় করেননি। তিনি মানুষের মনে যে নিরাপত্তার অভাব-বোধ সবসময় চাপা থাকে তাকে উসকে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়েছিলেন। ডিলারের উসকে-ওঠা ওই বোধ যখন লকলক করল তখন তিনিই স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। কিন্তু এসব তো যুক্তির ব্যাপার। আমরা, এবং সেই ডিলার আর অবশ্যই রাকেশ গুপ্তা নিজে ভাল জানতেন জাঁতাকলের চাপ দিয়ে টাকাটা হাতানো হয়েছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবেকের কথা ভাবলে রাকেশ ভিলেন হবেই, যদিও এইরকম বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

বুদ্ধিমান ভিলেনদের দেখা সবসময়ে পাওয়া যায় না। আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক থাকতেন, ফিল্মে অভিনয় করতেন। তখন প্রায় প্রতিটি ছবিতে তিনি চকরা বকরা জামা পরে হাতের গুলি ফুলিয়ে নায়ককে ভয় দেখাতেন। ছুরি হাতে তার মুখ দেখলেই ভয় হত আমাদের। সর্দারের আদেশ পালন করে যাওয়া এক ভিলেন ভাবা যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি কিন্তু নিজেকে ভিলেন ভাবতেন। এমন ভিলেনে আমাদের কোন আকর্ষণ নেই।

অনেকেই বলেন পৃথিবীর চিরকালের সেরা ভিলেনের নাম হিটলার। এই মানুষটি অহঙ্কারের শীর্ষবিন্দুতে উঠে পৃথিবীটাকে পদানত করতে চেয়েছিলেন। এই কাজ করতে তিনি কোনরকম দ্বিধাকে জায়গা দেননি। হাজার হাজার মানুষকে তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। এসব সত্যি কথা। কিন্তু এও সত্যি জার্মানির মানুষ একসময় তাকে ঈশ্বর বলে মনে করত। কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম হিটলারের প্রশস্তি করে জার্মানিতে কিছু মানুষ সভা করেছেন। এ থেকে মনে হল সমস্ত জার্মান মনে করেন না যে, তাঁদের নেতা একসময় অন্যায় করেছিলেন। সাম্রাজ্যবিস্তার করতে গেলে যা যা করা উচিত, তাই করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলেও পাণ্ডবরা নায়ক। কারণ যুদ্ধে যা হয় তাই ওঁরা করেছিলেন। নাৎসীরা ছাড়া পৃথিবীর সব মানুষ হিটলারকে ভিলেন বলতে পারেন কিন্তু যাদের জন্যে তিনি করেছেন তাঁরা বলবেন কেন? অর্থাৎ মানুষ ভেদে ভিলেনের চেহারা বদলায়।

আমাদের পাড়ার এক বস্তিতে টাকু কানাই নামে একটা ছেলে থাকত। জন্মাবার পর দেখা গেল তার মাথায় একটিও চুল ওঠেনি। কেশশূন্য মাথা নিয়ে সে বড় হল। সেই কারণে তার নাম টাকু কানাই। স্কুলে যায় নি কখনও, প্রথমে একটা চায়ের দোকানে কাজ করত। মা বোন পিসী ভাই বিরাট সংসার। টাকু কানাই-এর ওপর তাঁরা নির্ভর করেছিল। একদিন চায়ের দোকানে এক মাতালের সঙ্গে দাম দেওয়া নিয়ে ঝামেলা হতেই মাতাল হাত চালিয়েছিল। জীবনে সেই প্রথমবার ক্ষেপে গিয়ে পাল্টা মার মেরে শুইয়ে দিয়েছিল টাকু কানাই। রাস্তায় লম্ফ ঝম্ফ করে সে বীরত্ব দেখিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক তাকে ভয় পেতে শুরু করল। টাকু কানাই সেটা বুঝতে পেরে কাজে লাগাল। চায়ের দোকানের কাজ ছাড়ল। এবং ধীরে ধীরে যাকে বলে এক নম্বর সমাজবিরোধী তাই হয়ে গেল।

দেখা গেল, টাকু কানাই-এর বাড়ির শ্রী ফিরেছে। তারা দুবেলা বেশ ভাল খাচ্ছে, পোশাকও পাল্টেছে। ভাই, বোনেরা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মাস্তানি করে যা আয় হচ্ছে, তার একটা মোটা অংশ টাকু কানাই বাড়ির মানুষের জন্যে খরচ করছে। কিন্তু সে যে ভুলটা করেছিল তা হল কোন রাজনৈতিক দলের ধারায় দাঁড়ায়নি। একদিন পুলিশ যখন তাকে পেঁদিয়ে মেরে ফেলল তখন পাড়ার মানুষ স্বস্তি পেল। একটা গুণ্ডার মৃত্যু সবাইকে প্রফুল্ল করল। রাজনৈতিক দাদারাও এল না। কিন্তু টাকু কানাইয়ের বাড়ির লোক কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওই মৃত্যু তাদের স্বর্গ থেকে নরকে টেনে নামাল। ওদের কাছে টাকু কানাই নায়ক নয়, একথা কে বলবেন? যে ছেলে তাদের দু' বেলা খাওয়া-পরার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল, তাকে ওরা ভিলেন ভাবতে পারে না। মনে রাখতে হবে, আইনের চোখে রবিন হুড ভিলেন ছিলেন।

ধরা যাক, একটি মেয়ে যার নাম সুজাতা, হায়ার সেকেণ্ডারিতে ভাল ফল করেছে। কিন্তু তার চেয়ে ভাল ফল করা ছেলেমেয়ের সংখ্যা এদেশে অনেক। সে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তাদের বংশে ওর আগে কোন ছেলে বা মেয়ে প্রথম বিভাগে কখনও পাশ করেননি। ওর বাবা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে রেলে চাকরি নেন। যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি অনেক উন্নতি করেছিলেন। সুজাতার দাদাও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে এখন পলিটেকনিক-এ পড়ছে।

প্রথম বিভাগে পাশ করায় সুজাতার ধারণা ছিল, সে ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে। কিন্তু কলকাতার নামী কলেজগুলো শতকরা সত্তর নম্বর না পেলে ফর্ম দিতে চাইল না। সুজাতা আবিষ্কার করল এখন প্রথম বিভাগ অথবা তৃতীয় বিভাগের কোন পার্থক্য নেই। ভাল ছাত্র মানে, গড়ে পঁচাত্তরের ওপরে নম্বর পেয়েছে, তারাই। সুজাতার বাবার কোন পরিচিত মানুষ কলেজে ভর্তি করার ক্ষমতায় ছিলেন না। অতএব এক নম্বর কলেজগুলোর আশা ছেড়ে দিয়ে সুজাতা বাড়ির কাছাকাছি একটি কলেজে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। সে স্কুলে বিজ্ঞান শাখায় পড়েছিল। কোন গৃহশিক্ষক অর্থাভাবে তার বাবা দিতে পারেননি তাকে। বিজ্ঞান সম্পর্কে বাড়িতে কারও কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না তবু সুজাতা প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্য পেয়ে।

সুজাতা দেখতে আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মত। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রঙ না-ফরসা-না কালো। মুখ চোখে শ্রী আছে। চুল ঘন। স্কুল আর বাড়ি ছাড়া আর কিছু সে এতদিন জানত না। তার বাড়ির আবহাওয়াতে রক্ষণশীলতা প্রচণ্ড। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার মা-ঠাকুমা সেগুলো তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন, বাড়ির বাইরে হুটহাট যাওয়া চলবে না। যদি যেতে হয় সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে হবে। রাস্তায় অচেনা কেউ কথা বলতে চাইলে মাটির দিকে মুখ করে তাকে এড়িয়ে যেতে হবে। বাড়ির ছাদে একা যাওয়া চলবে না। চিৎকার করে কথা বলা নিষেধ। নারীর পরিচয় তার ব্যবহারে এবং সেই ব্যবহার ভদ্র সভ্য করতে গেলে তাকে

নম্র বিনয়ী এবং লজ্জার গণ্ডি মেনে চলতে হবে। যে কোন মেয়ের মত সুজাতার এসব মেনে চলতে আপত্তি ছিল। কিন্তু অভ্যেস তার মধ্যে চমৎকার কাজ করায় সে এসবের আবর্তেই ছিল এতকাল। কলেজে ভর্তি করার সময় সুজাতার বাড়ির লোকদের, একমাত্র দাদা ছাড়া, আপত্তি ছিল কো-এডুকেশন কলেজ সম্পর্কে। যেখানে ছেলেরা পড়ে সেখানে পড়া চলবে না। কিন্তু দু'তিনটি বাদে কলকাতায় সব ভাল কলেজেই ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। তাই ব্যাপারটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন তাঁরা। কলেজে যাওয়ার আগে ওর ঠাকুমা ও মা বারংবার কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। কলেজে গিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে সে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলবে না। এই নিতান্ত প্রয়োজন ব্যাপারটা নিয়েও মা আর ঠাকুমার মধ্যে তর্ক লেগেছিল। ঠাকুমা চেয়েছিলেন কোন ভাবেই কথা না বলতে। কলেজের মেয়েদের সঙ্গে হুটহাট বাইরে বেড়াতে যাবে না। কোনো রকম দলাদলির মধ্যে সে থাকবে না। সুজাতার মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল, প্রথম দিকে তার সঙ্গে কলেজ পর্যন্ত যাওয়ার। কিন্তু সুজাতার দাদা প্রচণ্ড আপত্তি করায় সেটা বাতিল হল। শেষ কথা, ঠাকুমা বললেন, তোর বয়সে আমার বিয়ে তো বটেই, দুই ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখন তো সেই যুগ নেই। বংশ-মর্যাদার কথা মনে রেখ। মা বলেছিলেন, না, তোমরা কেউ হওনি, কিন্তু আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

অর্থাৎ সুজাতা, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ চেহারার এক বাঙালী মেয়ে এই রকম বাড়ির পরিবেশ থেকে কলেজে পড়তে এল। বাড়ির বাইরে এসে প্রথম দিনেই সুজাতার যেসব অভিজ্ঞতা হল, সেগুলো এইরকম :

স্কুলে যেত সে স্কার্ট পরে। তাদের স্কুলে শাড়ি পরার চল ছিল না। আজ শাড়ি পরে ট্রাম স্টপেজের দিকে যেতেই মিষ্টির দোকানের পাশের রক থেকে একটি সিটি উঠল। কেউ একজন সেই বেসুরো গানটা গেয়ে উঠলো, হাওয়া হাওয়া। আর তারপরেই একটা সাইকেল তার গায়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে গেল রকটার দিকে। সে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল। সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। ট্রাম স্টপে পৌঁছে যেন বুকের কাঁপুনি থামল।

শাড়ি সে বাড়িতে বছর দুয়েক পরছে। কিন্তু এখন সেটা আরও অস্বস্তির কারণ হয়ে পড়ল। তাকে যেন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে কাপড়টা, ইচ্ছে হলেও দৌড়াতে পারবে না।

পাঠক, লক্ষ্য করেন, রকে বসে যারা সিটি দিয়েছিল অথবা যে ছেলেটি সাইকেলের কসরৎ দেখিয়েছিল, তাকে সে কিছুতেই নায়ক বলে ভাবতে পারেনি। অথচ ওরা কিন্তু নায়ক হতেই চেয়েছিল।

ট্রামে উঠে লেডিস সিটের দিকে যেতে গিয়েও যেতে পারল না সে। মহিলা যাত্রীরা সেদিকটা ভিড় করে আড়াল রেখেছেন। এদিকে পুরুষরাও ঠাসাঠাসি। মাঝখানে পড়ে তার দম বন্ধ হবার অবস্থা। কলেজ বাড়ির কাছাকাছি হলেও ট্রামে যেতে হবে দশ মিনিটের পথ। সুজাতার শরীরের পেছন দিকে অপরিচিত পুরুষের শরীরের

চাপ আর সামনে এক বিশাল মহিলার দেহ। এই অবস্থায় যাত্রা শেষ করে সে যখন রাস্তায় নামল তখন শাড়ির চেহারা কিছুটা পাল্টেছে। ওর মানে সাধারণ অবস্থায় যদি তাকে কোন পুরুষ ওইভাবে চেপে থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই হুলুস্থুলু পড়ে যেত।

ট্রামের পরিবেশে যা স্বাভাবিক, তা বাইরে অশ্লীল। মা বাবা ঠাকুমা দৃশ্যটি দেখলে নিশ্চয়ই হার্টফেল করতেন।

পশ্চিমবাংলার পরিবহণ-ব্যবস্থাকে সে খুব খারাপ চোখে দেখতে লাগল। খবরের কাগজে যানবাহন মন্ত্রীর ছবি বের হয় মাঝে মাঝে। তাঁকে ভিলেন বলে মনে হচ্ছিল তার।

প্রায় চার মাস কলেজ করার পর সুজাতা কতগুলো ব্যাপারে অভ্যস্ত হল। রাস্তায় কোন ছেলে যদি কিছু মন্তব্য করে অথবা অনুসরণ করে তাহলে তাকে কিভাবে উপেক্ষা করতে হয় তা সে জানল।

ট্রাম বাসের ভিড়ে কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে যাওয়া যায়, তার কায়দা শিখে ফেলল। শাড়ির বাঁধনে আর অস্বস্তি হচ্ছিল না।

কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে সে সহজেই আড্ডা মারতে পারছে। এমন কি যেসব ছেলেকে নিরীহ মনে হয়, কথাবার্তায় কিঞ্চিৎ মেয়েলি স্বভাবের তাদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি হয় না তার।

এইসব ছেলেরা নির্দোষ সঙ্গ চায় মেয়েদের। তাদের ফাইফরমাস খেটে দিতে পারলে কৃতার্থ বোধ করে। সুজাতা এদের কাছেই খবর পায়, কলেজের কোন কোন বেপরোয়া ছেলে তাদের সম্পর্কে কি কি কথা বলে। যে ছেলেটি খুব রুক্ষ মনে হয় দূর থেকে, সেই নাকি কলেজ স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

যে সারাক্ষণ গেটের বাইরে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারে, সে নাকি গ্রুপ থিয়েটার করে। এদের সম্পর্কে কৌতূহল থাকলেও সে কথা বলতে চায় না। কেমন একটা দ্বিধা বা সঙ্কোচ তার সামনে দেওয়াল তুলে রাখে সবসময়।

সুজাতার এই মানসিক পরিবর্তনের কথা তার বাড়ির মানুষরা জানলেন না। সে ঘুণাক্ষরে এসব কথা বাড়িতে আলোচনা করে না।

প্রথম দিকে সরল বিশ্বাসে কলেজের গল্প করে সে দেখেছে, মা ঠাকুমা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পাড়ার কোন ছেলে সাইকেলে অনুসরণ করেছিল তা না জানতে চেয়ে ওর মা পরের দিন ট্রাম স্টপেজে পৌঁছে দিয়েছেন। দুদিন এভাবে আড়াল করার পর যখন কোন ঘটনা ঘটলনা তখন তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এরপর সুজাতা জেনে গেল কোন কথা বাড়িতে বলতে হবে, কোনটে নয়। জীবনে প্রথম কথা লুকানো বা আড়াল করার অভ্যেস তৈরী হল। আর এতে কোন অপরাধবোধ তার মধ্যে এল না।

মোটামুটি এইভাবেই সে বি.এস-সি. পাশ করল। মেয়ের বাইশ বছর বয়স হওয়াতে ঠাকুমার তাড়নায় তার বাবা বিয়ের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। সুজাতা আর কলেজে পড়ুক, এটা আর কেউ চাইছিল না।

মেয়ে যতই বিদ্বান হোক, তাকে শেষ পর্যন্ত সংসার করতেই হবে, স্বামীর হেঁসেল সামলাতে হবে— এমন কথা অহরহ শুনতে হল। সুজাতা প্রথম প্রতিবাদ করল, সে এম. এস-সি. পড়বে। তার বাব দোটানায় পড়লেন। মা ঠাকুমার প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও সে এম.এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হল। বাড়িতে তখন অশান্তি চলছে।

এইসময় ঠাকুমার এক আত্মীয় সুজাতার জন্যে সম্বন্ধ আনলেন। ছেলে ব্যাঙ্কে কাজ করে। সবার চাপে বাধ্য হয়ে তাকে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে হল। কয়েকটা কথাবার্তার পর সে যখন উঠে এল তখন পাত্রপক্ষ জানল, মেয়ে নিতান্তই সাদামাটা, এম. এস-সি. পড়ছে বলে একটু আগ্রহ হয়েছে।

কিন্তু তাদের সমানে অনেক খরচ, অতএব সেই খরচ কতটা সুজাতার বাবা মিটিয়ে দিতে পারেন, তার ওপর বিয়ে নির্ভর করছে। যে-কোন-বাঙালী মেয়ের বাবাই জানেন, তাঁকে এরকম অনুরোধের মুখোমুখি হতেই হবে। অনুরোধের আড়ালে যে হুমকি কাজ করে তা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁরই।

সুজাতার বাবা বরপক্ষের দাবী পূরণ করতে পারলেন না বলে বিয়ে ভেঙে গেলে সবচেয়ে স্বস্তি পেল সুজাতাই।

এখানে একটু অন্যকথা বলা যাব। এই লেখা যে সমস্ত বিবাহিতা পাঠিকা পড়ছেন তাঁদের নিয়েই। তাঁদের বিবাহপর্ব তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ কোনরকম পণ চাননি, আপনার বাবা যেরকমভাবে পেরেছেন সাজিয়ে দিয়েছেন।

দুই, পাত্রপক্ষ চেয়েছিলেন এবং আপনার বাবার সামর্থ্য ছিল তা পূর্ণ করার। এবং তা করতে তিনি পরিবারের আর কাউকে বঞ্চিত করেননি। কোনরকম চাপ পড়েনি, তার ওপর, রাতে ঠিকঠাক ঘুমাতে পেরেছিলেন। এই দুই শ্রেণীর বিবাহিতা মহিলারা আমাদের আলোচ্য নন।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন তাঁরাই যাঁদের বিয়ে করতে পাত্রপক্ষ এমন দাবী করেছিলেন যে কন্যাপক্ষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল।

মেয়ের বয়স হচ্ছে এবং পাত্রটি ভাল চাকরি করে শুধু এই কারণে মেয়ের বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার, গহনা বিক্রী ইত্যাদি থেকে অর্থসংগ্রহ করার পর রাত্রের ঘুম হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাড়িতে কালো ছায়া নেমে এসেছিল। পাত্রীর যদি কোন বোন থাকে তবে তার কি ব্যবস্থা হবে এ নিয়ে ভাবতেও সাহস পায় নি কেউ!

পাত্রপক্ষকে কসাই, ডাকাত বলে মনে হয়েছিল সবার। তবু, নিতান্ত বাধ্য হয়েই, বিয়ের রাত্রে আলো জ্বেলে সানাই বাজিয়ে (রেকর্ড হলেও) পাত্রকে বরণ করা হয়েছিল। পাত্রীর বন্ধুরা হৈ-হৈ করেছেন তাকে ঘিরে। মালাবদলের সময় যখন পাত্রী তাকিয়ে ছিলেন পাত্রের দিকে, তখন কি তিনি নায়ক দেখেছেন, না ভেবেছিলেন একজন ভিলেন দাঁড়িয়ে আছে যে তার পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এক পাঠিকা আমায় যে চিঠি লিখেছিলেন মাস চারেক আগে, সেটি তুলে দিই:

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমি আপনার একজন সাধারণ পাঠিকা। বই কেনার সামর্থ্য নেই, লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত আনিয়ে পড়ি। আপনার সমস্ত বই আমি পড়েছি এবং কোনটি দুবারও। আমার মনে হয়েছে আপনাকে আমার সমস্যা বলা যেতে পারে কারণ আপনার লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

আমি বাংলাদেশের আটপৌরে মেয়ে। তেমন কোন গুণ অথবা রূপ ঈশ্বর আমাকে দেননি। বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি. তে ভর্তি হয়েছিলাম নিজের চেষ্টায়।

আমার বাবার অবস্থা খুবই সাধারণ। যা সম্বন্ধ আসতো তা নিয়ে কথা বেশী এগোত না। পাত্রপক্ষের দাবী এত বেশী থাকত যে, বাবা থমকে যেতেন। আর আমি ভাবতাম এত ছেলে প্রগতির কথা বলে, আমার সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেই এত উদারতা দেখায় সব ব্যাপারে, তাহলে সেইসব ছেলের একজন কেন আমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বাবাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না ? আমি মায়ের মাধ্যমে বাবাকে অনেকবার বলেছিলাম যে তিনি যেন আমার বিয়ের চেষ্টা ছেড়ে দেন, আমি চাকরি করে বেঁচে থাকব কিন্তু তাদের ধারণা বাঙালী মেয়ের ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ির হেঁসেলই নির্দিষ্ট।

শেষ পর্যন্ত বাবা মরীয়া হয়ে একজন শুল্ক বিভাগের অফিসারের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির করলেন। তিনি কোন দাবী করেননি। শুধু আমার বউভাত বাবদ আটশো লোক যে খাবেন, সে খাওয়ার খরচটা বাবাকে দিতে হবে অগ্রিম।

এক বিখ্যাত ক্যাটারার কোম্পানিকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। প্রতি প্লেট পঞ্চাশ টাকা হিসেবে দেখা গেল চল্লিশ হাজার টাকা। প্রায় নেই নেই করেও দেখা গেল আমাকে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে বাবার পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় হবে। তিনি যেখান থেকে পারলেন ধার করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা কাবুলিওয়ালার কাছেও।

শুভদৃষ্টির সময় আমি তাকাতে পারছিলাম না। রাগ ঘেন্না যদি সময়মত প্রকাশ না করা যায়, তাহলে শরীরে এক ধরনের ক্লেদ জমে, যা উৎসাহ কেড়ে নেয়। সবাই বলল, মেয়ে এত লাজুক যে চোখ তুলছে না। মালাবদল করলাম অসাড় হাতে। বাসরে সারাক্ষণ মুখ নিচু করে বসেছিলাম। তার সঙ্গে কথা হয়নি।

পরদিন শ্বশুরবাড়িতে এসে আদরের ঘটা দেখে মন পুড়ে যাচ্ছিল। ফুলশয্যার রাত্রে তিনি যখন তাঁর সম্পত্তির দখল নিতে এলেন, তখন তাঁকে চেঙ্গিজ খাঁ জাতীয় এক ভিলেন ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনি। কোন অপরাধবোধ নেই তাঁর। কি মিষ্টি মিষ্টি রোমান্টিক কথা।

আমাকে নিয়ে বন্ধুমহলে ঘুরে বেড়ানো, রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কি আগ্রহ। ভিলেনের সঙ্গে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেয় আমি যে তার বেশী কিছু পাচ্ছি না। তারপর আরও চমক। অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়িতে গিয়ে দেখি সবাই ওকে নিয়ে এমন হৈ-চৈ করছে

যেন সে নায়ক, সবাই ভুলে গিয়েছে অথবা উপেক্ষা করছে সংসারের ওপর যে কালো মেঘ ঝুলছে তাকে আর তিনিও এত প্রফুল্ল হয়ে ঘরের ছেলে হবার চেষ্টা করছেন যে আমার মনে হল, সবাই ভাল অভিনয় করতে পারে।

এখন আপনি বলুন, কি করলে আমি বাকী জীবন এই লোকটিকে মনে মনে বহন করব?

হ্যাঁ, পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিবাহিতা হয়েছেন তাঁরাও কি এই স্বামীদেবতাটিকে ভিলেন মনে করেন? না, বাবার চাপে পড়ে রাজী হয়েছি আমার ইচ্ছে ছিল না, কি করব অত বড় খবর একা টানতে পারছিলাম না, এসব যুক্তি এখানে অচল। যে স্বামী দেবতাটির সোহাগে রাত মাধবী হয় তাঁরই পরোক্ষ চাপে আপনার বাপের বাড়ির মানুষ আর মাছ পর্যন্ত খেতে পারছেন না, এটা ভাবলে আপনি তাঁকে নায়কের মর্যাদা দিতে পারতেন?

আমি বুঝিনা, মানিয়ে নিতে যখন হবেই তখন আর এ নিয়ে কথা তুলে কি লাভ এই যুক্তি দেখিয়ে বঙ্গললনারা ভিলেনকে নায়ক ভেবে কি সুন্দর জীবন কাটিয়ে যান! কেউ কি বাধ্য করতে পারেন না ওই স্বামীদেবতাটিকে যাতে তিনি যতটা সম্ভব যে টাকা শ্বশুরবাড়ি থেকে আদায় করেছেন, তা একটু একটু করে ফিরিয়ে দেন। এক বছরে না হোক, দুই বা তিন বছরে।

আবার গল্পে ফিরে আসা যাক। জীবনের নায়ক কখনও কখনও নয় প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিলেন হয়ে যান অধিকাংশ বাঙালী মেয়ের জীবনে, তা এই চিঠিই প্রমাণ। আর প্রমাণ আছে আপনাদের মনের খাঁজে খাঁজে।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন, ওই চিঠির সঙ্গে সুজাতার জীবনের কিছুটা মিল রয়েছে। সুজাতা এম. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হল। মিল ওই পর্যন্তই। সুজাতা তার মায়ের মাধ্যমে নয়, সরাসরি বাবাকে বলেছিল যদি তার বিয়েতে একটা পয়সাও ধার করতে হয় তাহলে সে বিয়ে করবে না। সে দেখতে চায় না তার পরিবার আত্মহত্যা করছে। এরকম অবস্থা সৃষ্টি হলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সুজাতার বাবা খুব দুঃখ পেলেন, ঠাকুমা কান্নাকাটি করলেন, মা নির্বাক আর দাদা আড়ালে ওকে বাহবা দিল। একটা বড় রকমের ধাক্কা থেকে যখন পরিবারটি বাঁচল তখন সুজাতা প্রেমে পড়ল। যাঁরা বলেন শরীরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নেই, প্রেম আসে মনের আকুতি থেকে, তাঁরা মুখের স্বর্গে বাস করেন। আট বছরের মেয়ের মনে কোন ভাঁজ থাকে না। তার ডানপিটে হয়ে উঠতেও কোন বাধা নেই।

আশি বছরের কোন বৃদ্ধার লাজ লজ্জা সংকোচ অথবা প্রেমের প্রতি আকর্ষণ কি পর্যায়ে সাধারণত থাকে, তাও সবার জানা। কিন্তু বারো তের বছর বয়সে শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার প্রবণতা থেকেই ধীরে ধীরে মেয়েদের মনে তাদের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। যত কুশ্রী সেই মেয়ে হোক না কেন, যৌবন এলে সে অন্য পুরুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবেই।

একই ব্যাপার ছেলেদের শরীর এবং মনের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

সুজাতার শরীরের পরিবর্তন সে পারিপার্শ্বিক, রক্ষণশীল আবহাওয়ার চাপে উপেক্ষা করেছিল কিন্তু একদা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি থেকে বের হবার সময় গৌতমের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লাগার পর সব গলে গেল। ব্যস্ত হয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সরি! খুব লেগেছে। আমি আপনাকে একদম দেখতে পাইনি। দেখি কপালটা, দেখি!'

কপালে হাত দিয়ে সুজাতা বলেছিল, 'না, কিছু নয়!'

'কিছু নয় কি! এরই মধ্যে লাল হয়ে গিয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে।'

'থাক না। ঠিক হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু ভোগান্তি সহ্য করতে হবে। আর তখন আমি নিজেকে দোষ দেব। আসুন।' প্রায় জোর করেই তাকে নিয়ে গিয়েছিল গৌতম ফার্স্ট এইড দেওয়াতে। সেখানে একটা লাল ওষুধ তার কপালে মাখিয়ে দেওয়া হলে সুজাতা আঁতকে উঠেছিল, 'কি সর্বনাশ, এইভাবে রাস্তায় যাবো?'

ষাটের দশকের বাংলা সিনেমায় এমন কাণ্ড ঘটত। উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের প্রেম যদি এমনভাবে হয়ে থাকে তাহলে দর্শকরা খুশী হতেন। একালের দিনের লেখকরা এত সহজ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন না। ধাক্কা বা ঝগড়াঝাঁটি থেকে পরবর্তীকালে প্রেম এখন বেশ সেকেলে হয়ে গিয়েছে। অথচ সুজাতা সেই কাজটাই করে ফেলল। বান্ধবীরা যখন জিজ্ঞাসা করল, এমন হল কেন কপালে, তখন ঘটনাটা কে বলে ফেলেছিল। কোন ছেলে কেমন ছেলে ইত্যাদির খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, গৌতম ছাত্র হিসেবে ভাল, লেখালেখি করে।

আরম্ভ হল এই নিয়ে মজা করা। তার দিন তিনেক বাদে যখন করিডোরে দেখা, গৌতম এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'সুজাতা, আপনার কপাল কি রকম আছে।' ওষুধের লাল রঙ একদিনেই উঠে গিয়েছিল কিন্তু সমস্ত রক্ত যদি মুখে উঠে এসে রাঙিয়ে দেয় তাহলে বেচারা সুজাতাকে করতে পারে?

এই প্রেম-পর্বের বিস্তারে না গিয়ে আমরা খানিক এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরি। এম. এস-সি. পরীক্ষার পরে এক বিকেলে কফি হাউসের টেবিলে বসে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, তোমার লোকদের সঙ্গে কবে আলাপ করবো?

'মুস্কিল।' হেসে ফেলেছিল সুজাতা।

'কেন? আমার কোন অপরাধ?'

'না, না। আসলে ওঁরা ভাবতেই পারেন না যে তাঁদের মেয়ের কোন ছেলে বন্ধু থাকতে পারে এবং তাকে বাড়িতে আনা যায়।'

'ভুলটা ভেঙে দাও।'

'এমনিতেই যা যা ভেঙেছি তার ঠেলা সামলানো যাচ্ছে না।'

'তুমি আমাদের বাড়িতে কবে আসছো?'

'কেন ?'

'আমি মাকে তোমার কথা বলেছি।'

'কি বললেন ?'

'কিছু না। চুপ করে রইলেন।'

'কিছু বললেন না ?' অবাক হল সুজাতা।

'হয়তো ব্যাপারটা মনের মত হয়নি।'

'তাহলে ?'

'কি তাহলে ? আমরা প্রাপ্তবয়স্ক। নিজেদের জীবন নিশ্চয়ই অন্যের ইচ্ছায় চালাবো না। ওঁরা মেনে নিলে খুশী হব, না নিলে সরে আসতে হবে।'

'এতদিনের বাঁধন, এত স্নেহ ছিন্ন করবে আমার জন্যে ?'

'উপায় কি ?'

'তার চেয়ে অপেক্ষা করলে হয়না ?'

'কিসের অপেক্ষা ?'

'যদি ওরা, তোমার আর আমার বাড়ির মানুষরা, মত পাল্টান।'

'কতদ্দিন অপেক্ষা করবে ?'

'যতদিন পারা যায়।'

'পাগল ?'

'কেন ?'

'আমি সময়টাকে চলে যেতে দিতে রাজী নই।'

'কিন্তু তুমি আর আমি কেউই চাকরী করি না।'

'হ্যাঁ, তদ্দিন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব।'

এর পরের পর্ব আরও দু' বছর চলে গেলে মেনে নিল সবাই। রক্ষণশীল মানসিকতা যতই প্রবল হোক, অর্থের সঙ্গতি কমে গেলে মানুষকে শেষপর্যন্ত মাথা নোয়াতেই হয়। এবং মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে জানে, একটা বড় দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। আর গৌতম যেহেতু ছেলে হিসেবে খারাপ নয়, ভাল চাকরি পেয়েছে বড় ফার্মে, তাই প্রশ্ন ওঠে না ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার। সুজাতাও একটি কলেজে চাকরি পেয়ে গিয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা গৌতম আর সুজাতা ঠিক করেছে যে, তারা টোপর পরে মন্ত্র আওড়ে বিয়ে করবে না। বউভাত এবং বিয়ের কারণে দুটো খাওয়ানোর বদলে একটি গেট টুগেদার করবে। বিয়ে হবে রেজিস্ট্রী করে। এক পয়সাও খরচ করতে হল না সুজাতার বাবাকে। শুধু গৌতমের মায়ের মুখ ভার হয়ে রইল। ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকবে যখন তখন তিনি আর এই নিয়ে তর্ক করতে চান নি।

নতুন ফ্ল্যাটে খুব ভাল আছে ওরা। এখন নায়ক নায়িকা হিসেবেই ওদের ভাবা যায়। যে যার কাজ ঠিকঠাক করেও সকাল আর সন্ধ্যে রাত একসঙ্গে উপভোগ

করে। নিজেদের সংসার সামলেও সুজাতা বাবাকে সাহায্য করে। গৌতমেরও নিজের মা বাবার কর্তব্য-পালনে কোন ত্রুটি নেই। যাকে বলে সুখের সংসার, এখন ওদের তাই।

এভাবে সংলাপ শেষ হলে বিধাতার কিছুই করার থাকে না। সেই আদিম যুগে আদম আর ঈভের সুখী ভাব দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি তৈরী করেছিলেন শয়তানকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় শয়তান নয়, ঈশ্বরই পৃথিবীর প্রথম ভিলেন এবং শেষ নায়ক। অতএব সুজাতা আর গৌতমের সুখী সংসার ঈশ্বর বেঁচে থাকা পর্যন্ত ওইভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। সেইখানেও ভাঙন আসবে, সেখানেও সন্দেহ দেখা দেবে। পরস্পরের মধ্যে ফাটল এতদূর চলে যাবে যে, সান্নিধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।

পাঠক বুঝতেই পারছেন, সুজাতার ওপর গল্পকারের জোরালো টান আছে। আর সেই কারণেই সুজাতা কোন অন্যায় করতে পারে এমন কিছু দেখানো সম্ভব নয়, বরং সবাই ওর ওপর অত্যাচার করছে, ওকে প্রতারণা করছে এমনভাবে গল্প তৈরী করার একটা চেষ্টা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। বাস্তবে পরের সোনার সংসার ভেঙে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু তাতে সুজাতার নিজস্ব কিছু দায়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। কিন্তু সে যদি রক্তমাংসের মানুষ হয়, তাহলে হ্যাঁ একহাতে তালি বাজে না।

সম্পর্ক ভাল যতক্ষণ ততক্ষণ ছেলেরা বেশ ভাল। কিন্তু কোন কারণে তাদের অভিমান বা পৌরুষে ঘা লাগলে এবং সেটা অকারণে হলেও, তারা খারাপ হতে আরম্ভ করে এবং সেই খারাপ হওয়াটা কোন পর্যায়ে চলে যায়, তা তারা আন্দাজ করতে পারে না। সুজাতার স্বামীর ক্ষেত্রে এইটে হয়েছিল। সুজাতা যে প্রথমেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার কথা ভাবেনি, সেটাও সত্যি। অতএব ওর স্বামী শেষ পর্যন্ত ভিলেন হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব, সংসাব ভেঙে যাওয়ায়, স্ত্রী বাকী জীবন কষ্টে থাকা নিয়ে অজস্র গল্প বাংলায় লেখা হয়েছে। অতএব এই সুজাতার বাকী ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই আন্দাজ করা সম্ভব। অতএব বিস্তারিত বলা যাক।

ভিলেন কত রকমের হয়, এই নিয়ে এক আড্ডায় তর্ক উঠেছিল। জনা সাতেক মানুষ নানাভাবে নিজের মত দিয়ে গেলেন। সবাই বোঝাতে চাইলেন ভিলেন সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য বলছেন, সেটাই ঠিক। শুধু একজন কোন কথা না বলে শুনে যাচ্ছিলেন। তর্ক প্রায় ঝগড়ায় পৌঁছালো, অবশ্য বাঙালীরা যখন তর্ক করে, তখন সেটা ঝগড়া কিনা বোঝা মুস্কিল হয়। প্রত্যেকেই নিজের মত চাপাতে চাইছে। নিশ্চুপ লোকটি কাগজে কিছু লিখল। তারপর সেটা একটা পেপার ওয়েটের তলায় চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল। উত্তপ্ত পরিবেশ হঠাৎ থমকে গেল ওই লোকটি চলে যাওয়ায়। পিছু ডাকেও যখন সে সাড়া দিল না তখন একজন কাগজটা দেখতে পেল। কাগজে লেখা আছে, তোমরা যখন চিৎকার করে বোঝাতে চাইছিলে তখন আমি তোমাদের

মুখের বদলে নেকড়ে হায়েনা বাঘের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে তোমরাই ভিলেন। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। একটু যেন অস্বস্তি। কথায় পুরোনো সুর ফিরে এল না। একসময়ে আড্ডা ভেঙে গেল। যে যার বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিল, আড্ডায় শরিক হয়েও তাতে অংশ না নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে ওইভাবে লিখে নিঃশব্দে চলে যাওয়া মানে ও নিজেকে আলাদা প্রমাণ করতে চাইছে। যেন ঈশ্বরের মত জ্ঞান দিয়ে গেল। ঈশ্বর না ছাই। ওই ব্যাটাই একটা আস্ত ভিলেন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। এরকম ভাবনা ভাবতে পেরে সবাই বেশ খুশী হল।

আমি একজন ভিলেনকে জানতাম। ভদ্রলোক উত্তর কলকাতার খুব বনেদী বাড়ির কর্তা। পূর্বপুরুষের সম্পত্তির পরিমাণ এত যে, তাঁকে কোনদিনই চাকরি করতে হয়নি। গড়গড়া খেয়েছেন, ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাবু সেজেছেন, ফূর্তি করেছেন মনের মত কিন্তু টাকা উড়িয়ে দেননি অন্যদের মত। এরকম এক ভদ্রলোক যিনি অত্যন্ত দাপট নিয়ে সংসারে থাকেন, তাঁকে সবাই ভয় করে। ওঁর ছেলে এম. এ. পড়তে পড়তে একটি সাধারণ মেয়েকে ভালবেসে ফেলে গোঁ ধরল বিয়ে করার। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। কিছুতেই ওই বিয়ে হতে দেবেন না। দরকার হলে ত্যাজ্য-পুত্র করবেন। কিছুদিন এরকম চলার পর বাড়িতে গুরুদেব এলেন। গুরুদেবকে খুব ভক্তি করেন তিনি। গুরুদেবের আদেশে ওই বিয়ে মেনে নিলেন ভদ্রলোক। বিয়ের পর আমার সঙ্গে কয়েকবার তাঁর কথা হয়েছে। প্রায়ই বলতেন, আমদের ঘরানার মেয়ে নয়, এবার সংসার খাক হয়ে যাবে।

এরকম একটি মেয়ে সংসারে এলে সে খুব গ্রহণীয় হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ির কুনজরে থাকায় তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েটিকে সারাদিন কেউ বিরক্ত করত না। তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল ওই পরিবারের নিয়মগুলো। কি কি করতে পারবে না সেটা জেনে নিয়ে সেইমত চললে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ভদ্রলোকের বুকের জ্বালা মেটানোর পথ তিনিই বেছে নিলেন। সপ্তাহে তিনদিন বউমার ডাক পড়ত শ্বশুরের ঘরে। ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খেতে খেতে টেবিলে রাখা চাবির গোছা দেখিয়ে বলতেন, কাউকে তো বিশ্বাস করতে পারি না, দিনকাল যা হয়েছে! তুমি ঘরের বউ হয়ে এসেছ, তুমি কাজটা কর। ওই সিন্দুকটা খোল। আজ কিছু টাকা এসেছে, গুনে বল কত আছে।

সিন্দুক খুলে মাথার ঘোমটা টেনে টাকার স্তূপ নিয়ে বসল বউমা। পাঁচ দশ দুই এবং মাঝে মাঝে একশ টাকার নোট।

গুনতে গুনতে আঙুল অসাড় হল। তারপর একসময় হিসেব গুলিয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে শুরু। যখন গোনা শেষ হল তখন কাঁধ অবধি ব্যথা। বলল, দু' লক্ষ তিন হাজার দুশো পাঁচ টাকা।

'সেকি? শ্বশুরমশাই বললেন, 'দুশো পাঁচ কেন, দুশো পঁচিশ হওয়া উচিত। তুমি আবার গুনে দ্যাখো তো!'

অত খুচরো টাকা, মেয়েটি মুখগুজে আবার গুনে গেল। তার দুই আঙুল ফোসকা, চোখে জল। গোনা কোনমতে শেষ হলে সে আবার বলল, দুশো পাঁচ।

ও। ভাল। টাকা সবসময় দু' বার গুনতে হয়! যাও।

সারারাত হাত নাড়তে পারেনি মেয়েটি। স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হয়েছে হাতে? সে জবাব দিয়েছিল, টাকা গুনেছিলাম। কোনদিন অভ্যেস ছিল না, তাই ফোসকা পড়েছে, হাত ব্যথা হয়েছে।

শ্বশুর বউমাকে আপন ভেবে তাকে দিয়ে টাকা গুনিয়েছেন। কোন আদালত এই ঘটনাকে অপরাধযোগ্য বলে মনে করবে? আত্মীয়স্বজনরা শুনে চোখ বড় করেছে, ওমা অত টাকা বিশ্বাস করে গোনাল? কি ভালবাসে গো!

আর যে গুনল— যার হাত অসাড় হল, সে জানল, অত্যাচারিতা হওয়া কাকে বলে?

তার ফোসকা যে ওই ভদ্রলোকের জ্বালা থেকে একথা ক'জন বিশ্বাস করবে? এইরকম ভিলেনকে কোন স্তর রাখা যায়, তা পাঠক বিচার করুন।

এই লেখার প্রথম লাইনে একটি প্রশ্ন ছিল। যে কেউ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের যে-কোন আচরণের ফাঁকে আমরা যে সবাই মাঝে মাঝে এক দুর্দান্ত ভিলেন হয়ে উঠি, তা কে অস্বীকার করবে?

বাসে উঠতে যাচ্ছেন, বেজায় ভিড়, কেউ জায়গা দিচ্ছে না, ঠেলে ঠুলে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডেল ধরতে গিয়ে হাতের ফাঁক পাচ্ছেন না। একটু ঠেলাঠেলি হতেই সামনের ভদ্রলোক ঈষৎ চাপ দিলেন আপনার ওপর। আপনি ব্যালেন্স হারাতে হারাতে নিজেকে সামলে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণে আপনার মাথায় রক্ত চড়েছে। লোকটা বিনা দোষে আপনাকে ধাক্কা মেরেছে, এটা সহ্য করতে চাইলেন না। অতএব বাস ব্রেক কষা মাত্র সবাই যখন টালমাটাল, আপনি শরীরটা এমনভাবে ওই ভদ্রলোকের ওপর ছেড়ে দিলেন যাতে, তিনি থামলেন না। দেখে নেব টেখে নেব ইত্যাদি হবার পরে সবাই মিলে আপনাদের থামাল। আপনারা পরস্পরের কাছে তখন রীতিমত ভিলেন হয়ে গেছেন।

আপনার ছেলের তিনদিনের জ্বর কমছে না। ভাল ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখলেন জনা পনের রুগী সেখানে টিকিট করিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনার নম্বর হবে ষোল। সবাই খুব অধৈর্য। ডাক্তারবাবু নাকি প্রচুর সময় নিচ্ছেন একজনকে দেখতে। এবং একসময় এই বিরক্তি আপনার মধ্যেও এল। যে ঢুকছে সে আর বের হচ্ছে না। এইসময় এক ভদ্রলোক ঢুকে পিওনকে জিজ্ঞাসা করল, 'সুহাস আছে?'

পিওন বলল, 'হ্যাঁ। স্যার রুগী দেখছেন।'

ভদ্রলোক চারপাশে তাকাতেই আপনাকে দেখতে পেলেন, 'আরে, আপনি এখানে? চিনতে পারছেন?' আপনি পেরেছেন? একটু এড়ানো হাসি হেসে বলতে চাইলেন, হ্যাঁ। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'সেই যে আমার সেলস্ ট্যাক্সের প্রব্লেমটা

আপনি, মনে আছে?' আপনি আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। অফিসের ব্যাপারটা অফিসেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। কে জানত এখানে এলে এঁর সঙ্গে দেখা হবে! ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে?'

'ছেলে?'

'ও। কি হয়েছে?'

'জ্বর। কমছে না কিছুতেই।' আপনি মিনমিন গলায় বললেন।

'ওঃ। একে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন? আসুন আমার সঙ্গে। এসো খোকা।'

আমার ছেলের হাত ধরে তিনি চললেন চেম্বারের ভেতরে, 'সুহাস আমার বাল্য বন্ধু।'

আপনার আগে এসে যাঁরা এতক্ষণ প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁদের মনের অবস্থা ভাবুন। সবাই পারলে আপনাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে। ওই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে আপনাকেও প্রচুর গালাগাল খেতে হচ্ছে। মনে মনে আপনি ওদের কাছে একটি আস্ত ভিলেন হয়ে গিয়েছেন।

তা সুযোগ-সুবিধে বাঁকাপথে পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ এত বেশী যে, এইসব ক্ষেত্রে ভিলেন হতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বুনো রামনাথরা এ যুগে অচল।

কিন্তু এইসব ঘরোয়া ভিলেনী, যাতে আমাদের নিজেদের ছবি বড্ড স্পষ্ট, এত ব্যাপক ঘটে যাচ্ছে আজকাল যে, তা নিয়ে আলোচনায় খুব রহস্য নেই।

মহিলার নাম ছিল আলোরানী দাস।

নিবাস যাদবপুরের এক কলোনী। তার পড়াশুনা থ্রি পর্যন্ত। বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বাবা-কাকারা ভাসতে ভাসতে যাদবপুরে এসে ঠেকেছিলেন, কিন্তু আর গুছিয়ে উঠতে পারেননি। বাবা মারা গেলে দাদার ওপর চাপ পড়ল। তখন ষোল বছর বয়স আলোরানীর। পারিবারিক অব্যবস্থা তাকে অশিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে রূপ দিয়েছেন উজাড় করে। কলোনির মানুষ একটি ডানপিটে সুন্দরীকে দেখত অবাক চোখে। কিন্তু সেই বয়সেই আলোরানী বুঝে গিয়েছিল আর পাঁচটা মেয়ের থেকে সে একদম আলাদা, অন্তত পুরুষদের চোখে। আর এই বোঝাটা তাকে শেখালো কি করে নিজের জন্যে সুবিধে আদায় করা যায়। বিনা পয়সায় সিনেমা দ্যাখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া থেকে আরম্ভ করে টুকিটাকি উপহার সে পেতে শুরু করল পাড়ার দাদাদের কাছ থেকে। কিন্তু তার একটা ভাবনা স্থির হয়ে গিয়েছিল কত দূর সে দাতাদের এগোতে দেবে। কিশোরী-কিশোরী ডানপিটে ভাবটা এই ব্যাপারে সাহায্য করত।

একদিন দুই বন্ধুর সঙ্গে সে গিয়েছিল টালিগঞ্জে। বন্ধুদের পরিচিত একজন সিনেমায় কাজ করে। উত্তমকুমারের শুটিং ছিল সেদিন। তাকে দূর থেকে দেখতে পাবে ওরা সেই সুবাদে।

টালিগঞ্জে যে এত স্টুডিও আছে তাই ওরা জানত না। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে যখন তিনজন ঘুরপাক খাচ্ছে তখন বিখ্যাত পরিচালক স্বপন মজুমদার স্টুডিওর অফিসে এলেন গাড়িতে চেপে। স্বপনবাবু পর পর দুটো হিট ছবি করে প্রযোজকদের চোখের মণি হয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর নজর পড়ল আলোরানীর ওপর। তার মুখে ঘাম, চুল এলোমেলো কিন্তু একটা ডানপিটে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। স্বপনবাবুর পরের ছবির জন্যে নায়িকা খোঁজ হচ্ছিল, যার বয়স পনেরো-ষোল মধ্যে। তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না। লোক দিয়ে অফিসে ডাকিয়ে পাঠিয়ে আলোরানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে সিনেমার অভিনয় করতে চায় কিনা। আলোরানী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। সেই ভঙ্গী দেখে পরিচালকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পারবে তো ?'

'কেন পারব না ? কি এমন হাতি ঘোড়া !'

এই কথা শুনে আরও পছন্দ হল স্বপনবাবুর। তাঁর ছবির চরিত্রটি এমনই ডাকাবুকো। তিনি আর দেরি করলেন না। সহকারীকে ওদের সঙ্গে কলোনিতে পাঠিয়ে দিলেন অভিভাবকের অনুমতি চাইতে। অনুমতি মিলল সহজেই। কিন্তু স্বপনবাবু রোজ সকালে গাড়ি পাঠিয়ে নিজের বাড়িতে আলোরানীকে আনিয়ে রিহার্সাল দেওয়াতেন। সকালে এসে দুপরের খাওয়া সেরে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে যেত আলোরানী। হঠাৎ একটি সম্পন্ন পরিবারের মানুষদের সংস্পর্শে এসে তার চালচলন পাল্টে গেল কিছুটা। প্রথম অভিনয় করে সে তিন হাজার টাকা পেয়েছিল, যা কলোনির জীবন স্বপ্ন। ছবি রিলিজ করলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। স্বপনবাবু আলোরানীর নাম পাল্টে করেছিলেন তৃষ্ণা। দর্শকদের মুখে মুখে তৃষ্ণার নাম ঘুরতে লাগল। যেমন কথা বলার ধরন, তেমন চাহনি, তেমনই হাসি, সেই সঙ্গে কি আলো করা রূপ। কলোনির গলিতে প্রোডিউসারদের গাড়ি আটকে যাচ্ছে। সবাই তাকে নিয়ে ছবি করতে চান। কেউ কেউ বোঝালেন, এইরকম অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নয়। এত লোক, এত প্রশংসা রাস্তায় বের হলেই ভিড়, শুধু আলোরানী ওরফে তৃষ্ণার মাথা ঘুরে গেল না, তার দাদাও স্বপ্ন দেখল। চারটে ছবির অগ্রিম পাওয়া টাকায় ওরা ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে এল নিউ আলিপুরে। এই সময় একদিন এলেন বিশ্বজিৎ লামা। ছবির জগতে প্রযোজক হিসেবে এসেই তিনি প্রায় এক নম্বরে উঠে পড়েছেন। তিনি আলোরানীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন। এত রূপ যেন জীবনে দ্যাখেননি। শুধু পরিচর্যার দরকার। দুটো ছবি তৈরী করতে যাচ্ছেন, তৃষ্ণাকে নায়িকা করবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু তৃষ্ণা আগামী দু' বছরে অন্য কোন ছবি করতে পারবে না। এই শর্ত। যে চারটে ছবি ইতিমধ্যে সই করে ফেলা হয়েছে সেগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই। লামা যে টাকার কথা বললেন তাতে চোখ কপালে উঠল ওদের। আলোরানীর দাদা সাগ্রহে বোনের হয়ে সই করে দিলেন। সই সাবুদ হয়ে গেলে লামা বললেন, 'এখানে থাকলে চলবে না। গুরুসদয় রোডে আমার পনেরো শ

স্কোয়ার ফিটের খালি ফ্ল্যাট আছে। তৃষ্ণা সেখানে থাকবে। কারণ তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।'

একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা আলোরানীকে ইংরেজি বলার, বিদেশী নাচ শেখানোর দায়িত্ব নিল। একজন মহিলা এলেন ভারতীয় নৃত্য শেখাতে। একজন এলেন আদবকায়দা অথবা সহবৎ শেখাতে। লামা নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে আলোরানীর দাদাকে রেখে দিলেন। রোজ সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনি গুরুসদয় রোডের ফ্ল্যাটে এসে তৃষ্ণার সঙ্গ উপভোগ করতেন। তিরিশ বছরের বড় একটি পুরুষকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি উজাড় করে দিল আলোরানী শুধু হৃদয় ছাড়া। এই বস্তুটির আবিষ্কার লামা করতে চাননি তাই দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। বাইরের প্রযোজকদের চারটে ছবিতে কাজ করার সময় আলোরানীর দাদা সঙ্গে থাকে। নতুন সব প্রযোজকদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লামা আলোরানীতে মুগ্ধ। শিখতে শিখতে যখন অনেক শিখে ফেলল, আলোরানী তখন সিগারেট খেতে শুরু করেছে। ইন্ডাস্ট্রির লোক জেনে গেছে, তৃষ্ণার একমাত্র বাবু লামা সাহেব। ছটি ছবি রিলিজ করার পর দেখা গেল, তিনটি সুপারহিট, বাকি তিনটে মোটামুটি। কলকাতা দিল্লী বম্বেতে লামার অনেক ব্যবসা। হঠাৎ সেখানে টান পড়তে লামার ফিল্ম ব্যবসায়ে মন্দা এল। এই সুযোগে আলোরানী আরও ছটা ছবিতে সই করল। এখন তার কথা বলার কায়দা, হাঁটাচলা একদম পাল্টে গিয়েছে। তরুণ নায়ক শরণজিতের সঙ্গে তার খুব দহরম। লোকে যখন ওদের নিয়ে গল্প বানাতে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল তৃষ্ণা অনীশ দত্তের সঙ্গে ঘুরছে। অনীশ বাংলা ফিল্মের দু' নম্বর হিরো। এই নিয়ে একদিন লামার সঙ্গে তৃষ্ণার প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেল। তখনও সে গুরুসদয় রোডে লামার ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে এক দুপুরে লামা তাকে আর অনীশ দত্তকে এক বিছানায় আবিষ্কার করেছিল। অনীশ কেটে পড়েছিল কিন্তু তৃষ্ণার হাতে গলায় কালসিটে পড়ে গিয়েছিল। আর তার কিছুদিন বাদেই অনীশ একটি সাধারণ বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করল। একবার গায়ে হাত তোলার পর লামা দেখলেন তার অবস্থার পতন হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে আসেন যান কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। তৃষ্ণা যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে বাড়িতে বসেই আড্ডা মারছে। এই নিয়ে ঝামেলা হলেও তৃষ্ণা ফ্ল্যাট ছেড়ে যাচ্ছে না। লামা আবার নিজের স্বার্থেই ভাব করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন বয়স এখানে ব্যবধান তৈরী করছে।

অনীশ দত্তের বিয়ের পর তৃষ্ণা মরীয়া হল। এরপর কাগজে প্রায়ই বেরুতে লাগল, অমুক অভিনেতার সঙ্গে তৃষ্ণাকে দেখা যাচ্ছে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। তৃষ্ণা কি বিয়ে করছেন? নানারকম গুঞ্জন যত ছড়াতে লাগল তৃষ্ণার কাজ তত বাড়তে লাগল। প্রায় তিনটে শিফটে কাজ করতে করতে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গুঞ্জন রটে গেল তৃষ্ণা সন্তানসম্ভবা। প্রযোজকরা শঙ্কিত

হল। অবিবাহিতা নায়িকা যদি সন্তানসম্ভবা হন তাহলে বাঙালী দর্শক তার প্রতি কিছুতেই সহানুভূতি দেখাবে না। প্রায় মাস দুয়েক ভোগার পর যখন তৃষ্ণা সুস্থ হল, তখন অনেক প্রযোজক সময় নষ্ট হচ্ছে, এই অজুহাতে ছবির কন্ট্রাক্ট বাতিল করেছেন। অসুস্থতার পর তৃষ্ণার শরীরে এক ধরনের রুক্ষতা এসে গেল। তার ঢল ঢল লাবণ্য আর রইল না। অত্যাচার, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ধকলে শরীরে ছাপ পড়ল। যেসব ছবি অর্ধসমাপ্ত ছিল, সেগুলো শেষ করার পর বাজারদর কমিয়েও আগের মত নতুন ছবি পাচ্ছিল না তৃষ্ণা। এই সময় তার সঙ্গে শাওনরাম গুপ্তার সঙ্গে আলাপ হল। শাওনরামজী বোম্বাই ফিল্মের নামকরা মানুষ। লামাই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। প্রথম আলাপেই শাওনরাম মুগ্ধ।

সাতদিনের মধ্যে বোম্বে উড়ে গেল তৃষ্ণা। শাওনরামের বান্দ্রার ফ্ল্যাটে উঠল। হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন তৃষ্ণা এমন খবর ছাপা হল। পর পর তিনটি ছবি। ওগুলো মুক্তি পেল দু' বছরের মধ্যে। এর মধ্যে কয়েকবার কলকাতা-বোম্বে করেছে সে। ছবি তিনটি যখন মুক্তি পেল তখন আর হাতে কোন বাংলা ছবি নেই। প্রথম ছবিতে সে নায়কের বোন সেজেছিল। তার উচ্চারণে জড়তা আবিষ্কার করেছিল দর্শকরা। নানা কারণে ছবি চলল না। পরের ছবিতে সুপারহিট নায়ক এবং ড্রিম গার্ল নায়িকা সত্ত্বেও তৃষ্ণা চোখ টানল। সে করল ভ্যাম্পের চরিত্র এবং উচ্চারণ ত্রুটিমুক্ত এবং এই প্রথম ছবির প্রয়োজনেই বোম্বের কোন ভ্যাম্পে শরীরের আশিভাগ দর্শকদের দেখাল। লাবণ্য চলে গেলেও অঙ্গসৌষ্ঠবের হানি হয়নি তার। ক্যামেরার কারসাজি, আলোর মায়ায় দর্শকরা তাকে উর্বশী ভাবলেন। ওই একটি দৃশ্য দেখার জন্যে কোন কোন দর্শক পাঁচবার দেখায় সুপারহিট হয়ে গেল ছবি। শাওনরাম লামা নন। তিনি শক্ত হাতে লাগাম ধরলেন। তৃষ্ণার বাসনা নায়িকা হবার। কিন্তু প্রযোজকরা তাকে ভ্যাম্পের চরিত্র ছাড়া ভাবতে পারছেন না। শাওনরাম বেছে বেছে চরিত্র দেন। প্রযোজকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার অধিকারও তার নেই। প্রতি শনিবার রাত্রে শাওনরাম তাকে নিয়ে পার্টিতে যান। ফিরে এসে উপভোগ করেন, সকালে ফিরে যান।

হিন্দী ছবিতে তার বাজার দেখে এবার বাংলা ছবির এক প্রযোজক এমন একটা গল্প ফাঁদলেন যাতে খলনায়িকার অনেকটা ভূমিকা রয়েছে। তার নাচ এবং লাস্য দেখাবার সুযোগ আছে। তৃষ্ণার কাছে প্রস্তাব গেল। শাওনরাম সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এখন তৃষ্ণার বাজারদর প্রতি ছবি পিছু দশ লক্ষ টাকা। বাংলা ছবিতে সে এক লক্ষও পাবে না। কিন্তু তৃষ্ণা যখন শুনল ছবিটির নায়ক অনীশ দত্ত তখন সে মরীয়া হল। শেষ পর্যন্ত জিৎ হল তৃষ্ণার। এই একটি ছবিতে কাজ করার অনুমতি পাওয়া গেল।

শাওনরামের সেক্রেটারি এল তৃষ্ণার সঙ্গে কলকাতায়। মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট। নায়িকা যখন সে হত তখনও এত টাকা পেত না। পার্ক হোটেলে স্যুট নিল সে। টালিগঞ্জে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সাংবাদিকরা ঘিরে ধরল তাকে। বিভিন্ন সিনেমার কাগজ ইন্টারভিউ ছাপল। তার সবচেয়ে রগরগে ইন্টারভিউটি হল এইরকম—

'হিন্দী ছবিতে আপনার এই জনপ্রিয়তার মূলে কি ?'

'আমার শরীর।'

'বাংলা ছবিতে আপনি নিয়মিত কাজ করেন না কেন ?'

'যোগাযোগের অভাবে।'

'আপনার জীবনের প্রথম পুরুষ কে ?'

'ভুলে গিয়েছি। পুরুষদের চেহারা তো একই হয়।'

'জীবনে কাউকে ভালবেসেছেন ?'

'হ্যাঁ, নিজেকে।'

'কোন পুরুষকে ?'

'অবশ্যই। অনীশকে। অনীশ দত্ত, যে ছবি করতে এসেছি তার নায়ককে। ওকে দেখব বলেই এই ছবি করতে এসেছি।'

'আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না ?'

'না। কিন্তু এখন আশা করি রোজই দেখা হবে।'

'মিস্টার লামার সঙ্গে সম্পর্ক কি ছিল ?'

'উনি আমাকে পায়ের তলার মাটি দিয়েছিলেন অবশ্য আমি তার দাম সুদে আসলে মিটিয়ে দিয়েছি।'

'শাওনরাম গুপ্তা সম্পর্কে বলুন ?'

'হিন্দী ছবিতে উনিই আমাকে জায়গা করে দিয়েছেন।'

'আপনি এত স্পষ্ট বলছেন কি করে ?'

'ইচ্ছে হল তাই বলছি।'

সিনেমায় যারা অভিনয় করে তাদের নব্বুই ভাগ লোকলজ্জাভয়ে মিথ্যেকথা বলে। একজন বাঙালী অভিনেত্রী আমাকে বলেছিল যে, সে ফিল্মে অভিনয় করার জন্যে পনের বছর বয়সে বাবার বয়সী এক সাহিত্যিকের সঙ্গে শুয়েছিল। তারপর সেই সময়ের তরুণ পরিচালককে সঙ্গ দিয়েছিল অনেক কাল। এখন সে মাঝারি মাপের অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে অন্তত একশটি পুরুষকে সে শরীর দিয়েছে।

অল্পদিন আগে তার একটি ছবি হিট করেছে এবং সে সাংবাদিকদের বলেছে, মনের মত মানুষ পেলে বিয়ে করব। একজনকে পেয়েছি। আমাব কুমারী জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ দিয়ে তাকে ভরিয়ে দেব। বুঝুন ব্যাপারটা। আমি এই মিথ্যে বলতে

পারি না, বলবও না।

হৈ-চৈ পড়ে গেল চারধারে ইন্টারভিউ প্রকাশিত হলে। অনীশ দত্তের স্ত্রী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। অনীশ এই ছবিতে অভিনয় করতে অস্বীকার করল। কিন্তু অনেকের প্ররোচনা সত্ত্বেও সে তৃষ্ণার বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইল না। প্রযোজক বিপাকে পড়লেও দেখলেন ওইসব কথা বলায় তৃষ্ণা খুব জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। তিনি নায়ক পরিবর্তন করতে চাইলে তৃষ্ণা বেঁকে বসল। শুধু অনীশের সঙ্গে অভিনয় করবে বলেই সে এই ছবিতে কাজ করতে রাজী হয়েছে, নইলে করবে না। ফলে ছবি বাতিল হল।

এর পরের ঘটনা আরও সংক্ষিপ্ত। হিন্দী ছবিতে সাকসেস আসে ঢেউ-এর মত। খুব অল্প অভিনেতা অভিনেত্রী তা ধরে রাখতে পারেন। তৃষ্ণাও পারে নি। সে অবশ্য আর কলকাতা ফিরে আসেনি।

বাবুবদল করতে করতে এক সময় যখন আর বাবু জুটল না তখন হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। অনীশ দত্তের পারিবারিক অশান্তি, লোকলজ্জা এত প্রবল হয়ে গেল যে বেচারা অল্পদিনেই ফিল্ম ছাড়ল। লোকে বলে, অসুস্থ স্ত্রীকে সামলাতেই তার দিন যায়। জীবনে তৃষ্ণা প্রতিশোধ নিয়ে গেল এমন করে যা ফিল্মে চিত্রনাট্যের কারণে কোন নায়ককে নিতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তৃষ্ণা কি সত্যি স্ত্রী ভিলেন? ব্যবহৃত হতে হতে প্রতিশোধ নিতে সে কি একরকম অনীশ দত্তকে বেছে নিয়েছিল? অনীশ যদি বিয়ে না করত তাহলে সে কার ওপর প্রতিশোধ নিত?

পাঠক, এই লেখার প্রথম লাইনের প্রশ্নটি, আপনি কি ভিলেন হবেন, আর উচ্চারণ করার দরকার নেই। কারণ আমরা সময় বিশেষে সবাই, ইচ্ছেয় অথবা নিজের অজান্তেই এক-এক সময় ভিলেনের ভূমিকা নেই। এবং তা ফিল্মের ভিলেনের চেয়ে অনেক সার্থক হয়।

লেখা শেষ করা মাত্র টেলিফোন বাজল। 'হ্যালো' বলা মাত্র বিমানের গলা পেলাম। বিমান আমাকে বলল, 'সমরেশদা, আমার খুব বিপদ, কি করি বুঝতে পারছি না। মাথা একদম কাজ করছে না।' ওর গলার স্বর অন্য রকম। অতএব চলে আসতে বললাম। বিমান এল। ওর সমস্যা শুনলাম।

বিমানের স্ত্রী সুনন্দাকেও আমি চিনি। বিমান আর্ট কলেজ থেকে ভাল রেজাল্ট করে বাইরে গিয়েছিল স্কলারশিপ নিয়ে। ফিরে এসে একটা নামকরা এ্যাড এজেন্সিতে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করছে। মোটা মাইনে। ওর স্ত্রী কলেজে বাংলা পড়ায়। ছেলেমেয়ে হয়নি। যাকে বলে সুখের সংসার, তাই ওদের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানা ব্যাপারে স্ত্রীর মতামত আলাদা বলে একটু-আধটু সংঘাত লাগতই। তবে সেসব ব্যাপার ওরা কখনই এমন পর্যায়ে নিয়ে যেত না, যা দৃষ্টিকটু। পার্থক্যটা মেনে নিয়েই মিলেমিশে ছিল। আমি কয়েকবার ওদের ডোভার রোডের ফ্ল্যাটে আড্ডা

মারতে গিয়েছি। দুজনেই আমার স্নেহাস্পদ। বিমানের অফিস পার্কস্ট্রীট পাড়ায় আর সুনন্দার কলেজ বালিগঞ্জে। কর্মক্ষেত্র এবং স্থান আলাদা। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দম্পতির মধ্যে মনের টান আছে বলেই মনে হত আমার। বিমানের সমস্যাটা অদ্ভুত। সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমারই একটা উপন্যাস নিয়ে দুজনের মতবিরোধ হয়। বিমানের মতে উপন্যাসটা খুবই সাধারণ, মেয়েদের সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করে লেখা অথচ সুনন্দার মনে হয়েছিল উপন্যাসটি অসাধারণ। তর্ক উঠতে সুনন্দা বলেছিল, 'তোমার রুচি ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছে।' এরপর কথা বাড়ায়নি বিমান, কিন্তু তার মন খুব তেতো হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দার সম্পর্কে অভিমান নিয়ে সে অফিসে গিয়েছিল। তার নিজস্ব ঘর। সেক্রেটারি আছে। লাঞ্চের কিছু আগে নীতা এল। নীতা সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়। একসময় বিমানকে বিয়ে করতে উন্মুখ ছিল। কিন্তু বিমান রাজী হয়নি। কারণ সুনন্দাকে সে ততদিনে ভালবেসে ফেলেছিল। নীতা এখন ফ্রিল্যান্স করে। ছবি এঁকে ভাল রোজগার করে। এসে বলল, 'তুমি যদি আমকে বিয়ে করতে তাহলে তোমার জীবনটা আমি পাল্টে দিতাম।' বিমান অন্যমনস্ক হয়েছিল। একবার মনে হয় কথাটা সত্যি হলেও হতে পারত। তখন লাঞ্চ। সেক্রেটারি খেতে গিয়েছে। নীতা বলল, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে তোমাকে জড়িয়ে ধরব, একবারের জন্য।'

বিমান আপত্তি করল, 'কি হচ্ছে কি! বোকার মত কথা বল না।'

নীতা বলল, 'আঃ, মানুষের সেন্টিমেন্টকে মূল্য দিতে পার না?' আজ ভোরে আমি এই স্বপ্নটা দেখেছি বলে এলাম। এখন লাঞ্চ, তোমার ঘরে কেউ ঢুকবে না। তুমি আমাকে যতই ছোট খারাপ ভাব, আমি একবার জড়িয়ে ধরবই।

বিমান হেসেছিল, 'তোমার মত পাগল আমি কখনও দেখিনি।' বলামাত্র নীতা দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'আঃ, কি শান্তি, স্বপ্ন সত্যি হল।' ঠিক সেই সময় দরজা খুলে গেল। ভেতরে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল সুনন্দা। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল সে। এই যাওয়াটা নীতা দ্যাখেনি কিন্তু বিমানের নজরে পড়া মাত্র সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে নীতাকে কাটিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

সুনন্দা তার অফিসে কখনই আসে না। হয়তো এদিকে কোন কাজে এসেছিল, সকালের মতান্তর মিটিয়ে দিতে পা দিয়েছিল তার অফিসে। এসে যে দৃশ্য দেখল, তাতে শুধু সুনন্দা কেন, যে-কোন মানুষ তাদের ওই অবস্থায় দেখলে একই ধারণা করবে। নীতার সঙ্গে তার কোন প্রেম নেই, নীতার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না, একথা চেঁচিয়ে বললেও পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাস করবে না, অন্তত সুনন্দা তো নয়ই। এখন সুনন্দার কাছে সে একটি অসৎ, বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু নয়। কোন কাজ করতে পারল না সেদিন বিমান। সুনন্দার প্রতি টান, তার কাছে পৌঁছবার জন্যে একটা আর্তি ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল তার। সে নতুন করে আবিষ্কার

করল, পৃথিবীতে সুনন্দা ছাড়া তার কোন আপনজন নেই। অথচ ওই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে খুঁজলেও সুনন্দাকে পাওয়ার উপায় নেই। বাড়িতে যতবার ফোন করেছে ততবার কাজের লোক ধরেছে। সুনন্দার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করতে অনেকটা সময় লাগল বিমানের। সন্ধ্যের পরে বাড়িতে ফিরে সে ধাক্কা খেল। কাজের লোক বলল, 'বউদি জিনিসপত্র নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছেন।'

সুনন্দার বাপের বাড়িতে টেলিফোন করল সে। সল্টলেকের নম্বর পেতে আজ অসুবিধে হল না। সুনন্দার মা ধরে বললেন, 'সুনন্দা খুব শক্ড। ও টেলিফোন ধরতে পারবে না। ছি ছি বিমান, তুমি এমন কাজ করলে।' 'মাসীমা, আমি যাচ্ছি, গিয়ে বুঝিয়ে বলছি।'

'না, বোঝাবার কিছু নেই। ও তো নিজের চোখে দেখে এসেছে। আর এখন তোমার আসার দরকার নেই।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তিনদিন ধরে অনেকটা চেষ্টা করেছে সে সুনন্দার দেখা পাওয়ার। সুনন্দা এই তিনদিন কলেজে যায়নি। বাড়ি থেকে বের হয়নি। এখন বিমানের প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। সব কথা শুনে আমি সুনন্দাকে তার বাপের বাড়িতে ফোন করলাম। ওর টেলিফোন ধরে আমার নাম শুনে ওকে ডেকে দিলেন। সুনন্দার গলা কানে এল, খুবই নিস্তেজ, 'বলুন, সমরেশদা।'

'শোন। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলুন।'

'টেলিফোনে না, সামনাসামনি।'

'আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন, সমরেশদা ? আমি আর পারছি না।' ওকে জানালাম, 'যাব। টেলিফোন রেখে দিয়ে বিমানকে কথা দিলাম, তার সততার কথা সুনন্দাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। একটু শান্ত হয়ে বিমান চলে গেল। পরদিন সল্টলেকে সুনন্দার বাড়িতে হাজির হলাম। মায়ের সামনে ও অনেক কান্নাকাটি করল। ওকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম।

বিমানের সততা, তার ভূমিকাহীনতা বলতে দ্বিধা করলাম না। চুপচাপ শুনে গেল সে।

তারপর ম্লান গলায় বলল, 'আমি কি করে বিশ্বাস করব, ওকে নিজের চোখে দেখলাম—!'

'কি দেখেছ ?'

'নীতা ওকে জড়িয়ে ধরেছে।'

'বিমানও কি নীতাকে জড়িয়ে ধরেছিল ?'

মাথা নাড়ল সুনন্দা, 'মনে পড়ছে না। আসলে তখন আর খুঁটিয়ে দেখার মত মন ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমি কেন অন্ধ হলাম না।'

'আমি তোমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু যদি দেখতে, ব্যাপারটায়

উদ্যোগী ছিল নীতা, বিমান নয়। সে আপত্তি করেছিল। দ্যাখো সুনন্দা, সম্পর্ক যদি হৃদয়ের হয় তাহলে তাকে বাইরের ঘটনা দিয়ে বিচার করতে নেই। অন্তত, একবারে নয়। বেশ, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। বেচারা সত্যি খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমি তোমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছি না।'

সুনন্দা কথা দিল আগামীকাল সে যেগাযোগ করবে বিমানের সঙ্গে। মন ভাল হল আমার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ভুল-বোঝাবুঝি দূর হয়, তাহলে খুশী হবার নিশ্চয়ই কারণ থাকে। ইচ্ছে করেই আমি বিমানকে জানালাম না ঘটনাটা। ওর জন্যে এটা চমক হয়ে আসুক।

পরদিন দুপুরে বিমানের অফিসে গিয়ে শুনলাম, সে ছুটি নিয়েছে। এবং সেখানেই দেখা হয়ে গেল নীতার সঙ্গে। আমার পরিচয় পেয়ে আলাপ করল। আমি বিমানের বাড়িতে যাচ্ছি শুনে সঙ্গে যেতে চাইল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি ক্ষমা না চাইলে শান্তি পাব না। দেখুন, সেদিন শুধু জেদের বশে একটা কাজ করেছিলাম—।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'জানি।'

'আপনি জানেন ? ও। কিন্তু তারপর মনে হচ্ছে, না-করলেই ভাল হত।'

সরল মনে নীতাকে নিয়ে বিমানের বাড়িতে এলাম। সে বাড়িতেই ছিল।

নীতাকে আমার সঙ্গে দেখে চমকে উঠল। নীতা বলল, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি বিমান।'

'ক্ষমা ? কেন ?'

'সেদিন ওটা করা অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। বসো তোমরা।'

আমরা বসলাম। নীতা বলল, 'আমি কারো বিয়ে ভাঙতে চাই না। যদি দরকার হয় সুনন্দার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারি।'

'আমাদের বিয়ে ভাঙছে, কে বলল ?'

'সবাই বলছে। আমার জন্যে নাকি সুনন্দা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'চমৎকার। এখবরও সবাই জেনে গেছে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি চাই না। বিশ্বাস করো, আমি চাই না।'

বিমান আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'দ্যাখো, মানুষ ভুল করেছে বুঝতে পারলে শুধরে নিতে চেষ্টা করে। সেটাই স্বাভাবিক।'

এই সময় টেলিফোন বাজল। বিমান রিসিভার তুলে কথা বলল। অফিসের কোন জরুরী কাজের বিষয়ে পরামর্শ দিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কফি খাবেন ?'

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললাম, 'হ্যাঁ, চলতে পারে।'

বিমান উঠে ভেতরের দিকে গেল, সম্ভবত কাজের লোককে নির্দেশ দিতে। আর তখনই দ্বিতীয়বার টেলিফোন বাজল।

টেলিফোনের পাশে বসে ছিল নীতা। যন্ত্রের মত তার হাত এগিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল। ব্যাপারটা আমিও প্রথমে খেয়াল করিনি। গলা পেলাম নীতার, 'হ্যালো, কাকে চাইছেন ? হ্যাঁ, ঠিক নম্বরই, কে, সুনন্দা ?'

আমি চমকে তাকালাম। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিমান। কিছুক্ষণ 'হ্যালো' 'হ্যালো' করার পর নীতা আমাদের বলল, 'মনে হল সুনন্দার গলা, নাম্বার জিজ্ঞাসা করে লাইন কেটে দিল।'

চিৎকার করে উঠল বিমান। ছুটে এসে রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাল। ওপাশে কোন শব্দ নেই। দু' হাতে মুখ ঢেকে সে বলে উঠল, 'কেন তুমি রিসিভার তুললে ! আঃ ভগবান !'

নীতা পাথরের মত বসেছিল। নিজের অজান্তে সে একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছে বুঝতে পেরে সে লজ্জিত।

বিমানকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই আমার। সুনন্দা নিশ্চয়ই আমার কথায় নতুন করে সম্পর্ক তৈরী করার জন্যে বিমানকে ফোন করেছিল। কিন্তু বিমানের বদলে নীতা ফোন ধরায় সে ভেবে নিল, নীতা তার অনুপস্থিতিতে এখানে পাকাপাকিভাবে রয়েছে।

এই দম্পত্তির মিলন এখনও হয়নি। সুনন্দার পরিবারের মানুষরা বিমানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনছে। সুনন্দাকে বোঝাতে আর কেউ পারবে না। সে দু' দুবার চোখ এবং কানেব মাধ্যমে যে সত্যটা আবিষ্কার করেছে, তাই আঁকড়ে থাকতে চাইবে শেষ পর্যন্ত। ওর কাছে বিমান একজন পুরোদস্তুর ভিলেন। আর সেই সূত্রে সুনন্দার আত্মীয়স্বজনেরাও একই ধারণা পোষণ করছে। ফলে সমস্ত শহরে বিমানের সম্পর্কে এইসব গল্প ছড়াতে লাগল। ওর জন্যে আমার খারাপ লাগছিল। হঠাৎ দেখা হতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সন্দেহবাতিক স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে চাওয়া উচিত না তাকে ত্যাগ করা ভাল ?'

এর যে উত্তর দেওয়া উচিত তা আমি দিতে পারিনি। কিন্তু পাঠক, এর পরে যদি আমি শুনি বিমান যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে, এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনে নিজেকে নিয়ে গিয়েছে তাহলে কাকে দোষ দেব ? পরিস্থিতি পরিবেশ এবং ঘটনাচক্রে এইভাবে কখনও আমাদের ভিলেন করে দেয়। এইটেই সবচেয়ে মর্মান্তিক। কিন্তু এর বিপরীতে যেখানে ভিলেনি পূর্ব-পরিকল্পনা-মাফিক সেখানে সহানুভূতি আসে না বটে, তবে সেই ভিলেনি যদি বুদ্ধিদীপ্ত হয় তাহলে চমকে উঠি আমরা, সেই সঙ্গে অনুচ্চারিত একটা প্রশংসা তাদের জন্যে তৈরী হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেমন একজন ভিলেন বাস করে তেমনি অতি সজ্জন সত্তার অস্তিত্ব খুব প্রখর। এই সজ্জন সত্তা অন্যের ভিলেনি বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু তাতে যদি চমক থাকে সেটাকে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

জানিনা, পাঠকের ঘটনাটি মনে আছে কিনা। পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে একসময়

লেখালেখি হয়েছিল। একসঙ্গে চমক এবং চাঞ্চল্য তৈরী করে এমন ভিলেনি অথবা ভ্যাম্পের দৃষ্টান্ত বিরল। বউবাজার স্ট্রীটের একটা অংশ গয়নাপাড়া বলে প্রসিদ্ধ। দু' লাখ টাকার গয়না শোকেসে রেখে যেমন অনেকে ব্যবসা করেন, আবার কুড়ি কোটি টাকার গয়না আছে এমন দোকানেরও অভাব নেই— এইরকম একটা দোকান, যার দরজায় দুজন বন্দুকধারী, আঠাশজন কর্মচারী, সবসময় সজাগ পাহারা, সেখানে সকাল সাড়ে দশটায় একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা এলেন। মহিলার চেহারায় আভিজাত্য স্পষ্ট। তিনি অত্যন্ত আধুনিকাও। দরজায় জিজ্ঞাসা করে তিনি সেই কাউণ্টারে গেলেন, যেখানে অত্যন্ত দামী গয়না রয়েছে। তাঁকে আপ্যায়ন করল তরুণ সেল্‌সম্যান। আধঘণ্টা ধরে এটা-ওটা পছন্দ করে যখন তিনি সবগুলোর দাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন দেখা গেল, তা ঠিক এক লক্ষ নিরানব্বুই হাজার হয়েছে। ভদ্রমহিলা সেল্‌সম্যানকে বললেন, 'এত টাকার গয়না নিচ্ছি, আপনি আমাকে একটু ফেভার করবেন?'

'বলুন?'

'আমার ক্যাশমেমো চাই না। আপনি এর ওপরে ট্যাক্স চাপাবেন না।'

সেল্‌সম্যান প্রস্তাবটা শুনে মালিককে ডেকে আনল। তিনি একটু দ্বিধা করেও সম্মতি দিলেন। এতে তাঁর আইন মানা হচ্ছে না বটে, কিন্তু সম্প্রতি যে কালো সোনা কম দামে কিনেছেন তা এই ভদ্রমহিলাকে বিক্রী করা গয়নার পরিবর্তে শোকেসে অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা টাকাটা কাউণ্টারের ওপর রাখলে তা গুনে নেওয়া হল। এক হাজার টাকা বেশী ছিল তা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে মালিক টাকাগুলো সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখলেন। ভদ্রমহিলা একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে গয়না নিয়ে চলে গেলেন। এত সকালে এমন খদ্দের সাধারণত আসে না। মালিক খুব খুশী।

এগারটা নাগাদ আর একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে, একজন বয়স্ক মহিলা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে সেই কাউণ্টারে পৌঁছালেন, যার সেলসম্যান একটু আগে গয়না বিক্রী করেছে। ভদ্রমহিলা গয়না দেখতে চাইলেন। সেলসম্যান অবাক হচ্ছিল কারণ ইনি সেইসব গয়না চাইছেন যা একটু আগের মহিলা চেয়েছিলেন। সব দেখানো হয়ে গেলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এসব প্যাক করে দিন।'

'বিল করব?'

'হ্যাঁ, সেল্‌স ট্যাক্স সমেত বিল করবেন। আমি আইন মেনে চলি।'

সেলসম্যান বিল করে দিল। সেটা হাতে নিয়ে মহিলা বললেন, 'এতে পেইড ছাপ মেরে দিন। নইলে টাকা দিয়েছি প্রমাণ হবে কি করে?'

'আপনি টাকাটা দিন, এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার।'

প্যাকেটটা একহাতে নিয়ে মহিলা অবাক হলেন, 'দিন মানে, আমি দিয়েছি।'

'দিয়েছেন? কখন দিলেন?' আঁতকে উঠল সেলসম্যান।

'বাঃ, একটু আগে, আপনি গুনে নিলেন টাকাগুলো। অদ্ভুত তো। টাকা নিয়ে এমন ভান করছেন যেন টাকা নেননি।

সেল্‌সম্যান হতভম্ব। সে মালিককে ছুটে ডেকে নিয়ে এল। সব শুনে মালিক ক্ষেপে গেলেন, 'আপনি ভদ্রমহিলা না ঠগ?'

'মুখ সামলে কথা বলুন। এখানে পেইড স্ট্যাম্প মেরে দিন।'

'দেওয়াচ্ছি। আপনাকে পুলিশে দেব আমি।'

'ডাকুন পুলিশ।'

অতএব পুলিশকে টেলিফোন করা হল।

খোদ লালবাজার থেকে বড় অফিসার চলে এলেন। প্রথমে মালিক বললেন, 'এই ভদ্রমহিলা গয়না পছন্দ করে প্যাক করিয়ে মেমো হাতে নিয়ে বলছেন, টাকা দিয়ে দিয়েছেন। এটা একদম মিথ্যে কথা। ইনি ঠগ, জোচ্চোর। একে এ্যারেস্ট করুন।'

পুলিশ অফিসার ভদ্রমহিলার বক্তব্য জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'গয়না পছন্দ করে ট্যাক্স সমেত এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা ওকে দিয়েছি।'

মালিক বললেন, 'মিথ্যে কথা।'

মহিলা বললেন, 'না, সত্যি। টাকাটা গুনে আপনি ওই সিন্দুকে রেখেছেন।'

পুলিশ অফিসার সিন্দুক খোলালে এক লক্ষ নিরানব্বুই হাজার টাকা পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা উল্লসিত। প্রতিবাদ করলেন, 'এটা ওঁর টাকা নয়।' অফিসার তখন আজ সকালের বিক্রীর হিসেব দেখতে চাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন সকাল এগারটার মধ্যে কোন বিক্রী হয়নি। গয়নার দোকানে প্রতিদিন কেনাবেচার হিসেব সঠিকভাবে রাখতে হয়। মালিক এই টাকাটার কোন হিসেব দেখাতে পারছিলেন না। আগের ক্যাশমেমো ছাড়া গয়না বিক্রী করার জন্যে এখন তিনি হাত কামড়াচ্ছেন। ভদ্রমহিলা তখন পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গিয়েছেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওই টাকা আমি আমার ব্যাঙ্ক থেকে সকাল দশটা পনের মিনিটে তুলেছি।'

'কোন ব্যাঙ্ক?' অফিসার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

মহিলা নাম বলতেই সেখানকার ম্যানেজারকে টেলিফোন করা হল। তিনি খোঁজ নিয়ে বললেন, 'আজ সকাল দশটা পনেরতে শ্রীমতী শুক্লা বণিক তাঁর একাউন্ট থেকে দু' লক্ষ টাকা তুলেছেন।'

টাকাগুলো সবই নতুন ছিল। ম্যানেজার তার নম্বর পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন।

নম্বর মেলানো হল। অফিসার মালিককে ধমক দিলেন। মহিলাকে এভাবে মিথ্যে অভিযুক্ত করায় তিনি যদি মামলা দায়ের করতে চান, পুলিশ তাঁকে সাহায্য করবে। এরপর পেইড রসিদ আর গয়নার বাক্স হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন মহিলা অফিসারকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে।

পুলিশ চলে গেলে দোকানের মালিক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকার গহনা মহিলা নিয়ে গেলেন ঠিক অর্ধেক দামে।

প্রথম মহিলাকে রসিদ না দেবার জন্যে এখন তার আফসোসের অন্ত ছিল না।

ব্যাপারটা এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনি। এখন এই মুহূর্তে আইনের মাধ্যমে কিছু করা যাচ্ছে না কিন্তু ভদ্রমহিলার বাড়িতে পুলিশ নিয়ে গেলে দুসেট গয়না পেতে অসুবিধে হবে না। ওই প্রথম সেটটির ব্যাপারে কি কৈফিয়ৎ দেবে ওরা। তার কোন কাগজপত্র নেই। মহিলা দুজন একসঙ্গে প্ল্যান করে কাণ্ডটা করলেন যখন, তাঁরা একসঙ্গে থাকতেই পারেন।

মালিক ব্যাঙ্কে ছুটে গেলেন।

ম্যানেজারকে সব কথা খুলে বলে আবেদন করলেন মহিলার বাড়ির ঠিকানা দিতে। ব্যাঙ্কে যে এ্যাকাউন্ট খোলে তাকে ঠিকানা দিতেই হয়। ম্যানেজার দয়াপরবশ খাতা আনিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করলেন, সেটি সাধারণত ঘটেনা। আজ থেকে তিনমাস আগে মহিলা এ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এক হাজার টাকা দিয়ে। তারপর প্রতি সপ্তাহে দশ কিংবা কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়ে গিয়েছেন যতক্ষণ না, দুলক্ষ পাঁচশো টাকা না হয়। আজ সকালে তিনি দুলক্ষ টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন। ঠিকানা একশ বারোর একের-এ ন্যায়রত্ন লেন, কলকাতা চার।

ঠিকানা লিখে নিয়ে মালিক দোকানে ফিরে এসে কয়েকজন শক্তিশালী লোক নিয়ে ছুটে গেলেন শ্যামবাজারে।

ন্যায়রত্ন লেন খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। কিন্তু অত বড় নাম্বার ওই রাস্তায় নেই। একের-এ তো দূরের কথা। মুখে মাছি পড়লে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় মালিক ছুটে এলেন ব্যাঙ্কে। তখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হচ্ছে। ম্যানেজার বললেন, ঠিকনাটা ফলস্। এই ঠিকানায় কোন বাড়ি নেই। তবে এ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে একটা রেফারেন্স লাগে যার ওই ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট আছে। তিনি কে ?

ম্যানেজার আবার খাতা আনলেন। রেফারেন্সের জায়গায় চোখ রেখে তাঁর মুখ শক্ত হয়ে গেল। মালিক ব্যগ্র হলেন, পেয়েছেন স্যার ?

হুঁ, পেয়েছি। এখন সব মনে পড়ছে। মাস তিনেক আগে এক ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসে বলেন, তাঁরা নতুন কলকাতায় এসেছেন। আমার ব্যাঙ্ক কাছাকাছি হয় বলে তিনি এখানেই অ্যাকাউন্ট খুলতে চান। মাঝে মাঝে তেমন কেস আমরা কনসিডার করি। উনি মহিলা এবং নতুন বলে রেফারেন্সের জায়গায় আমি সই করেছিলাম। ম্যানেজারের মুখ থমথমে।

মালিকের বুকে ব্যথা শুরু হয়েছিল। তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলো। এই দুই বুদ্ধিমতী মহিলাকে ভ্যাম্প বা ভিলেন কতখানি বলা যায়, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। দুজন যুক্তি করে কাজটা করেছেন। প্রথমজনের চেয়ে দ্বিতীয় জনের ঝুঁকি বেশী ছিল, তাঁর অভিনয় পারদর্শিতা অবশ্যই অসাধারণ। কিন্তু প্রথম মহিলার অনুরোধ যদি মালিক না রাখতেন, তিনি যদি ট্যাক্স মিটিয়ে ক্যাশমেমো নিতে বাধ্য করতেন, তাহলে কি মহিলা এক লক্ষ নিরানব্বুই হাজার টাকা দিয়ে গয়না কিনতেন ? অবশ্যই

নয়। বিল বা ক্যাশমেমো চায়না এমন খদ্দের পেয়ে মালিকের মনে হয়েছিল, তাঁ
কালো সোনা এই সুযোগে সাদা করে নিতে পারবেন। সোনার ব্যবসায়ীদের প্রতি
দিনের সোনার হিসেব সরকারকে ঠিকঠাক দিতে হয়। সেই সঙ্গে সোনা কেনা
ও বিক্রীর পরিমাণও জানাতে হয়।

কম দামে কেনা কালো পথে আসা সোনা তিনি চালিয়ে দিতে চাইলেন ওই
মহিলার নেওয়ার সোনার বিকল্প হিসেবে। ঠিক ওই পরিমাণ সোনার গয়না কালো
সোনা থেকে তৈরী করে শোকেসে এসে যেত সরকার টেরও পেত না। এই ঘটনা
কোন সৎ মানুষ করেন না, তাই মালিকও ওই মুহূর্তে ভিলেন হয়ে গেলেন। এবং
স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধির খেলায় ওই মহিলারা টেক্কা দিয়েছেন। তিনমাস আগের
পরিকল্পনা কেমন ধাপে ধাপে সফল করলেন।

বেশীর ভাগ ভিলেনদের দিকে দু'বার তাকাতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু পারলে আমি
এঁদের কাছে অটোগ্রাফ নিতাম। কিছু আমেরিকান উপন্যাস নিয়মিত লেখা হয়,
যার নায়ক ভিলেন। একবার বিকাশ রায় আমাকে এই ধরনেব একটি উপন্যাসের
কথা বলেছিলেন। সহজ সরল এবং বেকার মানুষ যার টাকা দরকার, যে চাকরি
খুঁজছে, তাকে নিয়ে গল্প। ঘটনাচক্রে এইসব চরিত্র এমন ভাবে জড়িয়ে যায় অপরাধের
পাকে পাকে, পাকা অপরাধী হয়ে উঠলেও পাঠকের পূর্ণ সহানুভূতি থাকে তাদের
ওপর। বাংলায় এমন ছবির কথা ভাবা যায় না। গডফাদার-এর গল্প বাংলায় চলবে
না। অথচ এই ধরনের কাজকর্ম করেন এমন মানুষ যে পশ্চিম বাংলায় নেই, তা
কেউ জোর গলায় বলতে পারেন না। বিকাশ রায়ের ইচ্ছে ছিল আন্ডার লাইন
করা ভিলেন নয়, চিবিয়ে চিবিয়ে প্রথম দৃশ্য থেকেই নায়িকাকে ভয় দেখানো বা
নায়ককে শাসানো নয়, একটু-একটু করে নিজের অজান্তে ভিলেন হয়ে যাওয়া
একটি মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করা। ওঁর আশা পূর্ণ হয়নি। ভিলেনদের রক্ত-মাংসের
মানুষ করার প্রবণতা এদেশের চিত্রনাট্যকারদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হিচককের
ছবিতে আমরা এই কাজটা দেখেছি।

আর এই সব ভাবলেই আমার খোকন গুপ্তর কথা মনে পড়ে। ইলিয়ট রোডে
একটা ব্লাড ডোনেসন ক্যাম্প নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুটি ছেলে আমার কাছে এসেছিল।
খোকনদা আপনাকে বারংবার অনুরোধ করেছেন যাওয়ার জন্যে।

'খোকনদা কে?'

'সেকি? আপনি খোকনদাকে চেনেন না?'

'না, ভাই।' ওরা চলে গেল। ঘণ্টা দুয়েক বাদে টেলিফোন এল, আমি খোকন
গুপ্ত। পরিচয় দেবার কিছু নেই। এলাকার গরীব মানুষগুলোর জন্যে কিছু কাজকর্ম
করি। আমার স্ত্রী আপনার ভক্ত, তাই চাইছি আপনি যদি আসেন।

যেহেতু রক্ত সংগ্রহের জন্য অয়োজন, রাজী হলাম। গিয়ে আবিষ্কার করলাম
এক স্বাস্থ্যবান যুবককে, যার মুখে অনেকগুলো সেলাই-এর দাগ স্পষ্ট। আশেপাশের

মানুষের আচরণ থেকে বুঝতে অসুবিধে হল না, ওই এলাকায় খোকনের প্রতাপ প্রচণ্ড। কোন রক্ত সংগ্রহের ক্যাম্পে অন্তত হাজার মানুষ লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে, আমার দেখা ছিল না। মানুষের রক্ত নেবার মত ব্যবস্থা সংগ্রাহকদের ছিল না। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে খোকন বলল, 'এরা নানাভাবে খুন ঝরায়। সেটা বাজে কাজে না ঝরিয়ে আপনাদের দিতে চাইছে অসুস্থ মানুষের জান বাঁচাতে। কিভাবে নেবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার।'

কথা বলার মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্ব ছিল যে দ্রুত অন্য ব্যবস্থা হল। আমার সাজানো কথা বক্তৃতার মাধ্যমে বললাম। এলাকার বিখ্যাত পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'খোকনবাবু, গতকাল একটা লাশ পেয়েছি। ক্রিমিন্যাল। জিভ কাটা ছিল। এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন ?'

'কার লাশ কে মেরেছে, তা কি করে বলব। তবে জিভ যখন তখন বুঝতে হবে লোকটা খারাপ কথা বলছিল।' হাসল খোকন।

পুলিশ অফিসারের চোয়াল শক্ত হয়েছিল। খোকন বলল, 'স্যার, রক্ত দিন। আপনার রক্ত কোন মানুষ পেলে তার উপকার হবে।'

পুলিশ অফিসার ঘাবড়ে গেলেন, 'আমি ?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনারা রক্ত দেবেন না, এমন কোন অর্ডার তো নেই।'

পরিস্থিতি এমন ঘুরে গেল যে, ভদ্রলোককে রক্ত দিতে হল। আমি খোকনের বুদ্ধি দেখে অবাক হলাম। আমায় সে বলল, হয়তো ওই অফিসারের গুলিতে কেউ আহত হয়ে হাসপাতাল যাবে এবং তখন ওঁরই রক্ত তাকে বাঁচাবে।

মাঝখানে খোকন জোর করে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। বেশ আটপৌরে মহিলা।

বারংবার খেতে বললেন।

এর পরে খোকনের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়ে গেল। ওকে আমার পছন্দ হচ্ছিল। একটু একটু করে কাছের লোক হয়ে গেলে ওর গল্প শুনলাম। তার আগে বলে রাখি, যে লাশটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি খোকনেরই কীর্তি। লোকটি এলাকায় বলে বেড়াচ্ছিল, হিন্দুর রক্ত মুসলমানের রক্ত সব একাকার হয়ে যাবে বোতলে রক্ত দিলে। ফলে ওই রক্ত কোন হিন্দু নিলে তার জাত যাবেই। দুবার তাকে নিষেধ করেছিল খোকন। তারপর নিঃশব্দে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে।

খোকনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'খুন করতে তোমার হাত কাঁপে না ?'

'এইসব সাপ বিছে অথবা হায়েনাদের খুন করতে হাত কাঁপবে কেন ?'

'কত খুন করেছ এ জীবনে ?'

'হিসেব করিনি। তিন ডজন হলেও হতে পারে। কিন্তু যতগুলো মানুষ মরেছে তার দশ গুণ মানুষ বেঁচে গিয়েছে ওরা মরার জন্যে।'

'পুলিশ ধরতে পারেনি ?'

'না!' হেসেছিল খোকন, 'ধরা পড়তাম প্রথম দিকে। তবে খুনের দায়ে নয়। বোকা ছিলাম, মোট আট বছর জেল খেটেছি।'

'তোমার সঙ্গে তো পলিটিক্যাল পার্টি নেই জোর পাও কি করে?'

'স্রেফ মনের জোর। তবে এলাকার পাবলিক সঙ্গে আছে। ওরা আমাকে ভালবাসে। আমার জন্যে এখনও জান দেবে।'

'কি করে লাইনে এলে?'

'আঠারো বছর বয়সে চাকরি খুঁজতে এসেছিলাম কলকাতায়। সারাদিন ঘুরে থাকার জায়গা না পেয়ে পার্কস্ট্রীটের ফুটপাতে ছিলাম। রাত্রে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল হাজতে। খামোকা পিটল। সকালে ছেড়ে দিল। পরদিন একটা দোকানে চাকরি পেলাম। জমানো মাংস বিক্রী করে। আমি কেটে ওজন করে প্যাক করে দিতাম। মালিক খুব ভাল মানুষ ছিল। যখন থাকতেন না তখন মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রেমিক নিয়ে আসত। এটা আমি পছন্দ করতাম না। সেই মেয়েছেলে আমাকে ঝুল কেসে ফাঁসিয়ে দিল। ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। এমন কি মালিকও না। এক বছর জেল থেকে ঘুরে এলাম। এসে দেখলাম বউটা প্রেমিকের সঙ্গে ভেগে গিয়েছে। তারপর এই ইলিয়ট রোডে একটা খারাপ মেয়েকে দুটো লোক জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বাধা দিলাম। লোক দুটো পালাল। মেয়েটাকে তার ডেরায় পৌঁছে দিতে মালিকান আমাকে চাকরি দিল ওদের দেখাশোনা করার। সেই সময় এলাকার একটা বাচ্চা মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মেয়েটাকে ভাল লাগত? তাকে বাঁচাবার জন্যে তিন সপ্তাহ পড়েছিলাম হাসপাতালে। চাকরিটা গেল কিন্তু এলাকার মানুষ আমার নাম জেনে গেল। এর পরেও জেলে ঢুকেছি কিন্তু আমার লোকজনের সংখ্যা বেড়েছে। বড় ব্যবসায়ীদের কাছে যে তোলা তুলি তার অর্ধেক নিই আমরা আর বাকীটা এলাকার মানুষের প্রয়োজনে খরচ করি।'

এর পরে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই রবিনহুড বা দস্যুমোহন যেন খোকনের নায়ক মনে হয়েছিল। কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম ইলিয়ট রোডে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে। লোকটা অত্যন্ত কুখ্যাত, নাম খোকন গুণ্ডা। ভেবেছিলাম প্রতিবাদ জানিয়ে খবরের কাগজে চিঠি লিখব। কারণ ওকে জানার পর আবার ভিলেন এবং নায়কের সংজ্ঞা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। হয়তো এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন কিছু কিছু মানুষ এমনই রহস্য তৈরী করে যাবেন।